BANGLADESH JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY

Bangladesh Economic Association

BANGLADESH JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY

Vol. 8 No. 1 June, 1988

MUHIUDDIN KHAN ALAMGIR
WAHIDUDDIN MAHMUD
Editors

JUNE 1988

Editorial Advisory Board

1. Prof. Akhlaqur Rahman
2. Prof. S.A. Latifur Reza
3. Prof. Ayubur Rahman Bhuiyan
4. Prof. Solaiman Mandal
5. Prof. M.A. Hamid
6. Prof. Sekander Khan
7. Prof. Ataul Huq
8. Prof. Raihan Sharif
9. Dr. Amirul Islam
10. Mr. Abu Ahmed Abdullah

Editorial Board

1. Chairman — Prof. Rehman Sobhan
2. Executive Editors — Dr. Muhiuddin Khan Alamgir, Dr. Wahiduddin Mahmud
3. Asstt. Executive Editors — Dr. S.M. Hashemi, Mr. Anu Muhammad
4. Publication Editor — Dr. Atiur Rahman
5. Business Editors — Dr. Moinul Islam, Mr. Abdus Sattar Bhuiyan
6. Book Review Editor — Prof. Muzaffer Ahmad
7. Communication Editor — Dr. A. T.M. Zahurul Huq

Copy Editor for this Volume was Dr. Nazmul Bari.

THE BANGLADESH JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY

Vol. 8 No. 1

২০০০ সালের বাংলাদেশ

১। ২০০০ সালের বাংলাদেশ ঃ মুশাররফ হোসেন সেলিম জাহান ১

২। ২০০০ সালের বাংলাদেশ— একটি প্রত্যুত্তর ঃ এম, সাইদুজ্জামান ৩৬

DEVELOPMENT STRATEGY FOR NORTH-WEST BANGLADESH

৩। বাংলাদেশে পল্লী উন্নয়ন কৌশল ও দারিদ্র নিরসন ঃ এম, এ, হামিদ ৪৬

৪। উত্তর-পশ্চিম বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে শিক্ষা উন্নয়নে আঞ্চলিক বৈষম্য— একটি অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ ঃ শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান মুহম্মদ রফিকুল ইসলাম ৬৭

5. Problems and Prospects of Small and Cottage Industries in North-West Bangladesh— A Case Study of Brass and Bell Metal Industry : M. Azhar-ud-din 78

6. Fragile Profile of Energy Balance in the Western Zone of Bangladesh : M. Solaiman Mandal 86

7 Desertification, Declining Underground Water Level and Crop Production Strategy for Barendra Region of Bangladesh : Ataul Huq Ali Ashraf 94

8.	Regional Differences in Factor Substitution in Bangladesh : An Econo-metric Study	:	Tariq S. Islam M. Ismail Hossain Ahsanul Habib	102
9.	Industrialisation in North-West Region of Bangladesh : Need and Strategies for Balanced Regional Industrial Development	:	A. M. Mosharraf Hossain	107

KARL MARX, JOSEPH SCHUMPETER, J. M. KEYNES

10.	Karl Marx and His Analysis of Capitalism— Some A-Posteriori Reflections	:	Md. Nazrul Islam	113
11.	The Transition from Capitalism to Socialism : The Schumpeterian Version	:	Abu Ahmed Abdullah	144
১২।	শতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলী ঃ লর্ড জন মেনার্ড কেইন্স	ঃ	মোজাফফর আহমদ	১৬১

ECONOMIC AND MANAGEMENT PROBLEMS OF DEVELOPMENT BANKING

13.	Central Banking, Monetary Management and Related Issues with Special Reference to Bangladesh Experience	:	A. M. A. Rahim Mohammad Sohrab Uddin	182
14.	Aspects of Development Finance Institutions in Bangladesh	:	A. M. M. Shawkat Ali Nazmul Bari A. B. M. Siddique A. K. M. Shameem	205
15.	Role of Commercial Banks in Economic Developm-ent— Bangladesh Experience	:	Mohammad Hossain	228
16.	Public Enterprises and the Financial System in Bangladesh	:	Muhiuddin Khan Alamgir	255

BANGLADESH ECONOMIC ASSOCIATION, 1988

* Bangladesh Journal of Political Economy is published by the Bangladesh Economic Association. Mailing address: Bangladesh Economic Association, C/O Department of Economics, University of Dhaka, Dhaka-2.

* The price of this volume is Taka 100.00 (domestic) and US $ 10.00 (foreign). Correspondence for subscription may be sent to the Business Editor, Bangladesh Journal of Political Economy, C/O Department of Economics, University of Dhaka, Dhaka-2.

* No responsibility for the views expressed by authors in the Bangladesh Journal of Political Economy is assumed by the Editors or Publisher.

President
Prof. Muzaffer Ahmad

Vice-Presidents
Dr. Muhiuddin Khan Alamgir
Prof. Sekander Khan
Mr. M. L. Rahman
Mr. Abu Ahmed Abdullah
Mr. Shah Md. Habibur Rahman

General Secretary
Dr. Atiur Rahman

Treasurer
Mr. A.H.M. Mahbubul Alam

Joint Secretary
Mr. Md. Abdur Rab

Assistant Secretaries
Mr. A. K. M. Shameem
Mr. Zasheemuddin Ahmed

Members
Mr. Md. Akhtaruzzaman
Dr. Abdul Ghafur
Mr. Md. Siraz Uddin Miah
Mr. M.A. Sattar Bhuiyan
Dr. Md. Azhar ud-Din
Mr. Md Anisur Rahman
Ms. Fazilatun Nessa
Mr. Mushiur Rahman
Dr. Kh. Mustahidur Rahman
Mr. Nityananda Chakravorty
Ms. Fatema Zahora

২০০০ সালের বাংলাদেশ

২০০০ সালের বাংলাদেশ

মুশাররফ হোসেন *

সেলিম জাহান **

ভূমিকা

গত কয়েক দশক ধরে বাংলাদেশের সমাজ ও অর্থনীতির সরকারী নীতি ও গৃহীত ব্যবস্থা সমূহ ও বৈদেশিক সাহায্যের কাঠামো বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে এ দেশের বৃহত্তর অংশ বিশেষতঃ গ্রামাঞ্চলের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় কোন সাবিক গতিশীলতা অর্জিত হয়নি । অন্যদিকে এটা বিশ্বাস করার মত যথেষ্ট যৌক্তিকতা রয়েছে যে গ্রামাঞ্চলের বেশীর ভাগ লোকের জীবনযাত্রার মানের কোন উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়নি । বরং গ্রাম বাংলায় অনপেক্ষ ও আপেক্ষিক দারিদ্র্যের আপাতন অনেক বেড়ে গেছে এবং ষাটের দশকে সাধারণ মানুষের যে অবস্থা ছিল তার দ্রুত অবনতি ঘটেছে । রাজনৈতিক দিক থেকে স্বাধীনতার সময়ে অধিষ্ঠিত সরকারের যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দর্শন ছিল, পরবর্তীকালে সম্পূর্ণ ভিন্ন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দর্শন সম্পন্ন সরকার ক্ষমতায় এসেছে এবং বর্তমানে যে সরকার রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত , তাদের রাষ্ট্রক্ষমতার উৎস, ধ্যান-ধারণা, নীতি ও আদর্শ স্বাধীনতার অব্যবহিত পরের সরকার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নমুখী । সামাজিক দিক থেকে পুরো সমাজ একটি অস্থির সময়ের মধ্যদিয়ে যাচ্ছে, যেখানে সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় প্রকট, গ্রাম-শহরের মধ্যে এবং বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর মধ্যে সুযোগ ও সম্পদের মেরুকরণ দ্রুত বাড়ছে, পরিবারের সংগঠন ও সমাজে নারীর অবস্থান পাল্টাচ্ছে। আন্তর্জাতিক দিক থেকে বহির্বিশ্বের প্রেক্ষাপট বদলাচ্ছে এবং সে পরিপ্রেক্ষিতে বাইরের বিশ্ব বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়া, তৃতীয় বিশ্ব এবং আমাদের প্রতিবেশীদের তুলনায় আমাদের আপেক্ষিক অবস্থান এবং আমাদের বর্হিসম্পর্কের পরিবর্তন ঘটছে ।

এই প্রেক্ষাপটের প্রেক্ষিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে এ শতাব্দীর শেষ নাগাদ এই দেশ, সমাজ ও অর্থনীতির রূপরেখা কি হবে, কেমন হবে ২০০০ সালের বাংলাদেশের চিত্র ? প্রশ্নটির গুরুত্ব হচ্ছে যে এর উত্তরই নির্ধারণ করে দেবে আমাদের আগামী

---

* অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ।

** সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ।

প্রজন্মের মানুষের জীবন, পরবর্তী শতাব্দীতে এ দেশের সমাজ কাঠামো এবং ভবিষ্যৎ অর্থনীতির গতিময়তা। এক কথায় এ প্রশ্নের উত্তর চিহ্নিত করবে আমাদের পুরো ভবিষ্যৎ। কিন্তু এ প্রশ্নের জবাব দিতে হলে পুরো দেশ, সমাজ ও অর্থনীতি সম্পর্কে একটি ভবিষ্যৎ প্রক্ষেপণ করতে হবে। বর্তমান প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য এটাই। যে বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে এ প্রক্ষেপণ করা হয়েছে তা প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে বর্ণিত হয়েছে। তবে সাধারণভাবে বলতে গেলে প্রক্ষেপণটিকে দু'টো অংশে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম অংশে বহির্বিশ্ব ও তার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশরে অবস্থান, এ দেশের রাজনৈতিক কাঠামো, সামাজিক সংগঠন ইত্যাদি বিষয়ের ভবিষ্যত রূপরেখা সম্পর্কে একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে এ বৃহত্তর পটভূমির প্রেক্ষিতে এ দেশের অর্থনীতি সম্পর্কে একটি প্রক্ষেপণ গড়ে তোলা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে এই দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বিভিন্ন সরকারী ও আন্তর্জাতিক সংস্থা যেমনঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, পরিকল্পনা কমিশন ও বিশ্বব্যাংকের নিজস্ব প্রক্ষেপণ রয়েছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এ সব সংস্থার প্রক্ষেপণের সঙ্গে আমাদের প্রক্ষেপণের একটি তুলনামূলক আলোচনায় আমরা প্রয়াসী হব। যে বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে এ পুরো প্রক্ষেপণ গড়ে তোলা হয়েছে, তার নানা সীমাবদ্ধতা আছে, যে সব সীমাবদ্ধতা প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে আলোচিত হয়েছে। কিন্তু সে সব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আমরা এ ধরণের উদ্যোগে ব্রতী হয়েছি প্রধানতঃ দু'টো কারণে, প্রথমতঃ এ সীমিত আঙ্গিকের প্রক্ষেপণের সাহায্যে ভবিষ্যতে এ দেশের সামগ্রিক অবস্থা কি হতে পারে সে ব্যাপারে আমরা পরিপূর্ণভাবে সুষ্ঠু না হলেও একটি প্রয়োজনীয় ইঙ্গিতবহ চিত্র আমাদের সামনে পাব যা আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যতের সঙ্কটকে তুলে ধরতে যথেষ্ঠ। সেই সঙ্গে সঙ্গে এ ধরণের চিত্র বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও নীতি গ্রহণের জন্য যথাযথ দিকনির্দেশ করতে সহায়ক হবে।

উপস্থাপনের বিন্যাসের দিক থেকে বর্তমান প্রবন্ধটিকে চারটি অংশে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম অংশে বর্তমান প্রবন্ধে ব্যবহৃত বিশ্লেষণ প্রক্রিয়াটি আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে ২০০০ সাল নাগাদ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্পৃক্ত নানা দিকের একটি ভবিষ্যৎ রূপরেখা দেয়ার প্রয়াস পাওয়া হয়েছে। এ অনুগামী অংশে এ দেশের ভবিষ্যৎ অর্থনীতি সম্পর্কে একটি প্রক্ষেপণ গড়ে তোলা হয়েছে। উপসংহারমূলক কিছু মন্তব্যের মাধ্যমে প্রবন্ধটি শেষ করা হয়েছে।

বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া

যে প্রশ্নটি এ প্রবন্ধে উত্থাপিত হয়েছে, তা গুরুত্বপূর্ণ হলেও তার সুনিশ্চিত একটি উত্তর দেয়া বেশ কঠিন। আগেই উল্লেখিত হয়েছে এ জাতীয় উত্তরের জন্য পুরো দেশ, সমাজ ও অর্থনীতি সম্পর্কে একটি ভবিষ্যৎ প্রক্ষেপণ প্রয়োজন। এ জাতীয় প্রক্ষেপণে দু'টো মৌলিক অসুবিধে বিদ্যমান। প্রথমতঃ যে কোন বিষয়ের ওপর নির্ভুল ভবিষ্যৎ প্রক্ষেপণ করতে হলে সে বিষয়ের ভবিষ্যৎ গতিধারা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে। কিন্তু এ জাতীয় প্রজ্ঞা মানুষের কাছ থেকে আশা করা যায় না। অনেক সময় মনে করা হয় যে এ ব্যাপারে বিষয়টির অতীত প্রবণতা তার ভবিষ্যৎ প্রক্ষেপণের ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে। এটাও পুরোপুরি সত্য নয়। কারণ ভবিষ্যৎ অতীতের অভিন্ন প্রতিচ্ছায়া নয়। ভবিষ্যতের নিজস্ব কিছু উপাদান থাকবে যার প্রতিরূপ হয়তো অতীতে ছিল না। সে

ক্ষেত্রে কোন বিষয়ের অতীত প্রবণতা তার ভবিষ্যৎ প্রক্ষেপণে সীমিত অবদানই রাখতে পারে মাত্র । দ্বিতীয়তঃ অর্থনৈতিক, সামাজিক কিংবা রাজনৈতিক যে কোন প্রক্ষেপণের ক্ষেত্রেই যে বিষয়ে প্রক্ষেপণ করা হয়, তার নানান দিক ও মাত্রিকতা থাকে । এ সব দিক বা মাত্রিকতার মিশ্রক্রিয়ার ফলে বিষয়টির গতিধারা বেশ জটিল হয়ে ওঠে । এ ছাড়াও এ গতিধারা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হলে এর সঙ্গে সম্পর্কিত অথবা একে প্রভাবিত করতে পারে বিষয়সমূহ সম্পর্কে ভবিষ্যতের নির্ভুল তথ্য থাকতে হবে । এ পুরো ব্যাপারটি অসম্ভব প্রায় । এ দু'টো মৌলিক অসুবিধের কারণে রাজনৈতিক, সামাজিক বা অর্থনৈতিক প্রক্ষেপণের ক্ষেত্রে পুরো বিষয়টির ভবিষ্যৎ গতিধারা চিহ্নিত করা যায় না, বরং প্রতিটি ক্ষেত্রে নির্বাচিত কিছু সূচকের মধ্যে সংশ্লিষ্ট প্রক্ষেপণটি সীমাবদ্ধ রাখা হয় । সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের ভবিষ্যৎ রূপরেখা নির্ধারণে আপেক্ষিক গুরুত্বের ভিত্তিতেই এ সূচকগুলো নির্বাচন করা হয় ।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ প্রক্ষেপণে উপরোল্লেখিত মৌলিক অসুবিধেগুলো ছাড়াও আরও দু'টো বিশেষ সমস্যা বর্তমান । প্রথমতঃ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সূচকের ওপর বিশ্বাসযোগ্য উপাত্তের অনুপস্থিতি এবং দ্বিতীয়তঃ বেশীর ভাগ সূচকের ক্ষেত্রে কোন সঙ্গতিপূর্ণ অতীত প্রবণতা নেই যা ভবিষ্যৎ প্রক্ষেপণে কিছুটা সহায়ক হতে পারে । দেয় এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান প্রবন্ধের প্রক্ষেপণে নিম্নোক্ত বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া ব্যবহৃত হবে । বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্পৃক্ত দিকগুলোর ভবিষ্যৎ রূপরেখা নির্ণয়ে আমরা পরিমাণগত প্রক্ষেপণের পরিবর্তে গুণগত পরিবর্তন চিহ্নিত করতে প্রয়াসী হব । এর কারণ অত্যন্ত সরল । দেশের রাজনৈতিক বা সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে গুণগত পরিবর্তনই নির্দেশ করা সম্ভব তার পরিমাণগত পরিমাপ দুরূহ । এ পটভূমির পরিপ্রেক্ষিতে অবশ্য নির্বাচিত অর্থনৈতিক সূচকগুলোর ভবিষ্যৎ পরিমাণগত অবস্থা প্রক্ষেপিত হবে । সে প্রক্ষেপণের মূল ভিত্তি হবে ঐসব সূচকের অতীত ও বর্তমান প্রবণতা । এ ভিত্তি বাস্তব অবস্থার অতি-সরলীকরণ বলে মনে হতে পারে তবে প্রচলিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তা সম্পূর্ণভাবে অনুমোদন যোগ্য । কারণ এ ন্যূনতম সহজ অনুমান সত্ত্বেও বাংলাদেশ অর্থনীতির ভবিষ্যত রূপরেখার সঙ্কটজনক অবস্থা সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ধারণা দিতে বর্তমান প্রক্ষেপণ যথেষ্ট পরিমাণে সক্ষম ।

২০০০ সালের বাংলাদেশ—আন্তর্জাতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট

প্রবন্ধের বর্তমান অংশে এ শতাব্দীর শেষ নাগাদ বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অঙ্গনে কতগুলো নির্বাচিত বিষয়ের ভবিষ্যৎ রূপরেখা প্রণয়নে আমরা প্রয়াসী হব । এখানে উল্লেখ্য যে, এ সমস্ত সূচকগুলো এ সব ক্ষেত্রের সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো নির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে এবং সে প্রেক্ষিতে তারা অর্থনৈতিক উন্নয়নকেও প্রভাবিত করে । সুতরাং অর্থনৈতিক অগ্রগতির ধারার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে তারাই নির্ধারণ করবে কি হবে ২০০০ সালের বাংলাদেশের প্রতিকৃতি ।

বাংলাদেশের ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের আগে এ দেশের মূল ভিত্তি ছিল 'স্ব-নির্ভর গ্রামীণ অর্থনীতি' যেখানে প্রতিটি গ্রাম আর্থ-সামাজিক দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল এবং যেখানে সকল অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ড স্থানীয় চাহিদা পূরণের কাজেই প্রধানতঃ পরিচালিত হত । সরকার

কর্তৃক নির্ধারিত হারে কৃষকেরা কর দিত যা স্থানীয় জমিদারেরা সংগ্রহ করত। তখনকার পুরো অবস্থাটাই ছিল স্থবির একটি প্রসারণ অবস্থার। বৃটিশ শাসনামলে বাংলাদেশের বিশেষ করে গ্রাম-বাংলার আর্থ-সামাজিক জীবনে বিরাট একটি পরিবর্তন ঘটে এবং তিনটি কারণ এ পরিবর্তনের জন্য দায়ী। প্রথমতঃ ঔপনিবেশিক শাসকেরা স্থানীয় জনগণের প্রধান খাদ্যসামগ্রী উৎপাদনের পরিবর্তে কেন্দ্রে স্বার্থে রপ্তানীযোগ্য দ্রব্য উৎপাদনে স্থানীয় কৃষকদের বাধ্য করেছিল; দ্বিতীয়তঃ শিল্প-বিপ্লব এবং কলে-কারখানায় স্বল্প ব্যয়ে প্রস্তুত জিনিসপত্রের সঙ্গে স্থানীয় কুটির শিল্প প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারছিল না, যার ফলে ঐ সব শিল্প ধ্ব ংস হয়ে যাচ্ছিল এবং তৃতীয়তঃ কর সংগ্রহের ব্যবস্থায় বিরাট পরিবর্তন আনা হয় যার উদ্দেশ্য ছিল বৃটিশ সরকারের জন্য যতদূর সম্ভব সর্বোচ্চ পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ। এর মধ্যে প্রথম দু'টো কারণের মূলে রয়েছে ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে কেন্দ্রের সঙ্গে এদেশের স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ অর্থনীতির সম্পৃক্তকরণ। এ সকল প্রক্রিয়ার ফলে এদেশের গ্রামীণ অর্থনীতিতে ক্রমে ক্রমে দারিদ্র্যের পদধ্ব নি প্রকট হয়ে ওঠে।

গ্রামীণ এলাকায় যে জমিদার শ্রেণী ছিল তাদের উদ্বৃত্ত-ভোগী শ্রেণী বলে আখ্যায়িত করা যেতে পারে। কারণ, বৃটিশ শাসকদের তারা যে কর দেবে তা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট অংকে স্থির করে দেয়া হয়, অথচ কৃষকদের কাছ থেকে কত কর আদায় করবে তার কোন স্থিরকৃত সীমা ছিল না। ফলে উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় নিজেরা অংশ গ্রহণের বদলে কৃষকদের কাছ থেকে কর সংগ্রহ জমিদারদের জন্য অনেক লাভজনক হত এবং এটা একটা শোষণের প্রক্রিয়া তৈরী করে দেয়। শহর এলাকায় বৃটিশ শাসনের সহযোগিতা করার জন্য একটি সহযোগী আমলা শ্রেণী এবং তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যে সাহায্য করার জন্য একটি স্থানীয় মুৎসুদ্দী শ্রেণী গড়ে ওঠে।

এই আমলা শ্রেণীর স্বাধীন বিকাশ এবং এই মুৎসুদ্দী শ্রেণীকে একটি জাতীয় বুর্জোয়া পুঁজিপতি শ্রেণীতে পরিণত করার প্রয়াসেই পরবর্তীকালে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত। এই বৃহত্তর পটভূমির একটি ছোট খাতে প্রবাহিত হচ্ছিল 'পাকিস্তান আন্দোলন' যার ভিত্তি ছিল মুসলিম আমলা ও সুপ্ত মুসলিম পুঁজি যারা বৃহত্তর ভারতীয় প্রেক্ষিতে হিন্দু আমলা ও হিন্দু পুঁজিপতিদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দ্রুত অগ্রসর হতে পারছিল না। সুতরাং তাদের প্রয়োজন ছিল একটি আলাদা রাষ্ট্র কাঠামোর। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে এ দেশে আমলা শ্রেণী ও জাতীয় বুর্জোয়া পুঁজির বিকাশে মূল ভূমিকা পালন করে অবাঙ্গালীরা। কেন্দ্রীয় শাসনযন্ত্রেও তাদের ভূমিকাই ছিল মুখ্য। ফলে রাষ্ট্রযন্ত্রও বুর্জোয়া শ্রেণীর রক্ষক হিসেবে কাজ করছিল এবং তাদের শ্রীবৃদ্ধিতে সম্ভাব্য সব রকমের সহায়ক ভূমিকা পালন করছিল। এই বুর্জোয়া শ্রেণীর এবং কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রযন্ত্রের ক্রিয়াকাণ্ডের মূল কেন্দ্র ছিল পশ্চিম পাকিস্তান এবং জাতিগত দিক থেকে তারা ছিল অবাঙ্গালী। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই তারা বাংলাদেশের প্রতি একটি ঔপনিবেশসুলভ মনোভাব গড়ে তুলেছিল, যার ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ নানান ক্ষেত্রে বিভিন্ন উপায়ে শোষিত হচ্ছিল। তবে এ কথাও সত্য যে, এই পাকিস্তানী আমলা ও পুঁজিপতি শ্রেণীর কনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে একটি ক্ষুদ্রকায় বাঙ্গালী আমলা ও পাতি-পুঁজিপতি শ্রেণী এদেশে গড়ে উঠেছিল। তবে যে শ্রেণীটির উদ্ভব পরবর্তী সময়ে

বাংলাদেশের ঘটনা প্রবাহকে সবচাইতে বেশী প্রভাবান্বিত করেছিল তা হচ্ছে একটি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী শ্রেণী । এখানে অবশ্য উল্লেখ্য যে এই সমস্ত শ্রেণীর উদ্ভব ও বিকাশ ছিল শহর-কেন্দ্রিক । গ্রাম-বাংলায় যদিও ১৯৫০ সালে জমিদারী প্রথার বিলোপ সাধন করা হয় এবং ষাটের দশকে গ্রামীণ অবকাঠামো গড়ে তোলার জন্য সরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়, তবু কৃষি-পণ্যের মূল্য আপেক্ষিকভাবে কম হওয়ায় এবং ব্যবসা ও টাকা ধার দেয়ায় আপেক্ষিক লাভ বেশী হওয়ায় বৃহৎ জোতদার বা বড় চাষীরা নিজেরা কৃষি উৎপাদনে অংশ গ্রহণ কিংবা কৃষি উৎপাদনে বিনিয়োগকে লাভজনক মনে করত না । আর সত্যিকার ভাবে, কৃষি উৎপাদনে বিনিয়োগের আগাম বর্গাদারের কাছ থেকে যে উদ্বৃত্ত পাওয়া যেত, তার চাইতে কম ছিল । সুতরাং জমি ক্রয় করাটা কৃষিতে উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর চাইতে বেশী লাভজনক ছিল । ফলে বৃহৎ জোতদারদের জমির পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছিল এবং এর ফলশ্রুতিতে প্রান্তিক চাষী বা ভূমিহীন চাষীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছিল । এ প্রক্রিয়ায় সরকারী নীতিমালা সব সময়েই বৃহৎ চাষীদের সহায়ক ছিল । ফলে গ্রামীণ অর্থনীতিতে মেরুকরণ অত্যন্ত দ্রুতগতিতে এগুচ্ছিল এবং বেড়ে যাচ্ছিল গ্রামীণ দারিদ্র্যের আপাতন ।

পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে বোঝা যাচ্ছিল যে পাকিস্তানী রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে বাঙ্গালী জাতির জাতিগত স্বকীয়তা, রাজনৈতিক স্বায়ত্ব-শাসন, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও অগ্রগতি সম্ভব নয় । সুতরাং ধীরে ধীরে বিভিন্ন আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের জন্ম এবং ১৯৭১ সালে বাঙ্গালী জাতি আরেকবার নিজস্ব রাষ্ট্রকাঠামো গড়ে তোলার জন্য চূড়ান্ত সংগ্রামে লিপ্ত হয়, যার ফলশ্রুতিতে ১৯৭১ সালে জন্ম হয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের ।

আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট

বর্তমান বিশ্বের আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের অবস্থিতি ঐতিহাসিকভাবে দু'টো বিষয় দ্বারা নির্ণীত হয়েছে— প্রথমতঃ বহির্বিশ্বের পরিবর্তন এবং দ্বিতীয়তঃ বাংলাদেশর বৈদেশিক নীতি । এখানে এটা অবশ্য নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, এ ব্যাপারে দ্বিতীয় কারণটি প্রধান ভূমিকা নিয়েছে । আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারত ও সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব যে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছিল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন সরকার যে বৈরীভাব পোষণ করেছিল তা সর্বজনবিদিত । স্বাধীনতার পর রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সরকার ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রকে অন্যতম দু'টো রাষ্ট্রীয় মৌল আদর্শ বলে ঘোষণা করে । সুতরাং সে সময়ে আমাদের বৈদেশিক নীতি ছিল জোট নিরপেক্ষ, বিপদের বন্ধু বিশেষতঃ ভারত ও সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের সঙ্গে সহমর্মিতা এবং স্বাধীন একটি পররাষ্ট্রনীতির অনুসরণ। ধ্ব ংসপ্রাপ্ত বাংলাদেশ অর্থনীতির পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের জন্য বহির্বিশ্বের বিভিন্ন উৎস থেকে বিপুল পরিমাণে বৈদেশিক সাহায্য আসে, কিন্তু তার বেশীর ভাগই ছিল মানবিক কারণপ্রসূত এবং সে কারণে শর্তহীন । কিন্তু বাংলাদেশ অর্থনীতিকে একটি শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড় করানোর আগেই বহিঃবিশ্বের তৎকালীন ঘটনা প্রবাহ আমাদের অর্থনীতির ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া হানে । সেটি হচ্ছে ১৯৭৪ সালে আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্য শস্য, জ্বালানী তেলের মূল্যবৃদ্ধি, যা আমাদের বাণিজ্য ঘাটতিকে প্রকট করে তোলে ।

১৯৭৫ সালে সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে। '৭৫ উত্তরকালে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সরকার সমূহ রাষ্ট্রীয় দর্শনের দিক থেকে ব্যক্তিগত উদ্যোগ প্রসূত উন্নয়নে বিশ্বাসী হওয়ায় আমাদের রাষ্ট্রীয় মৌলনীতি থেকে সমাজতন্ত্র বাদ পড়ে। এর ফলশ্রুতিতে পুঁজিবাদী বিশ্ব বিশেষতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের বৈপ্লবিক উন্নতি ঘটে। অন্যদিকে অন্য একটি রাষ্ট্রীয় মৌলনীতি ধর্মনিরপেক্ষতা বাদ দেয়ার কারণে এবং ইসলামী আদর্শকে রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসেবে গ্রহণের ফলে ইসলামী বিশ্ব বিশেষ করে সৌদী আরব ও তার প্রতিবেশী দেশসমূহের সঙ্গে বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপিত হয়। এ সংযোগ স্থাপনের পেছনে দু'টো কারণ খুব জোরালো ছিল— প্রথমটি নিঃসন্দেহে দার্শনিক অভিন্নতা এবং দ্বিতীয়টি তেলের মূল্য বৃদ্ধির ফলে নব্য সম্পদের অধিকারী আরব বিশ্ব থেকে বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া।

পুঁজিবাদী বিশ্ব ও ইসলামী মহলের সঙ্গে সুসম্পর্কের ফলশ্রুতিতে প্রচুর পরিমাণ বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণ বাংলাদেশ লাভ করতে থাকে। দাতা দেশগুলোর দিক থেকে এ জাতীয় সাহায্য দেয়ার কারণ ছিল মূলতঃ তিনটি। প্রথমতঃ তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং তাদের স্বার্থরক্ষাকারী সরকারকে মদদ দেয়া, দ্বিতীয়তঃ তাদের দেশের বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য একটি বাজার প্রকল্প সাহায্যের মাধ্যমে এ দেশে সৃষ্টি করা এবং তৃতীয়তঃ স্বাধীনতার পর এ দেশে যে নব্য ধনিক শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে (যে সৃষ্টি প্রক্রিয়া সামাজিক প্রেক্ষাপট অংশে বর্ণিত হবে) সে শ্রেণীর সম্পদ বৃদ্ধিতে সাহায্য করা, যেহেতু এ শ্রেণীটি পুঁজিবাদী বিশ্বের ধনিক শ্রেণীর কনিষ্ঠ সহযোগী ও তাদের স্থানীয় স্বার্থরক্ষাকারীর ভূমিকা পালন করে বিশ্বস্ততার সাথে তাদের পারস্পরিক স্বার্থে। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ক্রমবর্ধমান ঋণ গ্রহণের মৌলিক কারণ হচ্ছে বর্ধিত বিনিয়োগ হার ও স্থবির দেশজ সঞ্চয় হারের মধ্যকার এবং বর্ধিত আমদানী ও ধীর-প্রসারমাণ রপ্তানী আয়ের মধ্যকার ফারাক পূরণ, আমদানী শুল্ক সরকারের প্রধানতম আয়ের উৎস বিধায় বৈদেশিক সাহায্যের মাধ্যমে অন্ততঃ বর্তমান আমদানীর মাত্রা বজায় রাখা এবং রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সরকারের ক্ষমতার উৎস শ্রেণী সমূহের সম্পদ বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি ও উন্নত বিশ্বে তাদের সমতুল্য শ্রেণীর বিদ্যমান ভোগের অনুকরণীয় ভোগ স্পৃহা মেটানো। বর্ধিত হারে বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ এবং ক্রমবর্ধমান আমদানীর মাধ্যমে বাংলাদেশ ক্রমান্বয়ে আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী বিশ্বের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত হয়ে গেছে। এ সম্পৃক্তকরণের ফলশ্রুতিতেই বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল ইত্যাদি সংস্থাগুলো আমাদের দেশজ নীতি প্রণয়নে শুধুমাত্র হস্তক্ষেপই করছে না, বরং সে নীতি নির্ধারণেও নিয়ামক ভূমিকা পালন করছে।

প্রশ্ন হচ্ছে আগামী বছরগুলোতে আমাদের অর্থনীতি যে আন্তর্জাতিক বিশ্ব ও প্রেক্ষাপটের মুখোমুখি হবে তার স্বরূপ কি হবে এবং তার সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কইবা কি হবে ? আন্তর্জাতিক বিশ্বে গত কয়েক বছরে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে যে প্রবণতা বিদ্যমান, তাতে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, ভবিষ্যৎ দিনগুলোতে পুঁজিবাদী বিশ্ব আরও বৃহত্তর সঙ্কটের মধ্যে পড়বে এবং অর্থনৈতিক মন্দা এ বিশ্বের পৌণঃপুনিক বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়াবে। সে অবস্থায় তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর রপ্তানীর বিরুদ্ধে

আন্তর্জাতিক বাজারে নানান ধরণের সংরক্ষণের দেয়ালই শুধু গড়ে উঠবেনা, আমদানীর ক্ষেত্রেও তারা নানা রকমের সমস্যার সম্মুখীন হবে। মন্দার কারণে এ সব দেশে বৈদেশিক সাহায্য আসার পরিমাণ হবে সীমিত এবং তার সঙ্গে যুক্ত থাকবে আরও কঠিন সব শর্ত। উন্নত দেশগুলো কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত সংস্থাসমূহের নিয়ন্ত্রণও তৃতীয় বিশ্বের অভ্যন্তরীণ নীতি নির্ধারণেও ক্রমবর্ধমান হারে হস্তক্ষেপ করবে। অন্যদিকে বাংলাদেশর ভবিষ্যৎ সরকারের শ্রেণীচরিত্র যদি বর্তমান সরকারের শ্রেণীচরিত্রের চেয়ে ভিন্নতর না হয়— যে সম্ভাবনাকে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আলোচনা করা হয়েছে— তা'হলে পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে বর্ণিত কারণ সমূহের জন্য বাংলাদেশ অর্থনীতি আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী বিশ্বের সঙ্গে আরও সম্পৃক্ত হয়ে যাবে। এ সম্পৃক্তকরণের প্রভাব যেমন আমাদের বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে পড়বে, তেমনি পড়বে আমাদের ভবিষ্যৎ অর্থনীতির ওপর। পুঁজিবাদী বিশ্বের সঙ্গে দৃঢ় সম্পর্কের কারণে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক হয়তো কিছুটা শিথিল হয়ে আসবে। সত্যিকার অর্থে— শেষোক্ত জোটের সঙ্গে আমাদের বিদ্যমান সম্পর্ক খুব একটা উষ্ণ নয়। তবে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের মধ্যে চীনের সঙ্গে আমেরিকার উষ্ণ সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের মধ্যে তুলনামূলকভাবে চীনা জোটের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের সম্ভাবনা বেশী। জোট নিরপেক্ষতার কথা আমাদের সরকার জোর গলায় সরবে বললেও জোটনিরপেক্ষতার প্রশ্নে আমাদের অনুসৃত নীতি খুব একটা জোরালো নয়। ভবিষ্যতেও এর বৈপ্লবিক পরিবর্তন আশা করা যায় না। ফলে তৃতীয় বিশ্বের সঙ্গে সংহতির প্রশ্নেও ভবিষ্যতে আমরা অত্যন্ত প্রগতিবাদী কিংবা নেতৃত্বমূলক ভূমিকা পালন করব, এটাও নিতান্ত দুরাশার সামিল। ইসলামী বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক জোরালোকরণের প্রশ্নে সরকার অত্যন্ত উদগ্রীব হবে নিঃসন্দেহে— এ ব্যাপারে বতমান প্রবণতাই সে দিকে ইঙ্গিত করছে। আমাদের দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা (সার্ক) গঠিত হয়েছে, যার প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। কিন্তু সার্কের অধিভুক্ত দেশসমূহের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থানের দিক থেকে আপেক্ষিক বৈষম্যের কারণে এ থেকে বাংলাদেশ কতখানি উপকৃত হবে, সে ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে।

ভবিষ্যতের আন্তর্জাতিক বিশ্ব ও সে প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের অর্থনীতিতে তার কি প্রভাব পড়বে, তা অর্থনৈতিক প্রক্ষেপণের সময়ে বিশদভাবে আলোচিত হবে এবং সে আলোচনায় আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটের বিভিন্ন আঙ্গিক ও মাত্রিকতা থেকে এ বিষয়টি আলোচনায় আমরা প্রয়াসী হব।

রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

১৯৭১ সালের স্বাধীনতার পরে যে জাতীয়তাবাদী সরকার বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়, তারা গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা জাতীয়তাবাদ এ চারটিকে রাষ্ট্রীয় মৌলনীতি হিসেবে গ্রহণ করে। নবগঠিত সরকারের সামনে লক্ষ্য ছিল তারা কি সিদ্ধান্ত ও কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক পুনর্গঠন, পুনর্বাসন ও উন্নয়নকে প্রাধান্য দেবে না কি দেশরক্ষা ও আইন-শৃংখলার চাহিদাকে মুখ্য ভূমিকা দেবে। তদানীন্তন সরকার প্রথমটির ওপরেই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে এবং দেশরক্ষাকে কম প্রাধান্য দেয়।

শেষোক্ত বিষয়ে কম গুরুত্ব দেয়ার কারণ ছিল যে তদানীন্তন সরকার প্রতিবেশী দেশসমূহ থেকে কোন রকমের আক্রমণ আশংকা করত না এবং বাংলাদেশের ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে সঙ্গত কারণেই এ দেশের জন্য একটি বিরাট সশস্ত্র বাহিনী রাখার প্রয়োজন অনুভব করেনি । তা ছাড়া এ জাতীয় প্রয়োজন অনুভব না করার আরও একটি মৌলিক কারণ আছে । পৃথিবীর বিভিন্ন নব্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশ বা যে সব দেশ পরোক্ষ বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত রয়েছে তারা তাদের রাজনৈতিক দূর্বলতার কারণে একটি শক্তিশালী সামরিক বাহিনীর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে । মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে যে সরকার বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তারা দূর্বল ছিল না । সুতরাং শক্তিশালী সামরিক বাহিনীর মদদ পুষ্ট হবার কোন প্রয়োজন তাদের ছিল না । তারা সঙ্গতভাবেই মনে করত যে দেশের অভ্যন্তরীণ আইন শৃংখলা রক্ষা ও সীমান্তে চোরাচালান রোধের জন্য পুলিশ, বাংলাদেশ রাইফেল্‌স এর মত প্রতিষ্ঠানকে জোরদার করাই যথেষ্ট । অন্যদিকে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্বাচিত সরকার দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করবে ।

এই দর্শনের ভিত্তিতে নবগঠিত রাষ্ট্রের প্রয়োজন অনুভব করে তদানীন্তন সরকার বাংলাদেশের ধ্ব ংসপ্রাপ্ত অর্থনীতিকে পূর্ণ উজ্জ্বীবিত করার লক্ষ্যে অর্থনৈতিক পুনর্গঠন, পুনর্বাসন ও উন্নয়নকেই তাদের মৌলিক কাজ হিসেবে চিহ্নিত করে । সমাজতন্ত্রকে অর্থনীতির মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয় এবং সমস্ত অর্থনীতির জন্য কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা গৃহীত হয় । প্রশাসনিক ও অনুৎপাদনশীল ব্যয়কে ন্যূনতম পর্যায়ে রাখার প্রচেষ্টা চালানো হয় । পরবর্তীতে বিশদভাবে নীতি গ্রহণ ও তার বাস্তবায়নের জন্য প্রশাসনিক ও পরিকল্পনার দিক থেকে বিকেন্দ্রীকরণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা হয় । পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় যে জেলা পর্যায়ে প্রশাসন ও উন্নয়নের দায়িত্বভার ন্যস্ত করা হবে জনপ্রতিনিধিদের ওপর, যারা স্থানীয় প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশাসন পরিচালনা করবেন এবং স্থানীয় উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করে তা বাস্তবায়িত করবেন । এর মূল লক্ষ্য ছিল দু'টো, প্রথমতঃ কেন্দ্রীয় প্রশাসনের বজ্রমুষ্ঠি থেকে স্থানীয় প্রশাসন ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে মুক্তি দেয়া এবং দ্বিতীয়তঃ উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিবর্গের কর্মকাণ্ডকে সরাসরিভাবে জনগণের কাছে দায়ী করা ।

১৯৭৫ সালের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের কারণে এ পরিকল্পনা কখনোই বাস্তবায়িত হয়নি । ১৯৭৫ সালের পরে যে সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়, তারা চিন্তায়, দর্শনে, কর্মে ছিল ১৯৭২-এর সরকার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা । বেসরকারী খাতকেই অন্যকথায় পুঁজিবাদী উন্নয়নের ধারাকেই উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে উৎসাহিত করা হয় এবং স্বাভাবিকভাবেই পরিকল্পিত অর্থনীতির দর্শনকে কম গুরুত্ব দেয়া হয় । কেন্দ্রীয় শাসন ক্ষমতাকে আরও কেন্দ্রীভূত করা হয় এবং সরকার পরিচালনার ব্যয় অত্যন্ত বেড়ে যায় । সশস্ত্র বাহিনীকে সম্প্রসারিত ও পুনর্গঠিত করা হয় এবং দেশরক্ষা খাতে ব্যয় সর্বাধিক স্তরে উন্নীত করা হয়, শুধু তাই নয়, বরং দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সশস্ত্র বাহিনী একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয় পাকিস্তানী ঐতিহ্যের সূত্র ধরে । এর সহযোগী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে বাংলাদেশ আমলের শুরুতে অবদমিত আমালতন্ত্র এবং সরকারের আনুকূল্য লাভকারী একটি ধনিক শ্রেণী । রাষ্ট্রক্ষমতার মূল উৎস হয়ে দাঁড়ায় এই তিনশ্রেণী । পুঁজিবাদী বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্কের

কারণে যে প্রচুর মূলধন বিদেশ থেকে আসতে থাকে তার মাধ্যমে সৃষ্ট সুবিধা ও সম্পদের সিংহভাগ এ শ্রেণীগুলো ভোগ করতে থাকে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের একটি সহযোগী শ্রেণী গ্রাম-বাংলায় সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে এ সম্পদের একটা অংশ গ্রামের স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে জড়িত প্রতিপত্তিশলালী ও ধনিকশ্রেণীর হাতে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয় । তথাকথিত গ্রাম-উন্নয়নের নামে এ প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয় । সুতরাং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যে একটি কেন্দ্র- পরিসীমা সম্পর্ক ছিল উন্নত ও অনুন্নত বিশ্বের মধ্যে; অনুন্নত দেশসমূহের, যার মধ্যে বাংলাদেশও অন্তর্ভুক্ত, অভ্যন্তরীণ কাঠামোর মধ্যেও সে রকমের একটি কেন্দ্র পরিসীমা সম্পর্কের বিস্তৃতি ঘটে ।

১৯৮২ সালে আবার রাজনৈতিক পরিবর্তন কিছুই হয়নি, যতটা হয়েছে ক্ষমতার হাত বদল । পুরো দেশকে সামরিক শাসনের অধীনে নিয়ে আসা হয় । সশস্ত্র বাহিনীর ক্ষমতাকে শুছু সংহতই করা হয়নি, দেশীয় কর্মকাণ্ডের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের অনুপ্রবেশ ঘটে যা পূর্ববর্তী সরকারের আমলে ঘটেনি । প্রশাসনিক দিক থেকে বিকেন্দ্রীকরণের নামে উপজেলা প্রশাসনের সৃষ্টি হয়, যার আসল উদ্দেশ্য কেন্দ্রীয় সরকারের রাষ্ট্রক্ষমতায় যারা জড়িত তাদের আনুকূল্য আশ্রয়ী শ্রেণীকে স্থানীয় পর্যায়ে ক্ষমতার অধিকারী করা, যে সম্পর্কে থেকে ক্ষমতার প্রশ্নে সম্পদ ভাগাভাগির প্রশ্নে উভয় দলই লাভবান হতে পারে । অর্থনৈতিক দিকে থেকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে আরও পাকাপোক্ত করার সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, যে সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় নির্দেশ ও সাহায্য যোগায় বিশ্বব্যাংক ও মার্কিন সাহায্য সংস্থাগুলোর মত সংস্থাগুলো । বর্তমান বছরে একটি তথাকথিত গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মাধ্যমে সামরিক শাসন অপসৃত হয়েছে এবং একটি অসামরিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সত্য, কিন্তু তার সঙ্গে সামরিক শাসনামলের সরকারের সঙ্গে মৌলিক পার্থক্যতো দূরের কথা, বাহ্যিক পার্থক্যও নেই ।

১৯৭৫ পরবর্তী সব সরকারের মত বর্তমান সরকারেরও ক্ষমতার মূল উৎস— সেনাবাহিনী, আমলাতন্ত্র ও একটি ধনিকশ্রেণী । কোন কোন ক্ষেত্রে এরা পরস্পর পরস্পর থেকে অভিন্ন। শাসনতন্ত্রে স্থায়ীভাবে সেনাবাহিনীর ভূমিকাকে চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে বলে শোনা যায় । বর্তমান সরকারের পরিচালকেরা বুর্জোয়া শ্রেণীর রক্ষক না হয়ে নিজেরাই বুর্জোয়া শ্রেণীতে পরিণত হয়েছে । সরকারের ক্ষমতার উৎস যারা তাদের সন্তুষ্ট রাখার জন্য তার প্রয়োজন হচ্ছে অধিকতর সম্পদের, অথচ বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ প্রকৃত অংকে কমে যাচ্ছে। এ অবস্থায় সরকারকে দেশজ সম্পদ আহরণে দমনমূলক কিছু ব্যবস্থা নিতে হবে । ফলশ্রুতিতে একদিকে যেমন উন্নয়নের জন্য অর্থের যোগান কমে যাবে, তেমনিভাবে নষ্ট হবে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা । যার কিছু কিছু লক্ষণ আমরা এখনই লক্ষ্য করছি । সম্পদ পাচার হয়ে যাচ্ছে বিদেশে ক্রমবর্ধমান হারে । শুধু সম্পদ পাচারই নয়, উচ্চবিত্তের মানুষেরা তাদের ছেলেমেয়েদের বিদেশে শিক্ষা দিচ্ছে এবং দেশের বাইরে চাকুরী নিয়ে দেশ ত্যাগের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যারা যেতে পারবে না তাদের কষ্ট ক্রমবর্ধমান সামাজিক সংঘাতে বাড়বে । তাই শুধু আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর নির্ভর না করে ফাসিস্ত কায়দায় একটি নিপিড়ণমূলক সংগঠন গড়ে তুলতে তারা প্রবৃত্ত হবে ।

গ্রাম কিংবা শহরে দারিদ্র্যের আপাতন ক্রমবর্ধমান হারে বেড়ে যাচ্ছে, ভবিষ্যতে এ

প্রক্রিয়ার কারণে সমাজে মেরুকরণ বেড়ে যাবে দ্রুত । গ্রামীণ সমাজে গত কয়েক দশক ধরে ভূমিহীনতা ক্রমাগত ভাবে বেড়ে গেছে এবং ভবিষ্যতেও এ প্রবণতা অব্যাহত থাকবে । নাগরিক জীবনেও দুঃসময় বেড়ে যাচ্ছে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জন্য । এ সবের পরিপ্রেক্ষিতে আগামী দিনগুলোতে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট কি হবে ? সময় যতই যাচ্ছে, বিকল্প ব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে, ততই বর্তমান সরকার তাদের অবস্থানকে সংহত করবে এবং তাদের গণবিরোধী কার্য-কলাপ চালিয়ে যাবে ।

সামাজিক প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশের মত দেশের সামাজিক প্রেক্ষাপট অত্যন্ত বিস্তৃত এবং এর নানান দিক আছে । এর একদিকে যেমন আছে সামাজিক শ্রেণী বিন্যাস, তেমনি তার অন্যদিকে রয়েছে পারিবারিক সংগঠন, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, জনগণের দৃষ্টিভঙ্গী, মূল্যবোধ ইত্যাদি বিষয়গুলো । সামাজিক শ্রেণী বিন্যাসের দিক থেকে বিচার করলে ১৯৭২ সাল থেকেই সব সরকারের আমলে রাষ্ট্রযন্ত্রের আনুকূল্যে একটি নব্য ধনিক শ্রেণী সৃষ্টি হয়েছে । এ প্রক্রিয়া অত্যন্ত ধীরগতিতে শুরু হয়েছিল ১৯৭২-৭৫ সময়কালের মধ্যে, বিস্তারলাভ করেছে ১৯৭৫-৮২ সালের মধ্যে এবং অত্যন্ত সংগত রূপ লাভ করেছে বর্তমান সময়ে । সত্যিকার অর্থে বর্তমান সময়ে এ ধনিকশ্রেণী ও রাষ্ট্রযন্ত্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত লোকজন অভিন্ন ব্যক্তিত্ব । এদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে এদের যোগাযোগ ঘনিষ্ট নয়, বরং এদের সম্পদের স্ফীতি ঘটেছে ব্যবসা, ঠিকাদারী, আমদানী-রপ্তানীর সঙ্গে এদের সংযুক্তির মাধ্যমে । এরা রাষ্ট্রীয় অর্থ ও সম্পদের সিংহভাগ নিয়ে নিচ্ছে এবং তা গচ্ছিত রাখছে রাষ্ট্রের বাইরে । এ ধনিক শ্রেণীর সংখ্যা ধীরগতিতে হলেও ক্রমান্বয়ে বাড়ছে । অন্যদিকে যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী আমাদের সব সংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়েছে, তারা ভেঙ্গে যাচ্ছে অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে । সামাজিক শ্রেণী বিন্যাসের ভাঙ্গন পরিলক্ষিত হচ্ছে সমভাবে গ্রামীণ ও নাগরিক সমাজে ।

পারিবারিক সংগঠনের দিক থেকে বিচার করলে এ দেশের এ সংগঠনের দু'টো প্রবণতা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে । প্রথমতঃ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একান্নবর্তী পরিবার ভেঙ্গে গ্রামে কিংবা শহরে একক পরিবার গড়ে উঠছে এবং দ্বিতীয়তঃ শহরাঞ্চলে এবং কিছুটা গ্রামাঞ্চলেও পরিবার পরিকল্পনার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ছোট পরিবারকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে । আগামী বছরগুলোতে এ প্রবণতা অক্ষুন্ন থাকবে বলে মনে হয় । পরিবারের মধ্যে নারীর মর্যাদাকে নতুন আঙ্গিক থেকে দেখা হচ্ছে এবং নারী তার পারিবারিক গণ্ডী ছাড়িয়ে বাইরের কর্মক্ষেত্রে অধিক সংখ্যায় বেরিয়ে আসছে । ফলে পরিবারের আঙ্গিনায় জীবন-যাত্রার অভ্যাস পাল্টাচ্ছে, পাল্টাচ্ছে খাদ্যাভ্যাস ও ভবিষ্যতে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী বিশেষতঃ মধ্যবিত্তদের মধ্যে মেয়েদের শিক্ষার হার দ্রুত বাড়বে এবং তারা অধিকসংখ্যায় মজুরী বা বেতন ভিত্তিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করবে ।

এ জাতীয় পরিবর্তনের অন্যতম কারণ হবে ভবিষ্যতে গ্রাম ও শহর উভয়াঞ্চলে শিক্ষা ও গণমাধ্যমের— সংবাদপত্র, রেডিও ও টেলিভিশনের প্রসার । আবার অন্যদিকে এ শতাব্দী নাগাদ বাংলাদেশের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী ও মূল্যবোধ কি হবে তার অনেকটাই

নির্ভর করবে ভবিষ্যতে শিক্ষা ও গণমাধ্যমের প্রসারের এবং তার প্রকৃতির ওপর । শিক্ষা বা গণমাধ্যম যদি গণমুখী না হয়, তা'হলে তা একটি বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থই রক্ষা করবে, বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কোন উপকারে আসবে না । এ ছাড়াও এ প্রক্রিয়া সামাজিক অপরাধ বাড়াবে যার ফলশ্রুতিতে সমাজে আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটবে । অবশ্য এর অন্যতম কারণ হবে ভবিষ্যতের সামাজিক সংঘাতও ।

ভবিষ্যতের সমাজকাঠামোর ওপর প্রযুক্তির একটা প্রভাব পড়বে । প্রযুক্তি বলতে আমরা শুধু যন্ত্রকেই বোঝাচ্ছি না বরং মানুষের জ্ঞান ও দক্ষতার দিগন্তকেও বোঝাচ্ছি। সেই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করলে প্রযুক্তির উন্নয়নের উপরই নির্ভর করছে ২০০০ সালে এদেশের সমাজ কি কাঠামো গ্রহণ করবে । আজ তথ্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের আদান-প্রদানের দ্রুততার কারণে সারা বিশ্ব ছোট হয়ে আসছে এবং আমরাও বিশ্বের অন্যান্য অংশের উন্নয়ন, সেখানকার জীবনযাত্রার মান সম্পর্কে অতি দ্রুত অবহিত হচ্ছি। এ শতাব্দী শেষে বাংলাদেশে কি জাতীয় মানুষ চাই, সমাজের কি রূপরেখা আমাদের কাম্য, সে লক্ষ্যে পৌছুতে হলে আমাদের প্রয়োজন যথাযথ প্রযুক্তির, যার ভিত্তি হবে দেশজ সম্পদ ও জ্ঞান । কিন্তু সেটা আমরা ততক্ষণ অর্জন করতে পারব না, যতক্ষণ আমাদের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল থাকবে । কারণ বৈদেশিক সাহায্য প্রযুক্তিনিরপেক্ষ নয় এবং যে প্রযুক্তি হবে নিঃসন্দেহে পুঁজিঘন । সে জাতীয় প্রযুক্তির অনুপ্রবেশ ও প্রসার এদেশের মানুষের মন, মানসিকতা ও জীবনকে প্রভাবিত করবে নিশ্চিতভাবে ।

তবে অর্থনীতিতে যত শিল্পের প্রসার ঘটবে, যত উন্নততর প্রযুক্তির অনুপ্রবেশ ঘটবে, ততই এদেশের মানুষের জীবনের জটিলতা বাড়বে, সামাজিক জটিলতাও বৃদ্ধি পাবে । সে জটিলতার কারণে আগামী দিনের মানুষের বিভিন্ন সত্ত্বার মধ্যে বিরোধ ঘটবে, দ্বন্দ অনিবার্য হয়ে উঠবে আমাদের ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহারের মধ্যে । ব্যক্তি মানুষ আর সামগ্রিক সমাজের মিত্রক্রিয়ার মাধ্যমেই গড়ে উঠবে এ শতাব্দীর শেষ নাগাদ এ দেশের সমাজ কাঠামো ।

২০০০ সালের বাংলাদেশ— অর্থনৈতিক প্রক্ষেপণ

পূর্ববর্তী অংশে ২০০০ সাল নাগাদ বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট আলোচিত হয়েছে । এ বৃহত্তর প্রেক্ষিত কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে প্রভাবিত করে নিঃসন্দেহে, কিন্তু এ বৃহত্তর প্রেক্ষাপটের মধ্যে একটি আপেক্ষিক ক্ষুদ্রতর প্রেক্ষিত থাকে, যা অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত । এ প্রেক্ষিতকে সীমিত সংজ্ঞায় একটি দেশের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বলা যেতে পারে । ২০০০ সাল নাগাদ বাংলাদেশর একটি অর্থনৈতিক প্রক্ষেপণ করার আগে এ শতাব্দী শেষে এ কাঠামোর কোন কোন দিকের ভবিষ্যত রূপরেখা সম্পর্কে আলোচনা করতে আমরা প্রয়াসী হব ।

বাংলাদেশের ভবিষ্যত অর্থনৈতিক উন্নয়নে আমাদের প্রাকৃতিক ও মানব-সম্পদের ভবিষ্যত অবস্থা অন্যতম নিয়ামক ভূমিকা পালন করবে । আমাদের জ্ঞাত প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে প্রাকৃতিক গ্যাস অন্যতম । ১৯৮৫ সালের বাংলাদেশ জ্বালানী পরিকল্পনা

প্রকল্পের বিবরণীতে অনুমতি হয়েছে যে, ২০০০ সালে নাগাদ পূর্বাঞ্চল ভূমিতে অবস্থিত গ্যাসকূপগুলোতে ১০ ট্রিলিয়ন কিউবিক ফিট এবং সমুদ্রের গ্যাসকূপে আরও ১ ট্রিলিয়ণ কিউবিক ফিট গ্যাসের সঞ্চয় থাকবে। সে প্রকল্পের বিবরণীতে এ অনুমানকে অত্যন্ত বাস্তব সম্মত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে অন্য আর একটি প্রাকৃতিক সম্পদ আমাদের উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। সেটি হচ্ছে আমাদের পানি সম্পদ। অথচ প্রতি বছর বন্যা বা প্লাবনের কারণে এটি আমাদের সম্পদ না হয়ে দায় হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং প্রাকৃতিক সম্পদকে ভবিষ্যতে আমাদের আরও সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগাতে হলে দু'টো জিনিস নিশ্চিত করতে হবে। প্রথমতঃ সম্পদ যাতে দায় না হয়ে ওঠে তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং দ্বিতীয়তঃ যে সব সম্পদ অনাবিষ্কৃত ও অনাহরিত রয়ে গেছে, তার আবিষ্কার, আহরণ ও ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

প্রাকৃতিক সম্পদের উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে মানব-সম্পদ উন্নয়নও অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম পূর্ব শর্ত। মানব-সম্পদ উন্নয়নের দু'টো দিক আছে— একদিকে শিক্ষার প্রসার, অন্যদিকে স্বাস্থ্য ও সুচিকিৎসা নিশ্চিতকরণ। শিক্ষার প্রশ্নে একটি কথা আমরা প্রথমেই বলতে পারি যে, প্রাথমিক শিক্ষা মানুষের ন্যূনতম মানবিক প্রয়োজনের একটি। ১৯৮৫ সালে এ দেশের ৬ থেকে ১০ বছর শিশুদের সংখ্যা ছিল ১৪.৭ মিলিয়ন যার মধ্যে মাত্র ৮.৭ মিলিয়নের (শতকরা প্রায় ৬০ ভাগের) স্কুলের খাতায় নাম ছিল [১৪]। সত্যিকারভাবে যারা নিয়মিত স্কুলে যায়, তাদের সংখ্যা আরও অনেক কম। যাদের খাতায় নাম আছে, তাদের সঠিকভাবে শিক্ষা দিতে হলে ০.১৫ মিলিয়ন প্রাইমারী শিক্ষক, ০.০৯ মিলিয়ন শ্রেণীকক্ষ এবং ৩০ মিলিয়ন বইয়ের প্রয়োজন। বলা নিষ্প্রয়োজন, আমাদের দেশের প্রাইমারী শিক্ষার অবস্থা এ প্রয়োজন থেকে বহুদূরে। বিশ্বব্যাংক প্রাক্কলন করেছে যে ২০০০ সাল নাগাদ এ দেশে ৬ থেকে ১০ বছরের শিশুর সংখ্যা হবে ১৬.৪ থেকে ১৯.৯ মিলিয়নের মধ্যে, যার মধ্যে শতকরা ৭৩ থেকে ৮৯ ভাগ স্কুলে নাম লেখাবে [১৪]। তবে বিশ্বব্যাংক এক প্রশ্নে নিরব থেকেছে যে, এ শেষোক্ত সংখ্যা-এর অতীত প্রবণতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা কিংবা নাম লেখানো ছাত্র-ছাত্রীর কতজন শেষ পর্যন্ত টিকে থাকবে। যারা নাম লেখাবে তারা সবাই যদি শেষ পর্যন্ত স্কুল ছেড়ে না দেয়, তা'হলে এ শতাব্দী নাগাদ ০.২৪ মিলিয়ন প্রাইমারী শিক্ষক ও ০.১৪ মিলিয়ন শ্রেণীকক্ষ প্রয়োজন হবে। শতকরা ৫০ ভাগ বই পুনর্বার ব্যবহৃত হবে এবং প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে দু'টো ছাত্রের জন্য একটি পাঠ্য-পুস্তক এ হিসেবে ২০০০ সাল নাগাদ প্রাথমিক পর্যায়ে ২৭ মিলিয়ন পাঠ্য-পুস্তক লাগবে। সুতরাং প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে এ শতাব্দী নাগাদ সবার জন্যে ন্যূনতম প্রাথমিক শিক্ষা দেয়া কি সম্ভব হবে ?

প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে ২০০০ সাল নাগাদ সবার জন্য স্বাস্থ্য প্রশ্নেও। দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় মোট ব্যয়ের শতকরা ৪.৯ ভাগ বরাদ্দ ছিল স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা খাতে। অথচ অন্য সব কথা বাদ দিলেও প্রতিষেধক প্রকল্পের অধীনের যাদের আনার কথা ছিল, সে লক্ষ্যমাত্রার মাত্র শতকরা ২ ভাগ অর্জিত হয়েছে দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকলপনার আওতায়। সাম্প্রতিক সময়ে মাথাপিছু হাসপাতাল, শয্যার সংখ্যা কিংবা প্রতিজন ডাক্তারের ক্ষেত্রে রোগীর সংখ্যা ইত্যাদি সূচকের ক্ষেত্রে সমষ্টিগত দিক থেকে কিছুটা উন্নতি হয়েছে সত্য, কিন্তু এদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য বা চিকিৎসা সুবিধার

তেমন কিছু উন্নতি হয়নি, বরং অবনতিই ঘটেছে । ১৯৮০ সালে গ্রামাঞ্চলে প্রতি হাজারে যেখানে শিশু মৃত্যু হার ছিল ১০৩.৫; ১৯৮২ সালে তা গিয়ে দাঁড়ায় ১২০.৮ । শতকরা মাত্র ৪.৯ ভাগ গ্রামে একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে । ১৯৮১-৮২ সালে প্রতিবছর প্রতিটি গৃহস্থালীর মাত্র ১৯ টাকার ঔষধ লভ্য ছিল [১] । সুতরাং ২০০০ সাল নাগাদ বর্তমান দেয় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এ ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন হবে, টো ভাবা বাতুলতা মাত্র ।

ভৌত অবকাঠামোর ক্ষেত্রে সড়ক ও রেলপথের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে সত্য, কিন্তু নদীর নাব্যতা কমে যাওয়ায়, জলযানের প্রযুক্তিগত উন্নতি কম হওয়ায় নদী পথের উন্নতি ততটা লক্ষ্যণীয় নয় । তবু সামগ্রিকভাবে যোগাযোগ ব্যবস্থার বেশ উন্নতি হয়েছে । ভবিষ্যতে এ উন্নয়ন ধারার ওপর দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়া অনেকাংশে নির্ভর করবে । তবে এ উন্নয়নের একটি বিরূপ প্রতিক্রিয়া গ্রামীণ অর্থনীতিতে পড়ছে । যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে গ্রামীণ অর্থনীতি নগর কেন্দ্রের বাজারের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে গেছে নিবিড়ভাবে । ফলে গ্রামে উৎপাদন ব্যবস্থা স্থানীয় চাহিদা মেটানোর পরিবর্তে নগর কেন্দ্রের চাহিদা মেটানোর কাজেই ব্যবহৃত হচ্ছে। এতে গ্রামের বিত্তশালী কৃষক বা মধ্য স্বত্ত্বলোপী একটি শ্রেণী লাভবান হচ্ছে নিঃসন্দেহে, কিন্তু তা দরিদ্র চাষী যে সরাসরিভাবে নগর-কেন্দ্রের বাজারের সঙ্গে জড়িত নয়, তার কোন লাভ হচ্ছে না । ভবিষ্যতে উপরোল্লিখিত সম্পৃক্তিকরণ আরও বাড়লে গ্রামীণ আয়ের বৈষম্য আরও বেড়ে যেতে বাধ্য ।

আগামী দিনগুলোতে এদেশের বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামোও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে প্রভাবিত করবে । ইদানীংকালে গ্রামাঞ্চলে সম্পদ বিতরণ স্থানীয় পর্যায়ের প্রশাসন কাঠামোর মধ্য দিয়ে করার ব্যবস্থা এবং ক্রমাগতভাবে বন্টন ব্যবস্থার বেসরকারীকরণ করার ফলে গ্রামের দরিদ্র শ্রেণী সম্পদের উৎপাদন উপাদানের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। 'কাজের বিনিময়ে খাদ্য' ইত্যাদি কর্মসূচী কিংবা স্বেচ্ছাসেবী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নেয়া প্রকল্প জরুরী স্বল্প মেয়াদী ব্যবস্থা বলে ধরে নেয়া যেতে পারে । কিন্তু এ সব কর্মসূচী গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে আত্মতোষণ পর্যায়েই রেখে দেবে এবং কোন অবস্থাতেই গ্রামীণ অর্থনীতিতে দীর্ঘ মেয়াদী উন্নয়নের গতিময়তা সৃষ্টি করবে না । শিল্পখাতে সরকারী খাতকে ক্রমশঃ ছোট করে নিয়ে আসা হচ্ছে এবং শিল্প, ব্যাংক, বীমা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানগুলোকে বর্ধিত হারে বেসরকারী খাতে ফেরত দিয়ে দেয়া হচ্ছে। এর ফলে যারা ইতিমধ্যেই রাষ্ট্রযন্ত্রের আনুকূল্যে সম্পদ কুক্ষিগত করেছে, তারাই এ বিরাষ্ট্রীকৃত প্রতিষ্ঠানের মালিকানা লাভ করছে । এর ফলে নগর অর্থনীতিতেও সম্পদের বৈষম্য বাড়ছে । সামাজিক দিক থেকেও শ্রেণীগত সচলতা অনেক কমে গেছে । সুতরাং সামাজিক শ্রেণী বিন্যাসের নীচের থেকে ওপরে ওঠা অনেক কষ্টসাধ্য, যেহেতু সে ওঠার জন্য যে যে জিনেসের প্রয়োজন তার প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা আছে এবং তা ডিঙানো দুঃসাধ্য প্রায় । সুতরাং সমাজে উর্ধগামী উল্লম্ফন সচলতায় প্রবেশাধিকার নিতান্ত সীমিত । দেশের মধ্যে আঞ্চলিক সচলতা যোগাযোগ, সংবাদ আদান-প্রদানের উন্নতি এবং অর্থনৈতিক প্রয়োজনের ফলে অনেক বেড়েছে । আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সত্তুরের দশকে যে সচলতা পরিলক্ষিত হয়েছিল, আশির দশকে এসে আন্তর্জাতিক বিশ্বের মন্দা এবং

ফলশ্রুতিতে উন্নত দেশসমূহের সংরক্ষণশীল নীতির ফলে তা অনেক কমে গেছে ।

রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আমলাতন্ত্র অত্যন্ত শক্তিশালী, তেমনি শক্তিশালী নব্য একটি ধনিক শ্রেণী । ইদানীংকালে দেশের সবচেয়ে শক্তিশালী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে সশস্ত্র বাহিনী । এ অবস্থায় দেশের পেশাজীবীরা প্রত্যেক দলের স্বার্থকে সামগ্রিক স্বার্থ থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় দেখছে । ফলে দেশে আন্দোলন হচ্ছে, তবে সেটা পেশাভিত্তিক আন্দোলন । সে আন্দোলনে দেশের জনগণের বেশীর ভাগের কোন অংশগ্রহণ নেই, যার ফলে বর্তমানের অনভিপ্রেত আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বদলানোর জন্য একটি গণ আন্দোলন গড়ে তোলা যাচ্ছে না । এ অবস্থা চলতে থাকলে এবং যথাযথ নেতৃত্বের অভাব থাকলে অবস্থা যতই বিস্ফোরন্মুখ হোক না কেন, তা একটি গণ আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়ে বর্তমান অবস্থাকে বদলাবে না ।

এ আর্থ-সামাজিক অবকাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এ শতাব্দীর শেষ নাগাদ বাংলাদেশের জন্য একটি অর্থনৈতিক প্রক্ষেপণে ব্রতী হব । অর্থনৈতিক প্রক্ষেপণের কতগুলো সূচককে আমরা চিহ্নিত করেছি যার ক্ষেত্রে প্রক্ষেপণ পরিচালিত হবে । এ সব সূচকগুলো হচ্ছে জনসংখ্যা, নগরায়ণ, শ্রমশক্তি, মোট জাতীয় উৎপাদন, তার কাঠামো ও বন্টন, খাদ্য চাহিদা ও ঘাটতি, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ, রপ্তানী ও আমদানী এবং বৈদেশিক সাহায্য । আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি এ সব সূচকের ভবিষ্যৎ গতিধারাই নির্ধারণ করবে ২০০০ সাল নাগাদ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে ।

জনসংখ্যা

জনসংখ্যার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বর্তমানে এক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে । দেশে কয়েক দশক ধরে অশোধিত মৃত্যুহার উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে । অশোধিত জন্মহারও কমে এসেছে, যদিও এক্ষেত্রে হ্রাসের হার সম্পর্কে কোন সঠিক ধারণা করা রীতিমত কষ্টকর । উপাত্ত ভিত্তির দূর্বলতার কারণে ঠিক কত বছর পরে এদেশে নীট প্রজনন হার এককে এসে দাঁড়াবে সে সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট উপসংহারে উপনীত হওয়া নিতান্ত দুঃসাধ্য ।

বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ জনসংখ্যা সম্পর্কে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার প্রক্ষেপণ রয়েছে । প্রজনন ও মৃত্যুহার সম্পর্কে অনুমানের নানান রকম ভিন্নতা থাকার কারণে তাদের ফলাফলেও দুস্তর পার্থক্য বিদ্যমান । সবচাইতে আশাবাদী প্রক্ষেপণে অনুমিত হয়েছে যে প্রজনন হার ১৯৮১ সালের ৬.৩ থেকে ২০০১ সাল নাগাদ ২.১ এ নেমে আসবে এবং এদেশে জন্মের সময়ে যে আয়ুর আশা থাকে যদি বাস্তবে আয়ুষ্কাল সেই ৪৮ বছরই থাকে তা'হলে ২০০০ সাল নাগাদ বাংলাদেশে জনসংখ্যা দাঁড়াবে ১১৬ মিলিয়নে । অন্যপ্রান্তে সবচাইতে নৈরাশ্যবাদী প্রক্ষেপণে বলা হয়েছে যে, বর্তমানের প্রজনন হার যদি এ শতাব্দীর শেষ নাগাদ অপরিবর্তিত থাকে কিন্তু মানুষের আয়ুষ্কাল বেড়ে যদি ৬০ বছরে পৌছায় তা'হলে ২০০০ সালে আমাদের জনসংখ্যা হবে ১৬৪ মিলিয়ন । অন্যসব প্রক্ষেপণের ফলাফল এ দু'প্রান্তসীমার মধ্যে অবস্থান করছে এবং এর মধ্যে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, বিশ্ব ব্যাংক ও পরিকল্পনা কমিশনের প্রক্ষেপণের ফলাফল সারণী ১ এ

দেয়া হল । এ সব প্রক্ষেপণের ফলাফলের ভিন্নতার কারণ হচ্ছে তাদের অনুমানের ভিন্নতা; যেমন বিশ্বব্যাংকের প্রথম প্রাক্কলনে অনুমিত হয়েছে যে ২০০৫ সাল নাগাদ এদেশে নীট প্রজনন হার হবে এক, অন্যদিকে তাদের দ্বিতীয় প্রাক্কলনে অনুমিত হয়েছে যে, ২০৩৫ সাল নাগাদ এদেশে নীট প্রজনন হার এককে এসে দাঁড়াবে ।

পরিকল্পনা কমিশনের প্রক্ষেপণ সম্পর্কে কিছু বক্তব্য প্রয়োজন । এ প্রক্ষেপণটি ১৯৮৩ সালে করা হয় এবং অন্যান্য দু'টো প্রতিষ্ঠানের প্রাক্কলনের তুলনায় এখানে প্রাক্কলিত সংখ্যাটি অপেক্ষাকৃতভাবে অনেক কম ।

সারণী ১.

বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রক্ষেপণ

(মিলিয়নে)

সংস্থা		বছর ১৯৮১	বছর ২০০০ (প্রক্ষেপিত)
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো	প্রক্ষেপণ ১	৮৯.৯	১৪২.১
	প্রক্ষেপণ ২	৮৯.৯	১৩৯.৭
	প্রক্ষেপণ ৩	৮৯.৯	১৩১.৭
বিশ্বব্যাংক	প্রক্ষেপণ ১	৮৯.৯	১২৬.৬
	প্রক্ষেপণ ২	৮৯.৯	১৪১.০
পরিকল্পনা কমিশন		৮৯.৯	১২৮.৩

সূত্র ঃ [৫,১৩,৯]

সারণী ২

বর্তমান প্রবন্ধ অনুসারে বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রক্ষেপণ

(মিলিয়নে)

	১৯৮১	২০০০ (প্রক্ষেপিত)
মোট জনসংখ্যা	৮৯.৯	১৪১.১
পুরুষ	৪৬.৫ (৫১.৭%)	৭৩.০ (৫১.৯%)
মহিলা	৪৩.৪ (৪৯.৩%)	৬৮.১ (৪৯.১%)

(বন্ধনীর মধ্যকার সংখ্যাসমূহ প্রাসঙ্গিক উপাত্তকে শতকরা হিসাবে দেখিয়েছে ।

প্রশ্ন হচ্ছে পরিকল্পনা কমিশনের প্রাক্কলনটি কতখানি যৌক্তিক ? দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনায় লক্ষ্য ছিল যে ১৯৯০ সাল নাগাদ এদেশে নীট প্রজনন হার এককে নামিয়ে নিয়ে আসা হবে যার পরিপ্রেক্ষিতে এদেশের সন্তান-উৎপাদনক্ষম দম্পতিদের শতকরা ৩৭.৫ ভাগকে পরিবার পরিকল্পনার আওতায় নিয়ে আসা হবে । এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে এ লক্ষ্যমাত্রার ধারে কাছেও আমরা যেতে পারিনি, যার পরিপ্রেক্ষিতে তৃতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনায় লক্ষ্য নির্ধারিত হয়েছে যে ২০০০ সাল নাগাদ এ দেশের নীট প্রজনন হারকে এককে নিয়ে আসতে হবে । বর্তমানে সরকার বলছেন যে, তৃতীয় পরিকল্পনার শেষ বছরে তারা জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বর্তমান শতকরা ২.৪ ভাগ থেকে শতকরা ১.৮ এ নিয়ে আসতে প্রয়াসী । এটা করতে হলে অশোধিত জন্মহারকে প্রতিহাজারে ৩৯ জন থেকে ১৯৯০ সাল নাগাদ প্রতিহাজারে ৩১ জনে নিয়ে আসতে হবে এবং এর জন্য হাতে সময় আছে ৩ বছরের মত । যে দেশে এখনও শতকরা ৭৫ ভাগ সন্তান-উৎপাদনক্ষম দম্পতি পরিবার পরিকল্পনার আওতার বাইরে, সেখানে এ লক্ষ্যমাত্রা কি নিতান্ত স্বাপ্নিক নয় ?

যেহেতু আগামী বছরগুলোতে অশোধিত জন্ম ও মৃত্যু হার সম্পর্কে কোন সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছানো নিতান্ত দুষ্কর, সেখানে যদি নিতান্ত সরল এ অনুমানটিও ধরা হয় যে আগামী ১৪ বছরে এদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১৯৮১ সালের জনগণনায় নিরূপিত হার অর্থাৎ শতকরা ২.৪ ভাগ হারে বৃদ্ধি পাবে, তা'হলে যে চিত্রটি আমরা পাই তা রীতিমত ভয়াবহ । ২০০০ সাল নাগাদ এ প্রক্ষেপণ অনুসারে, যা সারণী ২ এ বর্ণিত হয়েছে, আমাদের দেশের জনসংখ্যা দাঁড়াবে ১৪১ মিলিয়নে, যার শতকরা ৫১.৯ ভাগ পুরুষ এবং শতকরা ৪৯.১ ভাগ মহিলা । এ প্রাক্কলনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে যেমন, এটা পূর্বোল্লিখিত চরম প্রান্তসীমায় অবস্থানকারী প্রাক্কলনের মধ্যবর্তী অবস্থায় অবস্থান করছে এবং দ্বিতীয়তঃ এটি বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর দু'টো এবং বিশ্বব্যাংকের আপেক্ষিক বাস্তব সম্মত প্রাক্কলনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ । সুতরাং এ প্রাক্কলনের সঙ্গতি, প্রাসঙ্গিকতা ও বাস্তবতা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত শক্ত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ।

নগরায়ন

নগরায়নের যে প্রসঙ্গটি এখানে মূলতঃ আলোচিত হচ্ছে তা হল জনসংখ্যার গ্রাম ও নগর ভিত্তিক বন্টন । নাগরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রধানতঃ দু'টো জিনিসের উপর । প্রথমতঃ নাগরিক জনসংখ্যার স্বাভাবিক প্রবৃদ্ধির হার এবং দ্বিতীয়তঃ গ্রাম থেকে শহরে প্রচরণের হার । প্রথম ব্যাপারটি বর্তমান নগরকেন্দ্রের প্রসারণ ও গ্রামীণ এলাকার নগর কেন্দ্রে রূপান্তরের ওপর নির্ভরশীল । সুতরাং অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন এবং ভবিষ্যৎ গ্রামীণ উন্নয়ন পরিকল্পনার উপর প্রথম বিষয়টি নির্ভরশীল । প্রচরণের বিষয়টিও এ দু'টো বিষয় দ্বারা প্রভাবিত হবে নিঃসন্দেহে, তবে প্রচরণ সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত অত্যন্ত কঠিন, কারণ প্রচরণ প্রক্রিয়াটি জটিল একটি অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, নৃতাত্ত্বিক এবং ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার পারস্পরিক মিশ্রক্রিয়ার ফলশ্রুতি ।

১৯৬১ সালে এদেশের জনসংখ্যার মাত্র ৬ ভাগ নগরাঞ্চলে বাস করত । গত দু'দশকে

জনসংখ্যার গ্রামীণ নগর বন্টনে বিরাট পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় । ১৯৬১ থেকে ১৯৭৪ সালে এদেশের মোট জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ২.৬ ভাগ, কিন্তু একই সময়ে নাগরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ৭ ভাগ। এর অন্যতম কারণ ষাট এবং সত্তুরের দশকে গ্রামাঞ্চলের মানুষের ব্যাপকহারে নগর কেন্দ্র সমূহে আগমন । গত ষাট দশকে গ্রামীণ জনসংখ্যা যেখানে শতকরা ১.২৫ ভাগ হারে বাড়ছিল, সেখানে ১৯৭৪ থেকে ১৯৮১ সালের মধ্যে নাগরিক জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ১১ ভাগ। অবশ্য এ সময়কালের মধ্যে নাগরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির এ উচ্চহারের অন্যতম কারণ হচ্ছে ১৯৮১ সালে প্রশাসনিক দিক থেকে বহু গ্রামীণ কেন্দ্রকে নগরকেন্দ্র হিসেবে ঘোষণা । কিন্তু সে বিষয়টির জন্য যদি প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হয় এবং ১৯৭৪ সালে যেগুলো পৌরসভা হিসেবে চিহ্নিত ছিল সে সব নগর কেন্দ্রের মধ্যেই যদি আলোচনা সীমিত রাখি, তা'হলে ১৯৭৪ থেকে ১৯৮১ সালের মধ্যে এ দেশে নগরকেন্দ্রের জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ৭ ভাগ।

১৯৮১ সালের জন গণনা অনুসারে সে সমস্ত কেন্দ্র নগরকেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত এবং সরকার কর্তৃক ঘোষিত হয়েছে, সেখানে দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ১৫ ভাগ বাস করত । বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসেবে ২০০০ সাল নাগাদ এ দেশের জনসংখ্যার শতকরা ৩৫.৬ ভাগ লোক নগরে বাস করবে [৫] । পরিকল্পনা কমিশনের মতানুসারে ২০০০ সাল নাগাদ এদেশে নাগরিক জনসংখ্যা হবে ৩৮ মিলিয়নের মত [৯] । বিশ্বব্যাংক মনে করছে যদি গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রামীণ নাগরিক প্রচরণের হার উল্লেখযোগ্য হারে কমিয়ে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়, তা'হলে ভবিষ্যৎ নাগরিক জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির হার হবে শতকরা ৫ ভাগ, যার ফলশ্রুতিতে এ শতাব্দীর শেষ নাগাদ আমাদের নাগরিক জনসংখ্যা ৩২ মিলিয়নে পৌছুবে [১২] । এখানেও সংখ্যার এ বিভিন্নতার পেছনে কাজ করছে অনুমানের ভিন্নতা ।

আমাদের প্রক্ষেপণে আমরা অনুমান করেছি যে, আগামী দিনগুলোতে নাগরিক জনসংখ্যার স্বাভাবিক প্রবৃদ্ধির হার হবে শতকরা ২ ভাগ এবং গ্রাম থেকে শহরে প্রচরণের হার হবে শতকরা ৩.৬ ভাগ। সামগ্রিকভাবে দেশের জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধি হারের তুলনায় নাগরিক জনসংখ্যার স্বাভাবিক প্রবৃদ্ধির হার কম বলে অনুমান করা হয়েছে, কারণ প্রথমতঃ নগর কেন্দ্রসমূহে পুরুষ ও মহিলার আনুপাতিক হার কম এবং দ্বিতীয়তঃ গ্রামের তুলনায় শহরের পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণকারী দম্পতির সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশী । প্রচরণ বিষয়ে অনুমানের ক্ষেত্রে আমরা এ বিষয়ে অন্যান্য গবেষকদের অনুমানের মধ্যে সবচেয়ে আশাবাদী অনুমানটিকেই প্রামাণ্য বলে ধরে নিয়েছি । উপরোল্লিখিত অনুমানের ভিত্তিতে বলা যায় যে ২০০০ সাল পর্যন্ত আমাদের নাগরিক জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির হার হবে ন্যূনতমপক্ষে শতকরা ৫.৬ ভাগ প্রতি বছরে এবং এভাবে চলতে থাকলে এ শতাব্দী নাগাদ আমাদের মোট জনসংখ্যার শতকরা ২৮ ভাগ নগরে বাস করবে । ১৯৬১ সাল থেকে এদেশে নাগরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে যদি বিশ্লেষণ করা হয়, তা'হলে আগামী ১৪ বছরের জন্য এদেশে নাগরিক জনসংখ্যার শতকরা ৬.৫ ভাগ প্রবৃদ্ধির হারকে অবাস্তব বলে মনে করার কোন সঙ্গত কারণ নেই । নাগরিক জনসংখ্যা বিষয়ে আমাদের প্রক্ষেপণের ফলাফল সারণী ৩-এ প্রদত্ত হল ।

নগরায়নের এ উচ্চ প্রবৃদ্ধি হারের কারণে গ্রাম শহরের মধ্যে জনসংখ্যা বন্টনের ক্ষেত্রে প্রচণ্ড পরিবর্তন দেখা দেবে যার ফলশ্রুতিতে আগামী কয়েক দশকের মধ্যে বাংলাদেশের নগর কেন্দ্রসমূহে বাসস্থান, অবকাঠামো সুযোগ সুবিধা ও উৎপাদন কর্মকাণ্ডের জন্য সুবিশাল বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে । ১৯৮১ সালের শতকরা ১৫ ভাগ থেকে বাংলাদেশে নগরসমূহে বসবাসরত জনসংখ্যা যদি ২০০০ সালে মোট জনসংখ্যার শতকরা ২৮ ভাগে গিয়ে দাঁড়ায়, তবে দেশের প্রতিটি পৌরসভা বাসস্থান, স্বাস্থ্য সুবিধা ও অন্যান্য সেবাদানের ক্ষেত্রে দ্রুত বর্ধিত নাগরিক জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর ব্যাপারে ভীষণ অসুবিধের সন্মুখীন হবে । শহরে বস্তিবাসীর সংখ্যা বেড়ে যাবে এবং সরকারী সম্পদের বেশীর ভাগ অংশই ব্যয়িত হবে দ্রুত বর্ধমান নাগরিক জনসংখ্যা কর্তৃক আরোপিত সংকট কাটিয়ে ওঠার জন্য ।

সারণী ৩

বাংলাদেশের নাগরিক জনসংখ্যার প্রক্ষেপণ

(মিলিয়নে)

	১৯৮১	২০০০ (প্রক্ষেপিত)
নাগরিক জনসংখ্যা	১৪.১	৩৯.৭
পুরুষ	৭.৯ (৫৬.০%)	২১.৯ (৫৫.২%)
মহিলা	৬.২ (৪৪.০%)	১৭.৮ (৪৪.৮%)
গ্রামীণ জনসংখ্যা	৭৫.৮	১০১.৩
পুরুষ	৩৮.৫ (৫০.৮%)	৫১.১ (৫০.৪%)
মহিলা	৩৭.৩ (৪৯.২%)	৫০.২ (৪৯.৬%)

(বন্ধনীর মধ্যকার সংখ্যাসমূহ প্রাসঙ্গিক উপাত্তকে শতকরা হিসেবে দেখিয়েছে ।)

এখানে একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন হচ্ছে যে ভবিষ্যতে নাগরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি কি মূলতঃ ঐতিহ্যবাহী নগর কেন্দ্রগুলোতেই কেন্দ্রীভূত হবে না কি নব-ঘোষিত নগর কেন্দ্রগুলিই ক্রমবর্ধমান নাগরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির সিংহ ভাগ বহন করবে ? ১৯৫১ সালের জন গণনা অনুসারে পাঁচটি বৃহৎ নগর কেন্দ্রে— ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা ও নারায়ণগঞ্জ-এ দেশের নাগরিক জনসংখ্যার শতকরা ৪০ ভাগ বাস করত । ১৯৬১ সালে এ শহরগুলোতে নাগরিক জনসংখ্যার শতকরা ৪৫ ভাগ বাস করত আর ১৯৭৪ সালে নাগরিক জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক এ শহরগুলোর অধিবাসী ছিল । ১৯৮১ সালে এ সংখ্যা শতকরা ৪৫ ভাগে নেমে আসে, কিন্তু তার প্রধান কারণ ১৯৮১ সালে রাতারাতি এক প্রশাসনিক ঘোষণার মাধ্যমে বহু গ্রামীণ এলাকাকে নগরকেন্দ্র হিসেবে ঘোষণা করা । ১৯৭৪ থেকে ১৯৮১ এ পাঁচটি নগরকেন্দ্রে নাগরিক জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির হার ছিল শতকরা

৮.৫ ভাগ যা ১৯৭৪ সালের সমস্ত পৌরসভার জনসংখ্যা ১৯৭৪-৮১ সময়কালে যে হারে বেড়েছে, তার চাইতে বেশী ।

এ বিশ্লেষণ থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, আগামী দিনগুলোতেও ঐতিহাসিক দিক থেকে যেগুলো নগরকেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত, সেখানেই ভবিষ্যতে হয়ত নাগরিক জনসংখ্যা কেন্দ্রীভূত হবে । কারণ এ কেন্দ্রগুলোই ভবিষ্যতেও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে কাজ করে যাবে । নবঘোষিত নগর কেন্দ্রগুলোতে প্রশাসনিক দালান-কোঠাই গড়ে উঠবে, কিন্তু কোন অর্থেই সেখানে অর্থনৈতিক ক্রিয়া-কর্মের বিস্তৃতি ঘটছে না । ফলে গ্রামের মানুষ ভাগ্যান্বেষণে পাড়ি জমাচ্ছে ঐতিহ্যগত নগর কেন্দ্রগুলোর দিকে ।

নাগরিক জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি থেকে দু'টো উপসংহার অত্যন্ত জোরালোভাবে উপস্থাপিত করা যায় । প্রথমতঃ নগরকেন্দ্র সমূহে প্রচরণের অন্যতম কারণ হচ্ছে গ্রামীণ অর্থনীতির ক্রমাগত অবক্ষয় যা আর গ্রামীণ মানুষকে বেঁচে থাকার অবলম্বন সরবরাহ করতে পারছে না । দ্বিতীয়তঃ নগরায়নের এ দ্রুত বিস্তৃতি সত্বেও আগামী বহুদিন ধরে আমাদের জনসংখ্যার সিংহভাগ গ্রামে বাস করবে এবং ক্রমবর্ধমান এ গ্রামীণ জনসংখ্যাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য গ্রামাঞ্চলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের আশু বিস্তৃতি ও উন্নয়ন একান্তভাবেই প্রয়োজন ।

শ্রমশক্তিঃ যোগান ও আত্মভূতকরণ

জনগণনায় প্রাপ্ত সংখ্যা থেকে বাংলাদেশে শ্রমশক্তির যোগান ও তার আত্মভূতকরণ সম্পর্কে কোন সঠিক তথ্য পাওয়া নিতান্তই অসম্ভব । ১৯৬১ সালের জনগণনা অনুসারে দেশের মোট জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশের কিছু বেশী দেশের অসামরিক শ্রমশক্তি হিসেবে বিবেচিত হতে পারে । ১৯৭৪ সালের জনগণনায় মহিলা শ্রমশক্তির সংজ্ঞা পরিবর্তিত হয়, যার ফলে শ্রমশক্তিতে মহিলাদের শতকরা অনুপাত নাটকীয়ভাবে কমে যায় । ১৯৮১ সালে জনগণনায় দেশের শ্রমশক্তি সঠিকভাবে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য প্রয়াস নেয়া হয় নি । সংজ্ঞাসমূহের প্রায়শঃ পরিবর্তনের কারণে এবং দেশের শ্রমশক্তি নিরূপণে একটি সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড গ্রহণে সরকারী ব্যর্থতার কারণে জনগণনায় শ্রমশক্তি বিষয়ে আমরা পরস্পর বিরোধী ফলাফলে সন্মুখীন হই । যেমন সারণী ৪-এ দেখানো হয়েছে যে ১৯৬১, ১৯৭৪ এবং ১৯৮১ এ তিনটি জনগণায় মোট জনসংখ্যায় কর্মক্ষম বয়ঃকালের জনগোষ্ঠীর অনুপাত ক্রমানুয়ে বেড়েছে । এ ফলাফল অত্যন্ত প্রত্যাশিত কারণ উচ্চ জন্মহার বছর সমূহের জনগোষ্ঠী কর্মক্ষম বয়ঃকালে প্রবেশ করার ফলে গত দু'দশকে কর্মক্ষয় বয়ঃকালের জনগোষ্ঠীর প্রবৃদ্ধির হার সামগ্রিক জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির হারের চাইতে বেশী ছিল । সুতরাং মোট জনসংখ্যায় যদি কর্মক্ষম বয়ঃকালের জনগোষ্ঠীর অনুপাত বেড়ে যায়, তা'হলে অর্থনীতিতে তেমন কোন মৌলিক পরিবর্তনের অনুপস্থিতিতে এটা স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যাশিত যে দেশের শ্রমশক্তি মোট জনসংখ্যা কিংবা কর্মক্ষম বয়ঃকালের জনগোষ্ঠীর অনুপাত হিসেবে বেড়ে যাবে । অথচ ঠিক এর উল্টো ফলাফলটিই আমরা সারণী ৪-এ প্রত্যক্ষ করি । এর কি কোন সঙ্গত ব্যাখ্যা আছে ? নিশ্চয়ই বিগত বছরগুলোতে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর ক্রমবর্ধমান অংশ স্বেচ্ছামূলক ভাবে

কাজ করা থেকে বিরত থাকতে চায় নি ? নিশ্চয়ই স্কুল, কলেজ কিংবা সামরিক বাহিনীতে যোগদানকারী লোকদের সংখ্যা নাটকীয়ভাবে বেড়ে যায় নি কিংবা ষাটোর্দ্ধ

সারণী ৪

বাংলাদেশের কর্মক্ষম বয়ঃকালের জনগোষ্ঠী ও শ্রমশক্তি, ১৯৬১—৮১।

বছর		মোট	পুরুষ	মহিলা
১৯৬১	মোট জনসংখ্যার শতকরা অনুপাতে দশ বছর ও তদুর্ধ বছরের জনগোষ্ঠী	৬২.৯	৬৪.৩	৬১.৬
	মোট জনসংখ্যার শতকরা অনুপাতে শ্রমশক্তি	৩৪.৩	৫৬.৩	১০.৬
	দশ বছর ও তদুর্ধ বছরের জনগোষ্ঠীর শতকরা অনুপাতে শ্রমশক্তি	৫৪.৪	৮৭.৬	১৭.২
১৯৭৪	মোট জনসংখ্যার শতকরা অনুপাতে দশ বছর ও তদুর্ধ বছরের জনগোষ্ঠী	৬৪.৮	৬৬.০	৬৩.৪
	মোট জনসংখ্যার শতকরা অনুপাতে শ্রমশক্তি	২৮.৭	৫৩.১	২.৩
	দশ বছর ও তদুর্ধ বছরের জনগোষ্ঠীর শতকরা অনুপাতে শ্রমশক্তি	৪৪.৩	৮০.৪	৩.৭
১৯৮১	মোট জনসংখ্যার শতকরা অনুপাতে দশ বছর ও তদুর্ধ বছরের জনগোষ্ঠী	৬৬.৮	৬৭.৫	৬৬.১
	মোট জনসংখ্যার শতকরা অনুপাতে শ্রমশক্তি	২৭.১	৪৯.৯	২.৮
	দশ বছর ও তদুর্ধ বছরের জনগোষ্ঠীর শতকরা অনুপাতে শ্রমশক্তি	৪০.৫	৭৩.৯	৪.৩

বয়সের লোকেরা অধিক সংখ্যায় নিষ্ক্রিয় থাকতে চায় নি । বরং অর্থনৈতিক বাস্তবতা এর উল্টোটাই নির্দেশ করবে । তা'হলে যখন জনসংখ্যায় কর্মক্ষম বয়ঃকালের জনগোষ্ঠীর অনুপাত বেড়ে যায়, তখন কি করে মোট জনসংখ্যা শ্রমশক্তির অনুপাত কমে

যায় ? এর কারণ একটিই এবং সেটা হল জনগণনায় শ্রমশক্তির প্রদর্শিত সংখ্যা ঠিক নয় এবং তাতে অব-প্রাক্কলন রয়েছে । ১৯৮১ সালের জনগণনায় সে অব-প্রাক্কলন সংশোধিত হলে ১৯৮১ সালে বাংলাদেশের মোট শ্রমশক্তি জনগণনায় প্রদর্শিত ২৩.৬ মিলিয়নের পরিবর্তে ২৭.৩ মিলিয়ন থেকে ৩১.৪ মিলিয়নের মধ্যে ছিল বলে দেখানো যায়, যার মধ্যে ২৩.১ থেকে ২৬.৬ মিলিয়নের মত ছিল গ্রামীণ জনশক্তি এবং বাকিটা নাগরিক শ্রমশক্তি । সংশোধিত গ্রামীণ জনশক্তির মধ্যে ২০.৫ থেকে ২১.৯ মিলিয়ন হবে পুরুষ ।

শ্রমশক্তির সংজ্ঞা বা তার নিরূপণের মাঝেই যদি ত্রুটি এবং অব-প্রাক্কলন থাকে, তা'হলে সে ক্ষেত্রে প্রক্ষেপণ আরও দুরূহ হয়ে পড়ে । তবু দু'টো সংস্থার প্রক্ষেপণ— বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো [৫] এবং বিশ্বব্যাংক[১২]— আমাদের সামনে রয়েছে যা সারণী ৫-এ উপস্থাপিত হল ।

সারণী ৫

বাংলাদেশের শ্রমশক্তির প্রক্ষেপণ

(মিলিয়নে)

		১৯৮৫ (প্রক্ষেপিত)	২০০০ সাল (প্রক্ষেপিত)
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো	মোট শ্রমশক্তি	৩০.১	৪৬.৫
	পুরুষ	২৮.৭	৪৪.৫
	মহিলা	১.৪	২.০
বিশ্বব্যাংক প্রক্ষেপণ ১	মোট শ্রমশক্তি	৩৩.০	৫২.৮
	পুরুষ	২৮.৫	৪০.৬
	মহিলা	৪.৫	১২.২
প্রক্ষেপণ ২	মোট শ্রমশক্তি	৩৩.০	৫৪.২
	পুরুষ	২৮.৫	৪১.৫
	মহিলা	৪.৫	১২.৭

বিশ্বব্যাংকের প্রথম প্রাক্কলনে অনুমিত হয়েছে যে ২০০৫ সালে বাংলাদেশ নীট প্রজনন হার একক হবে এবং দ্বিতীয় প্রাক্কলনে সংশ্লিষ্ট বছর হচ্ছে ২০০৫ ।

সূত্রঃ [৫,১২]

এ দু'টো প্রতিষ্ঠানের প্রক্ষেপণে দু'টো বিষয় লক্ষ্যণীয় । প্রথমতঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর প্রাক্কলিত সংখ্যা বিশ্বব্যাংকের যে কোন প্রাক্কলনের চাইতে আপেক্ষিক ভাবে অনেক কম এবং দ্বিতীয়তঃ বিশ্বব্যাংকের প্রাক্কলনে নারী শ্রমশক্তির পরিমাণ অনেক বেশী । আসলে প্রথম বিষয়টি সম্ভবতঃ দ্বিতীয় বিষয়টির প্রলম্বন মাত্র । বিশ্বব্যাংকের প্রক্ষেপণে নারী শ্রমশক্তি বেশী হওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে তারা অনুমান করেছে যে এ শতাব্দীর শেষ নাগাদ শ্রমশক্তিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ হার শতকরা ২৫ ভাগ হবে, যা বর্তমানের অবস্থার চাইতে কয়েকগুণ বেশী ।

উপরে আলোচিত শ্রমশক্তি প্রক্ষেপণের বিবিধ অসুবিধের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আমাদের প্রক্ষেপণে একটি সহজ পদ্ধতি অনুসরণ করেছি, যা একটা বাস্তবসম্মত ও প্রাসঙ্গিক ফলাফল দিতে পারবে। আমরা আমাদের প্রক্ষেপণের ভিত্তি হিসেবে নিয়েছি ১৯৮০ সালে পরিচালিত বাংলাদেশ জনশক্তি জরীপ। সে জরীপে প্রাপ্ত মোট জনসংখ্যায় শ্রমশক্তির আনুপাতিক হারকে আমরা আমাদের প্রক্ষেপণের ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করেছি এ অনুমানের প্রেক্ষিতে যে ২০০০ সাল নাগাদ এ অনুপাত সমূহ অপরিবর্তিত থাকবে। প্রাপ্ত ফলাফল সারণী ৬-এ দেয়া হল।

সারণী ৬

বর্তমান প্রবন্ধ অনুসারে বাংলাদেশের শ্রমশক্তি প্রক্ষেপণ

(মিলিয়নে)

	১৯৮১ (অনুমিত) *	২০০০ (প্রক্ষেপিত)
মোট শ্রমশক্তি	২৮.০	৪৪.০
পুরুষ	২৩.২	৩৬.৪
মহিলা	৪.৮	৭.৬
নাগরিক শ্রমশক্তি	৪.৫	১৪.৫
পুরুষ	৩.৮	১২.৫
মহিলা	০.৭	২.০
গ্রামীণ শ্রমশক্তি	২৩.৫	২৯.৫
পুরুষ	১৯.৪	২৩.৯
মহিলা	৪.১	৫.৬

* ১৯৮০ সালের বাংলাদেশ জনশক্তি জরীপের ভিত্তিতে প্রাপ্ত।

বিশ্বব্যাংকের প্রাক্কলনের সঙ্গে আমাদের প্রাক্কলনের পার্থক্যের মূল উৎস হচ্ছে শ্রমশক্তিতে নারীশ্রমের অংশগ্রহণ হার সম্পর্কে বিশ্ব ব্যাংকের অনুমিত সংখ্যা অত্যন্ত উচ্চ এবং প্রচলিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কিছুটা অবাস্তব। আগামী বছরগুলোতে নারীশ্রমের অংশগ্রহণের হার এ অর্থনীতিতে বেশ বেড়ে যাবে, তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু আর মাত্র ১৪ বছরের মধ্যে তা ৫/৬ গুণ বেড়ে যাবে এ ধরণের অনুমান বাস্তব-বর্জিত। বরং আমাদের প্রাক্কলনে দেখানো হয়েছে যে, ২০০০ সাল নাগাদ এদেশে নারীশ্রমের পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যাবে, সেটাই অনেক বেশী প্রাসঙ্গিক। আমাদের প্রাক্কলনে এটাও দেখানো হয়েছে যে, শ্রমশক্তি বৃদ্ধির মূল চাপ গিয়ে পড়বে নগরকেন্দ্রগুলোতে যেখানে এ শতাব্দীর শেষ নাগাদ শ্রমশক্তি তিনগুণের বেশী হয়ে যাবে। নগরকেন্দ্রের প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে, নাগরিক জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে এবং গ্রামীণ অর্থনীতির ক্ষয়িষ্ণুতার প্রেক্ষিতে এ হিসাবও অত্যন্ত বাস্তব সম্মত।

বর্তমানে বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রতিবছর গড়ে ২.২ মিলিয়ন হারে বাড়ছে । যদি আমরা অনুমান করি যে, প্রতিবছর এ জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ শ্রমশক্তিতে প্রবেশ করে, তা'হলে বাংলাদেশ প্রতিবছর গড়ে শ্রমশক্তি বাড়ছে ৭.৫০ লক্ষ করে । প্রশ্ন হচ্ছে প্রতিবছরের এ বাড়তি জনশক্তি অর্থনীতিতে কি করে আত্মভূত হচ্ছে ? এ প্রশ্নটিকে আমরা সামগ্রিক অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ এবং গ্রামীণ অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব । অর্থনীতিতে বাড়তি শ্রমশক্তির আত্মভূতকরণ সম্পর্কে এ ব্যাপারে বিভিন্ন সংস্থার প্রাক্কালনে যথেষ্ট পার্থক্য আছে । কোন কোন আশাবাদী বিশ্লেষণে বলা হয়েছে যে, যথাযথ উন্নয়ন সাধিত হলে প্রতি বছর কৃষিখাতে ২ লক্ষ অতিরিক্ত লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যাবে [১০,১২] । অন্যান্য প্রাক্কলনে দেখানো হয়েছে যে, যদি বর্তমান আত্মভূতকরণের প্রবণতা অব্যাহত থাকে, তা'হলে কৃষিখাত প্রতি বছর মাত্র ১ লক্ষ অতিরিক্ত লোকের কর্মসংস্থান করতে পারবে [৮] । শিল্পখাতে বর্তমানে বাৎসরিক শ্রম আত্মভূতকরণের ক্ষমতা ৪০ থেকে ৫০ হাজার লোক । সেবামূলক খাত সমূহে আরও অতিরিক্ত ১৪০—১৫০ হাজার লোকের কর্মসংস্থান হতে পারে । যদি আগামী বছরগুলোতে এ দু'টো খাতের আত্মভূতকরণের হার দ্বিগুণও হয়ে যায়, তা'হলে ভবিষ্যতে শিল্প ও সেবামূলক খাতসমূহ যৌথভাবে বছরে ৪০০ হাজারের বেশী লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারবে না । সুতরাং সব রকমের আশাবাদী ধ্যান-ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ অর্থনীতি ভবিষ্যতে প্রতি বছর ৬ লক্ষ লোকের বেশী আত্মভূত করতে পারবে না, যার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতি বছর ১.৫০ থেকে ২ লক্ষ লোক কাজ পাবে না । এর মানে দাঁড়াচ্ছে পুরো অর্থনীতিতে ক্রমে ক্রমে লভ্য শ্রমশক্তি ও নিয়োজনের মাত্রার মধ্যকার বর্তমান ফাঁক বিস্তৃত থেকে বিস্তৃততর হবে ।

যদি ধরে নেয়া হয় যে, প্রতি বছরের বর্ধিত শ্রমশক্তির মধ্যে ৩.৫০ থেকে ৪ লক্ষ লোক গ্রামে থেকে যায় তা'হলে গ্রামীণ অর্থনীতিতে নিয়োজনের ক্ষেত্রে নীট ফলাফল কি আসে ? যদি অত্যন্ত আশাবাদী অনুমানের ভিত্তিতে ধরেও নেই যে, গ্রামীণ কৃষিখাত ১.৫০ থেকে ২ লক্ষ অতিরিক্ত লোকের কর্মসংস্থান প্রতি বছর করতে পারবে, তা'হলেও আমরা কি আশাব্যঞ্জক কোন ছবি পাই ? গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত ক্ষুদ্র শিল্পখাতে বাড়তি শ্রমশক্তি আত্মভূতকরণের হার প্রতি বছর ২০ হাজারের বেশী হবে না । সেব্য খাতসমূহ ও উন্নয়ন প্রকল্পগুলোতে সরাসরি নিয়োজন এ দু'টো মিলে গ্রামীণ অর্থনীতিতে প্রতি বছর বাড়তি ৩০ হাজারের বেশী কিছু লোকের কর্মসংস্থান হয় । সুতরাং এর মানে হচ্ছে যে, গ্রামীণ অর্থনীতির এবং দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির বর্তমান গতিধারা যদি ভবিষ্যতে অব্যাহত থাকে, তবে প্রতি বছর গ্রামীণ অর্থনীতিতে অতিরিক্ত শ্রমশক্তির মাত্র অর্ধেকের কিছু বেশী লোকের কর্মসংস্থান হবে ।

১৯৮০ সালের বাংলাদেশ জনশক্তি জরীপ থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, বাংলাদেশ অর্থনীতিতে বিপুল পরিমাণে অপূর্ণাঙ্গ কর্মসংস্থান রয়েছে । পুরুষ কৃষি শ্রমিকের ক্ষেত্রে অপূর্ণাঙ্গ কর্মসংস্থানের মাত্রা শতকরা ২২ ভাগ এবং নারী কৃষি শ্রমিকের ক্ষেত্রে তা শতকরা ৪২ ভাগ। সুতরাং উচ্চতর গ্রামীণ নাগরিক প্রচরণ হার সত্ত্বেও আগামী দশকগুলোতে গ্রামবাংলায় বেকারত্ব ও অপূর্ণাঙ্গ কর্মসংস্থান ভীষণভাবে বেড়ে যাবে । গ্রামীণ অর্থনীতির কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে এই প্রায় স্থবির অবস্থা কর্মসংস্থানে উৎসুক

সকলের নিয়োজনের সুযোগ কমিয়ে দেবে । প্রত্যেকের জন্যেই বছরে নিয়োজিত দিনের সংখ্যা কমে যাবে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে হ্রাস পাবে প্রত্যেকের মোট মজুরী প্রাপ্তি । গ্রামীণ শ্রমশক্তির নিয়োজন ও আয়ের এ হ্রাস গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্যের আপাতন বাড়াতে বাধ্য ।

আগামী দিনগুলোতে বর্ধিত ও অপূর্ণাঙ্গ কর্মসংস্থান সামগ্রিকভাবে সকল শ্রেণীর উপরই বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলবে, তবে যে কোন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তার সবচেয়ে বিরূপতম প্রতিক্রিয়া পড়বে শিক্ষিত বেকার জনগোষ্ঠীর ওপর । গত দশকগুলোতে এ দেশে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত জনগোষ্ঠী বিপুল পরিমাণে বেড়ে গেছে । ১৯৭০ সালে দেশের সবকটি শিক্ষাবোর্ড থেকে মোট ৫৩,৩৪৪ জন ছাত্র-ছাত্রী উচ্চমাধ্যমিক সনদ লাভ করে, ১৯৮৩-৮৪ সালে সে সংখ্যা বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় ১,০১,৪১৫ জন; অর্থাৎ প্রায় দ্বিগুণ। ১৯৬৯-৭০ সালে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে ছাত্র সংখ্যা ছিল ১৩,৮৮৮ জন; ১৯৮৩-তে তা গিয়ে দাঁড়ায় ৪০,৫৯১ জনে; অর্থাৎ প্রায় তিনগুণ। সুতরাং এটা সুস্পষ্ট যে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শিক্ষিত জনগোষ্ঠী ক্রমেই বেড়ে গেছে । প্রশ্ন হচ্ছে এদের আত্মভূত করার যথেষ্ট সুযোগ কি আমরা সৃষ্টি করতে পেরেছি ? বেসরকারী খাতে আমাদের বিনিয়োগ অত্যন্ত কম; ১৯৭৯-৮০ সালে এদেশে বেসরকারী খাতে স্থির বিনিয়োগ ছিল ১৯৭২/৭৩ সালের স্থিরকৃত মূল্যে ৪০৮২.৮ মিলিয়ন টাকা এবং ১৯৮৩-৮৪ সালে তার পরিমাণ ছিল ৫০৫৮.৪ মিলিয়ন টাকা; চার বছরে এবৃদ্ধি মোটেই উল্লেখযোগ্য নয় । তাছাড়া এ প্রবন্ধের অনুগামী অংশে আমরা আলোচনা করেছি যে, বিভিন্ন কারণে বেসরকারী খাতের বিনিয়োগ সরাসরিভাবে উৎপাদন ক্রিয়াকর্মে না হয়ে ব্যবসা, ঠিকাদারী, ভূমি ক্রয় ইত্যাদি কর্মকাণ্ডে হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হবে । রাজনৈতিক দর্শনের কারণে বর্তমানে সরকারী বিনিয়োগের বেশীর ভাগই প্রত্যক্ষ উৎপাদনশীল কাজের পরিবর্তে অবকাঠামো নির্মাণের নামে দালান-কোঠা, রাস্তাঘাট নির্মাণে সীমাবদ্ধ থাকবে । অধিকন্তু, সাম্প্রতিক বেশ কিছুকাল ধরে সরকারী চাকুরীতে নতুন নিয়োগ সম্পূর্ণ বন্ধ করে রাখা হয়েছে । এ অবস্থায় শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর নিয়োজনের সুযোগ এ অর্থনীতিতে ক্রমান্বয়ে সঙ্কুচিত হয়ে আসছে । ভবিষ্যতে এ সঙ্কট আরও ঘনীভূত হবে মনে হয় । উচ্চশিক্ষা যেহেতু সামাজিক সচলতা বাড়ায়, তাই উচ্চশিক্ষার্থী এবং উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠীর পরিমাণ বেড়ে যাবে । অন্যদিকে অর্থনীতিতে তাদের আত্মভূতকরণের বর্তমাণ প্রবণতা বহাল থাকলে ভবিষ্যতে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা অনপেক্ষভাবে তো নিশ্চয়ই, মোট বেকার জনগোষ্ঠীর অনুপাত হিসেবেও বেড়ে যেতে বাধ্য । এ অবস্থা সমাজে প্রচণ্ড রকমের অস্থিতিশীলতা ও সংঘাতের সৃষ্টি করবে, যার লক্ষণগুলো ইতিমধ্যেই পরিস্ফুট ।

সত্তুরের দশকের মাঝ থেকে দেশজ খাত ছাড়াও বাংলাদেশের শ্রমশক্তির নিয়োজনের একটি ক্ষেত্র তৈরী হয় মধ্যপ্রাচ্যের তেল রপ্তানিকারক দেশসমূহে । সে সময়ে তেল রপ্তানিকারক দেশসমূহের একটি একচেটিয়ামূলক সংস্থা গঠনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের মূল্য কয়েক গুণ বৃদ্ধি করায় মধ্যপ্রাচ্যের তেল উৎপাদন ও রপ্তানিকারক দেশসমূহের জাতীয় আয় ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন দ্রুত বেড়ে যায় । ফলে এসব দেশসমূহ তাদের এ বর্ধিত আয় দ্বারা অর্থনীতির বিভিন্ন খাতের অবকাঠামো

নির্মাণ ও অন্যান্য উন্নয়ন কাজে প্রয়াসী হয় । এ সব দেশে পেশাজীবি, দক্ষ এবং অদক্ষ শ্রমিকের স্বল্পতাহেতু তারা ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ প্রভৃতি দেশ থেকে শ্রমশক্তি নিয়োজনে প্রয়াসী হয় । ফলে সত্তুর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে আমাদের দেশ থেকে বহু পেশাজীবী, দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিক মধ্য প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে চাকুরী নিয়ে চলে যায় । এ থেকে আমাদের বেশ কিছু শ্রমিক যেমন মধ্য প্রাচ্যের অর্থনীতিগুলোতে নিয়োজিত হয়, তেমনি তা থেকে আমাদের বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয় ।

কিন্তু আশির দশক থেকে এ দৃশ্যপট বদলে যাচ্ছে বলে মনে হয় । আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের মূল্য হ্রাস পাওয়ায় এবং মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলোর বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণকার্য প্রায় সমাপ্ত হওয়ায় সে সব দেশে আমাদের শ্রমশক্তির নিয়োজন বৃদ্ধির সম্ভাবনা কমে আসছে । এতে শুধুমাত্র আমাদের দেশ থেকে জনশক্তি রপ্তানির হার এবং তা থেকে আয়বৃদ্ধির হারই যে শুধু কমে আসছে তাই নয়, বরং ঐ সব দেশ থেকে আমাদের দেশীয় শ্রমিক, বিশেষতঃ বেশ কিছু অদক্ষ শ্রমিক দেশে ফেরত আসছে । সুতরাং বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক বাজারে আমাদের শ্রমশক্তির নিয়োজনের সম্ভাবনাই যে সংকুচিত হচ্ছে তাই নয়, সেখান থেকে ক্রমবর্ধমান হারে ফিরতি শ্রমশক্তিকেও ভবিষ্যতে দেশজ অর্থনীতিতে আত্মভূত করতে হবে ।

মোট দেশজ উৎপাদনঃ কাঠামো ও বন্টন

বাংলাদেশের মত একটি অর্থনীতিতে মোট দেশজ উৎপাদনের প্রায়শঃই হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে । এর অন্যতম কারণ আমাদের দেশজ উৎপাদনে কৃষিখাতের প্রাধান্য । এ ছাড়াও পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক অবস্থা দেশজ অর্থনীতির অস্থিতিশীলতাকে বাড়িয়ে দেয় । এ জাতীয় অর্থনীতিতে দীর্ঘ সময়ে গড়পড়তা প্রবৃদ্ধির হার কত হবে তা চিহ্নিত করা রীতিমত কষ্টসাধ্য ।

ঐতিহাসিক দিক থেকে বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনের গতিধারা বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি সুস্পষ্ট প্রবণতা চিহ্নিত করা যায় যেমনঃ ঐতিহাসিক দিক থেকে স্বল্প, মধ্য বা দীর্ঘ মেয়াদে বাংলাদেশ অর্থনীতির মোট দেশজ উৎপাদনের প্রবৃদ্ধির হার সব সময়েই শতকরা ৫ ভাগের কম ছিল । এমন কি ষাটের দশকের প্রবৃদ্ধির স্বর্ণযুগেও আমাদের প্রবৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ৪.২ ভাগ। লভ্য উপাত্ত থেকে জানা যায় যে, ১৯৬৯-৭০ সাল থেকে ১৯৮৩-৮৪ সাল পর্যন্ত ১৯৭২-৭৩ সালের স্থির মূল্যে এ দেশের মোট দেশজ উৎপাদনের বাৎসরিক গড় প্রবৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ২.৫ ভাগের কম । অবশ্য সাম্প্রতিক সময়ে অর্থাৎ গত ৭/৮ বছরে আমাদের মোট দেশজ উৎপাদনের বাৎসরিক গড় প্রবৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ৩.৫ ভাগ। দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনাকালে মোট দেশজ উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি হারের লক্ষ্যমাত্রা ছিল শতকরা ৫.৪ ভাগ, অথচ সেখানে বাস্তবে যে প্রবৃদ্ধির হার অর্জিত হয়েছে তা হচ্ছে শতকরা ৩.৮ ভাগ।

এ অর্থনীতির অতীত গতিধারার ভিত্তিতে যদি ভবিষ্যৎ প্রক্ষেপণ করা হয়, তা'হলে এটা বিশ্বাস করা অত্যন্ত কষ্টকর যে, আগামী বছরগুলোতে এ অর্থনীতিতে মোট দেশজ উৎপাদনের একটি উচ্চতর প্রবৃদ্ধির হার অর্জন সম্ভব । বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে

গেলে আগামী ১৪ বছরে মোট দেশজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে শতকরা ৪ ভাগের চেয়ে বেশী বাৎসরিক গড় প্রবৃদ্ধির হার অর্জন নিতান্ত দুরাশার সামিল ।

কিন্তু তবু তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় দেশজ উৎপাদনের প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা বার্ষিক শতকরা ৫.৪ ভাগে রাখা হয়েছে । খুব সম্ভবতঃ দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকলপনার ফলাফলের আলোকে পরিকল্পনা কমিশন কিছুটা হলেও আপেক্ষিক বাস্তবতার পরিচয় দিয়েছে । তা না হলে পরিকল্পনা কমিশন তাদের দীর্ঘ যোজনামূলক পরিকল্পনার চিন্তা ভাবনায় যে চিত্রকল্প গড়ে তুলেছিলেন তাতে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম পাঁচসালা পরিকল্পনার শেষ বছরগুলোতে জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ৭.০, ৭.৪ এবং ৭.২ ভাগ হবে বলে অনুমান করেছিল । এ অনুমানের মানে দাঁড়াচ্ছে যে, ১৯৮৪-৮৫ থেকে ১৯৯৯-২০০০ সাল সময়কালের মধ্যে বাংলাদেশের জাতীয় আয় শতকরা ১৭৫ ভাগ বাড়বে এবং ২০০০ সাল নাগাদ এদেশের মাথাপিছু আয় ১৯৭২-৭৩ এর স্থিরকৃত মূল্যে ১৬৪৩ টাকা হবে । অথচ ১৯৪৯-৫০ থেকে ১৯৬৪-৬৫ সময়কালের মধ্যে এবং ১৯৬৯-৭০ থেকে ১৯৮৩-৮৪ সময়কালের মধ্যে এদেশের জাতীয় আয় যথাক্রমে শতকরা ৬০ এবং শতকরা ৩৬ ভাগ হারে বেড়েছে । সেখানে আগামী ১৪ বছরের মধ্যে বাংলাদেশের জাতীয় আয় কোন মন্ত্রবলে শতকরা ১৭৫ ভাগ বাড়বে ? তেমনিভাবে ২০০০ সাল নাগাদ এ দেশের মাথাপিছু আয় ১৯৭২-৭৩ এর স্থিরকৃত মূল্যে ১৬৪৩ টাকা হওয়া মানে আগামী ১৪ বছরে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ৪৪ মিলিয়ন বৃদ্ধি পেলেও এদেশের প্রকৃত মাথাপিছু আয় দ্বিগুণ হয়ে যাবে । এটা নিতান্ত অবাস্তব একটি ধারণা ।

মোট দেশজ উৎপাদনের খাত ওয়ারী প্রবৃদ্ধি হার বিচার করলে দেখা যায় যে, পরিকল্পনা কমিশনের উপাত্ত নির্দেশ করছে যে, ১৯৬৯-৭০ থেকে ১৯৮৩-৮৪ সালের মধ্যে কৃষিখাতের প্রবৃদ্ধির হার ছিল বাৎসরিক শতকরা ১.৮ ভাগ এবং শিল্পখাতের সংশ্লিষ্ট সংখ্যা ছিল ২.৭ অথচ গত পাঁচ বছর অর্থাৎ ১৯৭৯-৮০ থেকে ১৯৮৪-৮৫ সময়কালের মধ্যে কৃষিখাতের প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ৩.৫ ভাগ ও শিল্প খাতে তা শতকরা ৪.৮ ভাগ এবং অন্যান্য খাতে তা শতকরা ৩.৮ ভাগ ছিল বলে পরিকল্পনা কমিশন মন্তব্য করেছে । কিন্তু বিশ্বব্যাংকের নিজস্ব প্রাক্কলন অনুসারে একই সময়কালে কৃষিখাতে প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ২.২ ভাগ, যার মধ্যে শস্য খাতে প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ২.০ ভাগ এবং শিল্পক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ২.৫ ভাগ, নির্মাণ ও জন উপযোগমূলক খাতে প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ৫.২ ভাগ, ব্যবসা এবং যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ৫.৬ ভাগ এবং অন্যান্য সেবামূলক কাজের খাতে প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ৪.৫ ভাগ ছিল [১৪] । এর মধ্যে বিশ্বব্যাংকের প্রাক্কলন অধিকতর যৌক্তিক বলে মনে হয় কারণ তাদের প্রাক্কলন অতীতের দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ।

কৃষি উন্নয়নের বর্তমান গতিধারা ভবিষ্যতে বজায় ভাকলে আগামী দিনগুলোতে কৃষি উৎপাদন বাৎসরিক শতকরা ২ ভাগের বেশী বাড়বে না । অতীত প্রবণতা বহাল থাকলে নির্মাণ, শিল্প ও জ্বালানী খাতের সম্মিলিত প্রবৃদ্ধির হার হবে শতকরা ৪.৫ ভাগ। অবশ্য সেবা খাতসমূহ সম্ভবতঃ শতকরা ৬ ভাগের বেশী হারে বাড়বে । এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ২০০০ সাল নাগাদ আমাদের প্রক্ষেপণ অনুসারে মোট দেশজ উৎপাদনে

কৃষিখাতের অংশ বর্তমানের শতকরা ৫০/৫৫ ভাগ থেকে শতকরা ৪০/৪২ অংশে নেমে আসবে: নির্মাণ, শিল্প ও জ্বালানী খাতের সম্মিলিত অংশ বর্তমানের শতকরা ১০ ভাগের তুলনায় সামান্য কিছু বৃদ্ধি পাবে । তবে যে খাতের অংশ ২০০০ সাল নাগাদ বাংলাদেশের দেশজ উৎপাদনে সব চাইতে বড় ভূমিকা রাখবে তা হচ্ছে সেবামূলক খাত । দেশজ উৎপাদনের কাঠামো প্রসঙ্গে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর এক প্রক্ষেপণে বলা হয়েছে যে, ২০০০ সালে দেশজ উৎপাদনে কৃষির ভাগ বর্তমানের শতকরা ৫০ ভাগ থেকে শতকরা ৩৭ ভাগ, শিল্পের ভাগ বর্তমানের ১০ ভাগ থেকে শতকরা ২১ ভাগ এবং অন্যান্য খাতের ভাগ শতকরা ৪০ থেকে শতকরা ৪২ ভাগে পরিবর্তিত হবে [৫] । এ প্রক্ষেপণের অযৌক্তিকতা প্রমাণ করতে একটি বিষয়ই যথেষ্ট এবং তা হচ্ছে শিল্পের ভাগের দিকে দৃষ্টি দেয়া । আগামী ১৪ বছরে শিল্পের ভাগ মোট দেশজ উৎপাদনে কি করে দ্বিগুণের বেশী হয়ে যাবে তা এদেশের শিল্পখাতের অতীত প্রবণতার সঙ্গে পরিচিত যে কারুরই বুদ্ধির অগম্য । তবে দেশজ উৎপাদনে ভবিষ্যৎ খাতওয়ারী ভাগের ক্ষেত্রে যে কথাটি সুস্পষ্টভাবে বলা যায়, তা হচ্ছে কৃষিখাতের শতকরা হিসেবে আপেক্ষিক গুরুত্ব হ্রাস এবং সেবামূলক খাতের প্রভূত বিস্তৃতি । যে কোন দেশের সেবামূলক খাতের দ্রুত বিস্তৃতি দু'টো জিনিসকে নির্দেশ করে— প্রথমতঃ দেশের প্রকৃত উৎপাদনভিত্তি ততটা প্রসার লাভ করছে না এবং দ্বিতীয়তঃ যেহেতু সেবামূলক খাত প্রধানতঃ শহরাঞ্চলে সীমিত, সুতরাং গ্রামীণ অর্থনীতির অবক্ষয় ।

আলমগীর ও বার্লেজের গবেষণায় দেখা গেছে যে, ১৯৪৯-৫০ সাল থেকে ১৯৬৯-৭০ সাল পর্যন্ত এ দেশে আয়ের বন্টন ক্রমাগত নগরাঞ্চলের দিকে ঝুঁকেছে [৪] । ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের কারণে উৎপাদন ব্যবস্থায় উদ্ভূত বিশৃংখলা এবং এর ফলশ্রুতিতে শিল্প ও সেবা খাতসমূহের উৎপাদনের আপেক্ষিক হ্রাসের ফলে স্বাধীনতার পর পরই মোট জাতীয় আয়ে গ্রামীণ আয়ের অংশ বেড়ে গিয়েছিল । কিন্তু অর্থনীতির পুনর্বাসনের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামীণ নাগরিক আয় বন্টনের পুরোনো প্রবণতা আবার প্রকট হয়ে ওঠে । বিশ্বব্যাংকের এক প্রাক্কলন অনুসারে ১৯৭৩-৭৪ সালে এ দেশে মোট জাতীয় আয়ের শতকরা ৭৯ ভাগ উদ্ভূত হত গ্রামে [১১]; কিন্তু ১৯৭৯-৮০ সাল নাগাদ এ অংশ এসে দাঁড়ায় শতকরা ৭৩ ভাগেরও কম ।

যেহেতু কৃষি সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডই গ্রামীণ আয়ের মূল উৎস, আমরা অত্যন্ত যৌক্তিকভাবেই অনুমান করতে পারি যে, আগামী দশকে গ্রামীণ আয়ের প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ২ ভাগের বেশী হবে না । এর মানে হচ্ছে যে, পুরো অর্থনীতির জন্য প্রক্ষেপিত শতকরা ৪ ভাগ সার্বিক প্রবৃদ্ধি হারের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় আয়ের গ্রামীণ ও নাগরিক বন্টনের বঙ্কিমতা নগর কেন্দ্র সমূহের দিকে অত্যন্ত বেড়ে যাবে । এ বিষয়টিকে একটু ভিন্নতর দৃষ্টিকোণ থেকেও দেখা যায় । আগেই বলা হয়েছে যে, ২০০০ সাল নাগাদ জাতীয় আয়ে সেবামূলক খাত একটি বিরাট অবদান রাখবে । কিন্তু যেহেতু এখাতের বেশীর ভাগ কর্মকাণ্ড শহরাঞ্চলে সীমাবদ্ধ, এ খাত থেকে উদ্ভূত বর্ধিত আয়ের বেশীর ভাগই নগর কেন্দ্রগুলোতে চলে যাবে, যার ফলশ্রুতিতে গ্রামীণ নাগরিক আয় বন্টনে বঙ্কিমতা বৃদ্ধি পেতে বাধ্য । যদি অনুমান করে নেই যে, অতীতে অর্থাৎ ১৯৭৩-৭৪ থেকে ১৯৭৯-৮০ সময়কালে আমাদের জাতীয় আয়ে নাগরিক অংশ যে হারে বেড়েছে,

ভবিষ্যতেও যদি সে হার অক্ষুন্ন থাকবে, তা'হলে এ শতাব্দীর শেষ নাগাদ আমাদের জাতীয় আয়ে নাগরিক অংশ হবে শতকরা ৫১ ভাগ এবং গ্রামীণ অংশ শতকরা ৪৯ ভাগ। যেহেতু তখনও দেশের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ লোক গ্রামে বাস করবে গ্রামাঞ্চলের তুলনায় শহরাঞ্চলের মাথাপিছু আয় শুধু বেশীই হবে না, তা আপেক্ষিকভাবে দ্রুতগতিতে বেড়ে যাবে । গবেষণায় দেখা গেছে যে, নগর কেন্দ্রসমূহে এবং বহির্বিশ্বের বাজারে গ্রামীণ অর্থনীতি কর্তৃক বিক্রয়কৃত কৃষিজাত পণ্যসমূহ, বিশেষতঃ খাদ্যসামগ্রী গ্রামীণ অর্থনীতির তুলনায় দ্রুতহারে বাড়ছে । সুতরাং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর প্রবৃদ্ধির চেয়েও যদি গ্রামীণ অর্থনীতির উৎপাদনের হার বেশী হয়, তবুও গ্রামাঞ্চলের লোকের ভোগ সম্ভাব্যতা বাড়বে না ।

বাংলাদেশে গ্রামীণ দারিদ্র্যের প্রবৃদ্ধি নিম্নোক্ত কারণসমূহের দ্রুততর হচ্ছেঃ (ক) গ্রামাঞ্চলে উৎপাদনের প্রবৃদ্ধির হারের স্বল্পতা, (খ) গ্রামীণ অর্থনীতিতে সম্পদের মালিকানা ও আয়ের কেন্দ্রীভূতকরণ, (গ) গ্রামীণ অর্থনীতিতে তুলনামূলকভাবে কম বিনিয়োগ এবং (ঘ) গ্রামাঞ্চল থেকে শহরাঞ্চলে সম্পদের স্থানান্তর । এ কথা আগেই উল্লেখিত হয়েছে যে, এমন সম্ভাবনা খুবই কম যে, আজ বাংলাদেশে যে সমস্ত অর্থনৈতিক ও সামাজিক শক্তি তৎপর সেগুলো আগামী ১৪ বছরে এমনভাবে বদলে যাবে যে, গ্রামীণ অর্থনীতির বর্তমান সম্পদ ধারণ বা আয়ের কেন্দ্রীভূতকরণ প্রক্রিয়া রাতারাতি বদলে যাবে ।

খাদ্যশস্যের লভ্যতা

বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশকে অনুদানকারী দেশ ও সংস্থাসমূহের মতে এদেশের জনগণের দৈনিক মাথাপিছু খাদ্যশস্য চাহিদা— যার মধ্যে চাল ও গমই সিংহভাগ অধিকার করে আছে— সাড়ে পনের আউন্স। প্রাপ্ত সমীক্ষাসমূহে দেখা যায় যে, এ সমাজে বিশেষতঃ নিম্ন আয়ের গৃহস্থালীতে খাদ্য চাহিদার আয়ের স্থিতিস্থাপকতা খুব বেশী । সুতরাং যদি মাথাপিছু আয় বেড়ে যায়, তা'হলে খাদ্য চাহিদা দৈনিক মাথাপিছু ১৫.৫ আউন্সের চাইতে বেশী হতে বাধ্য । বর্তমানে আমাদের দৈনিক মাথাপিছু খাদ্যশস্যের লভ্যতা ১৫.৫ আউন্সের চেয়ে বেড়ে গেছে । সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যশস্যের মূল্যও বেড়ে গেছে । এর পরিপ্রেক্ষিতে এটা অনুমান করা নিতান্ত অযৌক্তিক হবে যে দৈনিক ১৫.৫ আউন্স খাদ্যশস্য সকল ভোক্তার চাহিদা মেটাবে, বিশেষতঃ যেখানে আয় বন্টনে বৈষম্য আছে এবং তা ভবিষ্যতে আরও বাড়বে ।

হামিদ খাদ্যশস্যের মূল বছরের চাহিদা, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রকৃত মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, চাহিদার আয় স্থিতিস্থাপকতা ইত্যাদির ভিত্তিতে প্রক্ষেপণ করেছেন যে, ২০০০ সাল নাগাদ এদেশের জনগণের মোট খাদ্যশস্য চাহিদা হবে ২৬.০৪ মিলিয়ন টন [৭] । উৎপাদন অপেক্ষকের সাহায্যে তিনি দেখিয়েছেন যে, এ শতাব্দী নাগাদ খাদ্যশস্যের নীট দেশজ উৎপাদন হবে ১৭.৭৮ মিলিয়ন টন । সুতরাং ২০০০ সাল নাগাদ খাদ্যশস্যের ঘাটতি হবে ৮.২৬ মিলিয়ন টন, যে ঘাটতি হামিদের মতে ১৯৮৪-৮৫ সালে ছিল ৩.৭৮ মিলিয়ন টন মাত্র । এর মানে হচ্ছে আগামী ১৫ বছরের মধ্যে এদেশে খাদ্যশস্য ঘাটতি দ্বিগুণের বেশী বেড়ে যাবে ।

আমরা আরও নমনীয় অনুমানের ভিত্তিতে বিষয়টিকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করি। খাদ্যশস্যের দৈনিক মাথাপিছু ভোগ চাহিদা যদি ১৫.৫ আউন্সে স্থির রাখা হয়, তা'হলে ১৯৮৩-৮৪ সালে আমাদের মোট খাদ্যশস্যের চাহিদা ছিল ১৫.২ মিলিয়ন টন। অথচ ঐ বছর আমাদের নীট দেশজ খাদ্যশস্য উৎপাদন ছিল ১৩.৮ মিলিয়ন টন। অর্থাৎ ঐ বছর ঘাটতির পরিমাণ ছিল ১.৪ মিলিয়ন টন। মনে করা যাক ২০০০ সাল নাগাদ আমাদের দেশে খাদ্যশস্যের দৈনিক মাথাপিছু ভোগ চাহিদা ১৫.৫ আউন্সে অপরিবর্তিত থাকবে। আমাদের প্রক্ষেপণে অনুমান করা হয়েছে যে, এ শতাব্দীর শেষ নাগাদ আমাদের জনসংখ্যা হবে ১৪১ মিলিয়ন। সুতরাং ২০০০ সালে আমাদের দেশে খাদ্যশস্যের মোট চাহিদা হবে ২২.২ মিলিয়ন টন। আমরা আগেই বলেছি যে, প্রাপ্ত সব বাস্তবসম্মত উপাত্ত নির্দেশ করে যে, খাদ্যশস্য উৎপাদনের প্রবৃদ্ধির হারের অতীত প্রবণতা ছিল বাৎসরিক শতকরা ২ ভাগ। ভবিষ্যতে যদি এ প্রবণতা বহাল থাকে, তা'হলে ২০০০ সাল নাগাদ আমাদের খাদ্যশস্যের নীট দেশজ উৎপাদন হবে ১৯ মিলিয়ন টন। সুতরাং বর্তমানে যেখানে আমাদের বাৎসরিক খাদ্যশস্যের ঘাটতি ১.৫ মিলিয়ন টনের মত, এ শতাব্দীর শেষের দিকে তা বেড়ে গিয়ে দাঁড়াবে ৩ মিলিয়ন টনের ওপর, অর্থাৎ বর্তমান ঘাটতির দ্বিগুণেরও বেশী। ভবিষ্যতে খাদ্যশস্যের ঘাটতির এ ক্রমবর্ধমান প্রবণতাকে একটি বাক্যেই প্রমাণ করা যায়, অন্ততঃ আমাদের অনুমানের প্রেক্ষিতে। ভবিষ্যতে জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির হার ধরা হয়েছে শতকরা ২.৪ ভাগ আর খাদ্যশস্য উৎপাদনের প্রবৃদ্ধির হার ধরা হয়েছে শতকরা ২ ভাগ। সুতরাং খাদ্যশস্য চাহিদা আর তার দেশজ সরবরাহের মধ্যকার তফাৎ ক্রমাগত বেড়ে যাবে।

এখন দেশজ খাদ্যশস্যের ঘাটতি আমরা মেটাই খাদ্যশস্য আমদানীর মাধ্যমে। দেখা যাক সেখানে বিশ্ব পরিস্থিতি ২০০০ সাল নাগাদ কেমন হবে ? একটি সমীক্ষায় দেখা যায় যে, ১৯৭০ সালে অনুন্নত বিশ্বের মোট খাদ্যশস্য ঘাটতির পরিমাণ ছিল ২৩.৭ মিলিয়ন টন আর সেখানে খাদ্যশস্যের প্রধান প্রধান রপ্তানীকারক দেশসমূহের মোট রপ্তানী ছিল ৭৩.৯ মিলিয়ন টন। ২০০০ সাল নাগাদ সংশ্লিষ্ট সংখ্যাসমূহ দাঁড়াবে ৯৫ মিলিয়ন টন এবং ১৬৫.৫ মিলিয়ন টনে [২]। তার মানে দাঁড়াচ্ছে ১৯৭০ থেকে ২০০০ সাল নাগাদ বিশ্বের প্রধান প্রধান খাদ্যশস্য রপ্তানীকারক দেশসমূহ থেকে রপ্তানী বাড়বে দ্বিগুণেরও কিছু বেশী, কিন্তু একই সময়ে অনুন্নত বিশ্বের খাদ্য ঘাটতি বাড়বে ৪ গুণেরও বেশী। বিশ্ব প্রেক্ষাপটে এ অবস্থা হলে প্রতিটি অনুন্নত দেশই তার খাদ্যশস্য ঘাটতি মেটাতে মোট রপ্তানীকৃত শস্যের জন্যে একে অন্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবে। ফলে শস্যের মূল্য আন্তর্জাতিক বাজারে বাড়বে বলে মনে হয়। সুতরাং কোন একটি অনুন্নত দেশকে হয় উচ্চমূল্যে শস্য আমদানী করতে হবে, অথবা তা না করতে পারলে সে দেশে ক্ষুধার আপাতন বেড়ে যাবে।

সঞ্চয় বনাম বিনিয়োগ

বাংলাদেশ অনুমিত বিনিয়োগের পরিমাণ থেকে নীট বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ বাদ দিয়ে মোট জাতীয় সঞ্চয়ের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। এর ফলে এক বছর থেকে অন্য বছরে নির্ণীত সঞ্চয়ের পরিমাণের মধ্যে বিপুল পার্থক্য লক্ষিত হয় এবং সঞ্চয় আচরণে কোন সুনির্দিষ্ট ধারা খুঁজে পাওয়া যায় না। পুরো ষাটের দশকে এদেশে মোট

জাতীয় সঞ্চয় ক্রমাগত বেড়ে গেছে । ১৯৬৯-৭০ সালে জাতীয় সঞ্চয় মোট দেশজ উৎপাদনের শতকরা ৯ ভাগ ছিল । স্বাধীনতার ঠিক পরে পরেই সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় এবং আমাদের সঞ্চয় হার ভীষণভাবে কমে আসে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, বিশ্বব্যাংক ও পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক উপস্থাপিত অনুমিত সঞ্চয়ের পরিমাণে বেশ পার্থক্য দেখা যায় । অবশ্য এর সবগুলোতেই বলা হয়েছে যে, বিগত দশকে এ দেশে জাতীয় সঞ্চয় দেশজ উৎপাদনের শতকরা ৫ ভাগের কম ছিল । প্রাক্কলিত বিনিয়োগের পরিমাণেও যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় । বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর মতে সত্তুর দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত আমাদের বিনিয়োগের পরিমাণ মোট দেশজ উৎপাদনের শতকরা ১০ ভাগ ছিল । বিশ্বব্যাংকের সমীক্ষায় অবশ্য দেখানো হয়েছে যে, সত্তুর দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত আমাদের বিনিয়োগের পরিমাণ মোট দেশজ উৎপাদনের শতকরা ১০ থেকে ১২ ভাগের মধ্যে ছিল । বিশ্বব্যাংকের সমীক্ষায় আরও বলা হয়েছে যে, গত কয়েক বছরে মোট দেশজ উৎপাদনের অনুপাত হিসেবে এ দেশের বিনিয়োগ প্রভূত পরিমাণে বেড়ে গেছে । কত কয়েক বছরে, বিশ্বব্যাংকের মতে, গড়পড়তা এই আনুপাতিক হার ছিল শতকরা ১৭ ভাগের কিছু বেশী । অতএব প্রাপ্ত সকল সমীক্ষায় দেখা যায় যে, সত্তুর দশকের সঙ্গে যদি সাম্প্রতিক সময়ের তুলনা করা হয়, তা'হলে বিনিয়োগ ও সঞ্চয়ের মধ্যকার তফাৎ ক্রমাগতভাবে বেড়ে গেছে ।

পরিকল্পনা কমিশন ভবিষ্যতের বিনিয়োগ ও সঞ্চয় সম্পর্কে যে প্রক্ষেপণ করেছে তাতে বলা হয়েছে যে, ১৯৭৯-৮০ সালের বিনিয়োগ হার দেশজ উৎপাদনের শতকরা ১৫.৯ ভাগ থেকে ২০০০ সাল নাগাদ তা শতকরা ২১.৫ ভাগে গিয়ে দাঁড়াবে [৯] । একই সময়কালে জাতীয় সঞ্চয় হারের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সংখ্যাদ্বয় হচ্ছে শতকরা ৪.৩ ভাগ এবং শতকরা ১২.৩ ভাগ। আমরা জানি যে, জাতীয় সঞ্চয়, অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় ও বহিঃর্বিশ্ব থেকে উৎপাদন-উপকরণ থেকে উদ্ভূত নীট আয়ের যোগ ফলের সমান । বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর মতে গত সাত বছরে আমাদের অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় মোট দেশজ উৎপাদনের শতকরা ২ থেকে ৩ ভাগের মধ্যে ছিল । বিশ্বব্যাংকের প্রাক্কলনেও দেখা যায় যে, ১৯৮১-৮২ সাল ছাড়া গত কয়েক বছরে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় হার বার্ষিক শতকরা ২ থেকে ৩ ভাগের মধ্যে ছিল । আগামী বছরগুলোতে এই সঞ্চয় হারে কোন নাটকীয় পরিবর্তন নিতান্ত অপ্রত্যাশিত । অন্যদিকে পূর্বোল্লিখিত কারণসমূহের জন্য মধ্যপ্রাচ্যে আমাদের শ্রমশক্তির বাজার সঙ্কুচিত হয়ে আসলে ভবিষ্যতের বছরগুলোতে বিদেশ থেকে প্রাপ্ত শ্রমআয় কমে আসতে পারে । সুতরাং ভবিষ্যতে জাতীয় সঞ্চয় হার বাড়া তো দূরের কথা, তা বর্তমান পর্যায়ে থাকবে কিনা, সে ব্যাপারেই যথেষ্ট সন্দেহ আছে । সে ক্ষেত্রে কোন অনুমানের ভিত্তিতে পরিকল্পনা কমিশন মনে করছেন যে, ১৯৭৯-৮০ থেকে ১৯৯৯-২০০০ সাল এ ২০ বছরের মধ্যে এদেশের জাতীয় সঞ্চয় হার শতকরা ৩০০ ভাগ বৃদ্ধি পাবে, তা বোঝা দুঃসাধ্য ।

আগামী দশকগুলোতে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগেরপরিমাণ নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে দু'টো জিনিস বিবেচনা করা দরকারঃ ক) পুঁজি- উৎপাদন অনুপাত এবং খ) উৎপাদনের প্রক্ষেপিত বৃদ্ধি হার । ষাট দশকের পর থেকেই বর্ধিত পুঁজি- উৎপাদন অনুপাত এ দেশে প্রভূত পরিমাণ বেড়ে গেছে । সুতরাং ষাট দশকের তুলনায় একই প্রবৃদ্ধি হার বজায়

রাখতে এখন আমাদের দেশজ উৎপাদনের একটি বৃহত্তর ভাগ বিনিয়োগ করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে । আমাদের প্রক্ষেপণে অনুমান করেছি যে, আগামী ১৪ বছরে প্রবৃদ্ধির হার এ দেশে গড়পড়তা প্রবৃদ্ধির হারের চেয়ে কিছু বেশী হবে, অর্থাৎ শতকরা ৩.৫ ভাগের পরিবর্তে শতকরা ৪ ভাগ। সুতরাং এটা পরিস্ফুট যে, গত দশকের তুলনায় আগামীতে বিনিয়োগ অনেক বাড়াতে হবে । অন্যদিকে পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদেই আমরা বলেছি যে, প্রচলিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় সঞ্চয় হার কমে যেতে পারে । এ অবস্থায় আগামী দশকে দেশজ উৎপাদনের বর্ধিত প্রবৃদ্ধি হারের সঙ্গে সঙ্গে বিনিয়োগ ও জাতীয় সঞ্চয়ের মধ্যকার বর্তমান তফাৎ আরও বেড়ে যাবে ।

আমাদের দেশের বিনিয়োগ ও সঞ্চয় কাঠামোর ভবিষ্যৎ রূপরেখা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করলে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বেরিয়ে আসবে । প্রথমতঃ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে দেশজ বেসরকারী বিনিয়োগ ভবিষ্যতে প্রকৃত উৎপাদন কর্মকাণ্ডের পরিবর্তে ঠিকাদারী, ব্যবসা, সরবরাহ, কাজ, ভূমি ইত্যাদি ক্রিয়াকাণ্ডে প্রবাহিত হবে । এর মূল কারণ দু'টো— প্রথমতঃ যারা বিনিয়োগকারী তারা এ সব ক্রিয়াকাণ্ডের মাধ্যমেই বিনিয়োগযোগ্য সম্পদ অর্জন করেছে এবং দ্বিতীয়তঃ প্রকৃত উৎপাদন কর্মকাণ্ডের পরিবর্তে এ সব কর্মকাণ্ডে আগম হার অনেক বেশী । সরকার যদিও বিদেশী বেসরকারী বিনিয়োগকে এ অর্থনীতিতে আকৃষ্ট করতে প্রাণপাত করছেন, তবু বর্তমানের অস্থিতিশীল রাষ্ট্র, সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিদেশী বেসরকারী বিনিয়োগ খুব একটা এদেশে আসবে না । বর্তমানে প্রতি বছর দেশের বাইরে থেকে মাত্র ১ মিলিয়ন যুক্তরাষ্ট্রীয় ডলার বেসরকারী বিনিয়োগ হিসেবে আসে, যেখানে সরকারী বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ বার্ষিক ১২০০-১৩০০ মিলিয়ন ডলারের মত । ভবিষ্যতে বিদেশী বেসরকারী বিনিয়োগ প্রবণতা পরিবর্তিত হওয়ার সম্ভবনা খুব কম । সরকারী বিনিয়োগের ক্ষেত্রে শুধু একটা কথাই যথেষ্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবকাঠামো গড়ার নামে তার সিংহভাগেই ভৌত কাঠামো বিশেষতঃ দালান কোঠা, ঘর-বাড়ী, রাস্তা-ঘাট নির্মাণের কাজেই ব্যয়িত হচ্ছে। সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে যে কথাটি প্রয়োজনীয় সেটি হচ্ছে সমাজে সম্পদের ও আয়ের বর্ধিত মেরুকরণের সঙ্গে সঙ্গে সঞ্চয়ের সিংহভাগই হয়তো নব্য ধনিক শ্রেণীর কাছ থেকে আসবে । কিন্তু পূর্বোল্লিখিত কারণে তারা তা প্রকৃত উৎপাদন কর্মকাণ্ডে বিনিয়োগ করবে না । বরং তাদের জমাকৃত সঞ্চয়ের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য তারা তাদের সঞ্চয় বিদেশে পাচার করবে । এ প্রক্রিয়াটি স্বাধীনতা পরবর্তীকাল থেকেই শুরু হয়ে গেছে এবং ভবিষ্যতে এ সমাজের শ্রেণীগুলোর মধ্যকার বর্ধিত মেরুকরণের ফলে এ প্রক্রিয়াটি আরও জোরদার হবে । এর মানে দাঁড়াবে আগামী বছরগুলোতে বাংলাদেশ অর্থনীতিতে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ ও লভ্য দেশজ সঞ্চয়ের মধ্যে তফাৎ আরও বিস্তৃত হবে ।

রপ্তানী ও আমদানী

গত দশকে বাংলাদেশে রপ্তানী ও আমদানী ক্ষেত্রে যে সমস্ত পরিবর্তন হয়েছে, বিশেষতঃ টাকায় বিচার করলে, তার সঠিক প্রকৃতি নির্ধারণ করা রীতিমত কষ্টসাধ্য । স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই বাংলাদেশী মুদ্রার অবমূল্যায়ণ করা হয় । ১৯৭৫ সালে আবারও এর অবমূল্যায়ণ ঘটে । সত্তর দশকের শেষার্ধ থেকে টাকার বহির্মূল্য ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়েছে । ষাট দশকে যুক্তরাষ্ট্রের ১ ডলার এ দেশীয় মুদ্রায় ৪.৬ এককের সমান

ছিল, আজ যুক্তরাষ্ট্রীয় ১ ডলার সরকারী হারেই ৩০ টাকার বেশী । সত্তুর দশকের প্রথম দিক থেকেই বাংলাদেশের রপ্তানীযোগ্য ও আমদানীকৃত পণ্যসমূহের মূল্যস্তর ভীষণভাবে ওঠানামা করেছে । সুতারাং টাকায় প্রকাশ করলে আমাদের আমদানী ও রপ্তানীর মূল্য আমাদের মোট দেশজ উৎপাদনের অনুপাত হিসেবে স্বাধীনতার পর থেকেই বিপুল পরিমাণে বেড়ে গেছে । কিন্তু স্থিরকৃত মূল্যে যুক্তরাষ্ট্রীয় মুদ্রামানে প্রকাশ করলে আমাদের মোট রপ্তাণীমূল্য সারা সত্তুরের দশকে অপরিবর্তিত ছিল । শুছুমাত্র গত চার বছরে স্থিরকৃত মূল্যে আমাদের মোট রপ্তানীমূল্য কিছুটা বেড়েছে । আমদানী ক্ষেত্রে অবশ্য স্থিরকৃত মূল্যে যুক্তরাষ্ট্রীয় মুদ্রামানে প্রকাশ করলেও আমাদের মোট আমদানীর মূল্য ক্রমাগতভাবে বেড়ে গেছে । গত দশকের প্রথমদিকে স্থিরকৃতমূল্যে এদেশে মোট আমদানীর বার্ষিক মূল্য ছিল ৬০০ থেকে ৭০০ মিলিয়ন ডলার, আশির দশকে যা প্রায় তিন চার গুণ বেড়ে গেছে । আমদানীকৃত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি ও দেশজ প্রয়োজন বজায় রাখতে বিগত দশকে আমদানীখাতে ব্যয় বেড়েছে যার ফলে বাণিজ্য ভারসম্যে ঘাটতি বেড়ে গেছে ।

ঐতিহাসিকভাবে মোট দেশজ উৎপাদনের অনুপাত হিসেবে আমাদের রপ্তানীর পরিমাণ শতকরা ৬/৭ ভাগ। আগামী বছরগুলোতে এ অনুপাত অন্ততঃ অপরিবর্তিত রাখতে হলেও আমাদের প্রকৃত রপ্তানীর বাৎসরিক প্রবৃদ্ধির হার হতে হবে শতকরা ৪ ভাগ, যেহেতু আমরা অনুমান করেছি যে, ভবিষ্যতে বার্ষিক এ হারে আমাদের দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে । যে ভবিষ্যৎ আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট আমরা আগেই বর্ণনা করেছি, তার পরিপ্রেক্ষিতে প্রকৃত রপ্তানীর ক্ষেত্রে এ প্রবৃদ্ধির হার অর্জন অসম্ভব প্রায় । তবুও অত্যন্ত আশাবাদী হয়ে ধরা যায় যে, ভবিষ্যতে রপ্তানী ক্ষেত্রে এ জাতীয় প্রবৃদ্ধি অর্জনে আমরা সক্ষম হব যার ফলশ্রুতিতে প্রকৃত রপ্তানী ও দেশজ উৎপাদনের অনুপাত ২০০০ সাল নাগাদ ও বর্তমানের শতকরা ৬/৭ ভাগে অপরিবর্তিত থাকবে । বিশ্বব্যাংকের সমীক্ষা অনুসারে স্থিরকৃত মূল্যে আমাদের আমদানী গত কয়েক বছর ধরে গড়ে মোট দেশজ উৎপাদনের শতকরা ২২ ভাগ [১৩] । বাংলাদেশে খাদ্যশস্য চাহিদার ক্ষেত্রে আমাদের প্রক্ষেপণে দেখানো হয়েছে যে, আগামী বছরগুলোতে খাদ্যশস্যের আমদানী বাড়াতে হবে । এ দেশের অতীত ফলাফলে বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, খাদ্যশস্য ভিন্ন অন্য সব খাদ্যসামগ্রীর উৎপাদন গত দশকে কমে গেছে । সুতরাং শুধুমাত্র যে খাদ্যশস্যের আমদানীই বাড়াতে হবে তাই নয়, খাদ্যশস্য ছাড়াও তেল-বীজ, ডাল, দুগ্ধজাত দ্রব্য এ সব অতিপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর আমদানীও ক্রমাগতভাবে বাড়াতে হবে । এর মানে হচ্ছে যে আগামী দশকগুলোতে প্রাথমিক দ্রব্যসামগ্রীর আমদানী অনপেক্ষ দিক থেকেও বেড়ে যাবে । আমাদের আমদানী কাঠামো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান আমদানীর মূল কারণ হচ্ছে উৎপাদন প্রক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় মাধ্যমিক দ্রব্যসামগ্রী ও পুঁজিগত দ্রব্য সামগ্রীর ক্রমবর্ধমান চাহিদা । আগামী দিনগুলোতে দেশে বর্ধিত উৎপাদন ক্রিয়াকাণ্ডের ফলে এ জাতীয় দ্রব্য সমূহরে আমদানী আরও বাড়ানোর প্রয়োজন হবে । তবুও অত্যন্ত সহজ একটি অনুমান আমরা ধরে নেই যে, আগামী বছরগুলোতেও আমাদের প্রকৃত আমদানী ও দেশজ উৎপাদনের বর্তমান অনুপাত, অর্থাৎ শতকরা ২২ ভাগ, অপরিবর্তিত থাকবে । এর মানে দাঁড়াচ্ছে যে, আমরা ধরে নিচ্ছি যে আমাদের রপ্তানী ও আমদানীর মধ্যকার বর্তমান তফাৎ, অর্থাৎ মোট দেশজ

উৎপাদনের শতকরা ১৫/১৬ ভাগ, ভবিষ্যৎ বছরগুলোতেও অপরিবর্তিত থাকবে। প্রকৃতপক্ষে ভবিষ্যতের আন্তর্জাতিক ও জাতীয় প্রেক্ষাপটের পরিপ্রেক্ষিতে ঐ তফাৎ আরও বৃদ্ধি পাওয়ার কথা। কিন্তু তবু যদি আমরা এ জাতীয় একটি সহজ ও নমনীয় অনুমানে অটল থাকি তা'হলেও ক্রমবর্ধমান দেশজ উৎপাদনের ফলে আগামী দশকগুলোতে অনপেক্ষভাবে এ তফাৎ ক্রমানুয়ে বেড়ে যাবে।

আগামী দিনগুলোতে আমাদের আমদানী কাঠামোতে উপরোল্লিখিত বিষয়গুলো ছাড়াও অন্য একটি মাত্রিকতা যোগ হবে। তা হচ্ছে আমদানী ক্ষেত্রে সরকারের আরও নমনীয় নীতি গ্রহণ এবং এ দেশে একটি নব্য ধনিক শ্রেণীর সম্পদের স্ফীতির কারণে ভবিষ্যতে আমদানী কাঠামোতে ভোগ্যপণ্য, এমনকি বিলাস দ্রব্যের ভাগ বেড়ে যেতে পারে। এখানে উল্লেখ্য যে, বর্তমানেই এ প্রবণতা বেশ জোরদার হয়ে উঠেছে এবং আইনসম্মত উপায়ে এ জাতীয় ভোগস্পৃহা না মেটানো গেলে বেআইনী উপায়ে তা করা হচ্ছে। ফলে দেশে বিদেশী দ্রব্যের চোরাচালান অসম্ভব বেড়ে গেছে এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়েও এ সমস্যাটিকে স্বীকৃতি দেয়া হচ্ছে। তবে বর্তমান অবকাঠামো বজায় থাকলে ভবিষ্যতে এ সমস্যা আরও জটিল হয়ে উঠবে বলে মনে হয়। রপ্তানী কাঠামোর দিকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাকালে দেখা যায় পঞ্চাশের দশকে আমাদের রপ্তানীর সিংহভাগই ছিল প্রাথমিক পণ্য কিংবা কাঁচামাল। পরবর্তী দশকে আমরা অপ্রাথমিক পণ্যও রপ্তানী করতে শুরু করি। তবে সত্তুর দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত আমরা গুটি কয়েক প্রচলিত পণ্যই বাইরে রপ্তাণী করতাম। পরবর্তী সময়ে আমাদের রপ্তানী কাঠামোতে অপ্রচলিত পণ্যের ভাগ ক্রমানুয়ে বেড়ে যায় এবং বর্তমানে আমাদের রপ্তানীর এক তৃতীয়াংশেরও বেশী অপ্রচলিত পণ্য। তবে প্রশ্ন হচ্ছে এ ক্ষেত্রে আমাদের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা কতখানি ? দেয় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সে সম্ভাবনা খুব উজ্জ্ল বলে মনে হয় না।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আর একটি মন্তব্য প্রয়োজন। এ বাণিজ্যের মাধ্যমে আমাদের গ্রামীণ অর্থনীতি থেকে সম্পদের স্থানান্তর হয়েছে। ১৯৭২-৭৩ সালে থেকে ১৯৮২-৮৩ সাল পর্যন্ত আমাদের গ্রামীণ খাত থেকে বহিঃবিশ্বে রপ্তানীর মূল্য ছিল ৩৬৯২ মিলিয়ন ডলার আর একই সময় সংশ্লিষ্ট আমদানীর পরিমাণ ছিল ৯৯৯ মিলিয়ন ডলার [৩]। এর মানে হচ্ছে এদেশের গ্রামীণ খাত বহিঃবিশ্বের সঙ্গে বাণিজ্যে একটি উদ্বৃত্ত বজায় রেখেছে যে উদ্বৃত্ত বহিঃবিশ্বের সঙ্গে আমাদের শহুরে খাতের বাণিজ্য ঘাটতি মেটাতে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং বাংলাদেশের গ্রামীণ দারিদ্র্যের জন্য আমাদের বহিঃবাণিজ্য অনেকাংশেই দায়ী।

বৈদেশিক সাহায্য

স্বাধীনতার আগেও বাংলাদেশ অর্থনীতিতে খাদ্য ঘাটতি, বিনিয়োগ ও সঞ্চয় এবং ষাট দশকের শেষের দিকে রপ্তানী ও আমদানীর মধ্যে তফাৎ ছিল, যেগুলো পূরণ করতে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৈদেশিক সাহায্য পেয়েছিল। স্বাধীনতার অব্যাবহিত পরে অর্থনীতির পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের জন্য বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তি বিপুল পরিমাণে বেড়ে যায়। ১৯৮৩-৮৪ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশকে সর্বসাকুল্যে ১৬.৫ বিলিয়ন ডলার

সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে যার মধ্যে ১১.৭ বিলিয়ন ডলার ইতিমধ্যেই ব্যয় করা হয়েছে । বর্তমান সময়ে বৈদেশিক সাহায্যের বিভিন্ন প্রকারের মধ্যে প্রতিশ্রুত সাহায্যের শতকরা ১৫ ভাগের মত খাদ্য সাহায্য, শতকরা ২৮ ভাগের মত পণ্য সাহায্য এবং শতকরা ৫৭ ভাগ প্রকল্প সাহায্য । ইদানিং সময়ে প্রতিশ্রুত সাহায্যের মধ্যে প্রকল্প সাহায্যের ভাগ ক্রমান্বয়ে বাড়ছেই । প্রকল্প সাহায্যের শতকরা মাত্র ১৭ ভাগ কৃষি, গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণে ব্যয়িত হয় । এ সাহায্যের সিংহভাগ (শতকরা ৬২ ভাগ) লাভ করে নগরকেন্দ্রিক শিল্প, জ্বালানী ও যোগাযোগ খাত । খাদ্য সাহায্যের বেশী ভাগ অংশের সুবিধে লাভ করে নাগরিক জনগোষ্ঠী । আসলে খুব পরিষ্কার করে বললে বলা যায় যে, রাষ্ট্রযন্ত্রের সম্পৃক্ত নগরকেন্দ্রিক একটি বিশেষ শ্রেণীই বৈদেশিক সাহায্যের মূল সুবিধে ভোগ করে ।

পূর্ববর্তী অংশসমূহের আলোচনা ও বিশ্লেষণ থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, ভবিষ্যতে খাদ্য ঘাটতি, বিনিয়োগ ও সঞ্চয় এবং রপ্তানী ও আমদানীর মধ্যকার যে তফাৎ ক্রমবর্ধমান হারে বেড়ে যাবে বলে আমরা আশংকা করছি, তা পূরণ করতে হলে ভবিষ্যতের বাংলাদেশ অর্থনীতিতে বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজন, গুরুত্ব ও পরিমাণ বেড়ে যাবে । তবে আমাদের প্রক্ষেপিত ভবিষ্যৎ আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটের প্রেক্ষিতে এর পরিমাণ বৃদ্ধি প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী । সে ক্ষেত্রে সরকারকে প্রাপ্ত সব সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে আমদানীর সাহায্যে প্রয়োজনীয় ভোগ্য পণ্য নিয়ে আসা বনাম উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্যে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ নিশ্চিতকরণ এদু'টো বিকল্পের মধ্যে বাছাই করতে হয়, তা'হলে সামাজিক বিশৃংখলা এড়ানো এবং সরকারের সঙ্গে সম্পৃক্ত জনগোষ্ঠীকে সন্তুষ্ট রাখার উদ্দেশ্যে সরকার খুব সম্ভবতঃ ভোগপণ্য আমদানী বজায় রাখতে সচেষ্ট হবে । এর ফলে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের প্রাপ্তি ভীষণভাবে কমে যাবে । বাংলাদেশের মত একটি দেশে, যে তার উৎপাদন ক্রিয়াকাণ্ডের জন্য মাধ্যমিক ও পুঁজিগত দ্রব্যসামগ্রীর আমদানীর উপর নির্ভরশীল, সেখানে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় এ জাতীয় পণ্যের আমদানী হ্রাসের ভয়াবহ পরিণতি সহজেই অনুমেয় ।

উপসংহার

অত্যন্ত সরল কিছু অনুমানের ভিত্তিতে বাংলাদেশের জন্য ২০০০ সাল নাগাদ যে প্রক্ষেপিত চিত্র পাওয়া গেল, তা রীতিমত ভয়াবহ । এ অনুমানগুলোকে আরও পরিশোধিত করা গেলে এ ভয়াবহতার মাত্রা বাড়বে বই কমবে না । আমাদের সরলীকৃত অনুমানের ভিত্তিতেও আমরা দেখতে পাই যে, আগামী ১৫ বছরে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমরা একটি আপেক্ষিক অবন্ধুসুলভ বহিঃবিশ্বের সন্মুখীন হব, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জনসমর্থনহীন, অ-গণমুখী রাষ্ট্রযন্ত্রের অধীনে থাকব, সামাজিক ক্ষেত্রে আরও বৃহত্তর বৈষম্য প্রধান সমাজ কাঠামোয় বাস করব । অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত যে আর্থ-সামাজিক কাঠামো আমরা লাভ করব তা উন্নয়ন সহায়ক না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী ।

অর্থনৈতিক দিক থেকে আর ১৪ বছরের মধ্যে জনসংখ্যা বিপুল পরিমাণে বেড়ে যাবে, নগরায়নের বিস্তৃতি হবে অত্যন্ত দ্রুত এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও সুযোগ

সুবিধা সৃষ্টি হবে রীতিমত কষ্টসাধ্য । দেশের শ্রমশক্তি যে হারে বাড়বে, অর্থনীতির আত্মভূতকরণ ক্ষমতা সে হারে বাড়বে না । এর ফলশ্রুতিতে বেকার সমস্যা প্রকট হয়ে উঠবে । বেকার জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ক্রমানুয়ে বেড়ে যাবে । যা সামাজিক অস্থিতিশীলতা ও সংঘাতকেই আরও ঘনীভূত করবে । দেশের মোট জাতীয় আয়ের বন্টিমতা বৃদ্ধি পাবে এবং সেই সঙ্গে বাড়বে গ্রামীণ দারিদ্র্যের আপাতন । খাদ্য ঘাটতি, বিনিয়োগ সঞ্চয় এবং রপ্তানী আমদানী ফারাক ক্রমানুয়ে বেড়ে যাবে, যা পূরণ করতে দেশ ক্রমবর্ধমান হারে বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে, খুব সম্ভবতঃ যে সাহায্য প্রয়োজনীয় মাত্রায় পাওয়া যাবে না ।

যদি আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটের কোন পরিবর্তন না হয়, দেশের বর্তমান রাজনৈতিক, সামাজিক অবকাঠামো অপরিবর্তিত থাকে এবং বর্তমানের অনুসৃত সরকারী নীতি ও কার্যক্রম বজায় থাকে, তা'হলে আর দেড় দশকের মধ্যে উপরোল্লিখিত অবস্থার মুখোমুখী আমরা হব এবং যার ফল আমাদের কারো জন্য শুভ হবে না । সুতরাং এটা এড়াতে হলে এখন থেকেই সবার সঠিক সচেতনতার প্রয়োজন এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে বিকল্প ব্যবস্থা, কাঠামো ও নীতিমালা গ্রহণ আশু প্রয়োজন । মনে রাখতে হবে যে সময় আমাদের সর্বাৎকৃষ্ট নিয়ামক না হয়ে সর্বোৎকৃষ্ট হন্তা হয়ে দাঁড়াতে পারে ।

গ্রন্থপঞ্জী

১. জাহান সে ঃ গ্রাম-বাংলার দারিদ্র্যঃ প্রবণতা ও পরিমাণ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, চতুর্বিংশ সংখ্যা, ১৯৮৬.

২. Ford Foundation : Word Food Situation— 1985 and 2000 Dhaka, 1974.

৩. North-South Institute : Rural Poverty in Bangladesh : A Report to the Like-Minded Group, 1985.

৪. Alamgir, M and Berlage. L : Bangladesh : National Income and Expenditure, 1949/50—1969/70, Research Monograph No. I. Bangladesh Institute of Development Studies, Dhaka, 1974.

৫. Bangladesh Bureau of Statistics : Bangladesh Population Census, 1981— Analytical Findings and National Tables, Government of Banlgadesh, Dhaka, 1984.

৬. Bangladesh Bureau of Statistics : Statistical Year Book of Bangladesh, 1982-83, Government of Bangladesh, Dhaka, 1984.

৭. Hamid, M.A. : Food Demand-Supply Projections : Bangladesh 1978—2000, Paper prepared for the Special Seminar on Food Policy and Development Strategy of Bangladesh, Bangladesh. Economic Association, Dhaka, 1980.

৮. Murshed, S.M.M. et. al : Crop Sector Output and Employment Growth in Bangladesh Agriculture, 1967—70 to 1979—82 (Mimeo), Bangladesh Agricultural University, Mymensingh, 1984.

৯. Planning Commission : Thought on Perspective Planning, Government of Bangladesh, Dhaka, 1983.

১০. Stepanek, J.F. : Bangladesh-Equitable Growth, Pergamon Press, New York, 1979.

১১. World Bank : Bangladesh : Foodgrain Self Sufficiency and Crop Diversification, Report No. 3953 BD, Washington D.C., 1982.

১২. World Bank : Bangladesh ; Selected Issues in Rural Employment, Report No. 4292-BD, Washington D.C., 1983.

১৩. World Bank : Bangladesh : Economic Trends and Development Administration, Volume I and, II, Report No. 4822-BD, Washington D.C., 1984.

১৪. World Bank : Bangladesh Economic Development and Population Growth, Volume-III, Report No. 5409, Washington D.C., 1985.

২০০০ সালের বাংলাদেশ—একটি প্রত্যুত্তর

এম সাইদুজ্জামান*

আলোচনার শুরুতেই দুটো বিষয় উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি ;

(ক) উত্থাপিত সুচিন্তিত প্রতিবেদনটির ওপর আলাচনা ও মন্তব্য করতে গিয়ে অত্যন্ত সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে এবং

(খ) আমার মন্তব্য নিতান্তই নিজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নিজস্ব অনুধাবন এবং আমি যা বলব তা সরকারের মন্ত্রী হিসেবে নয় বরং এ সমিতির একজন আজীবন সদস্য হিসেবে ।

আজকের আলোচনায় উত্থাপিত বিষয়টি হচ্ছে '২০০০ সালের বাংলাদেশ' । কেন ২০০০ সাল ? আমি মনে করি এটি একটি উপমামূলক শব্দ মাত্র, আসলে ভবিষ্যতের প্রেক্ষাপট ও সম্ভাব্য অবস্থা সম্পর্কে আলোচনাই এ সভার মূল উদ্দেশ্য । তবে ২০০০ সালের একটি তাৎপর্য্য আছে । সেদিনকার ২০০০ সাল আর আজকের ২০০০ সালে অনেক তফাত । আমরা যখন ছোট ছিলাম, স্কুলে পড়তাম তখন ২০০০ সাল সম্বন্ধে লিখতে দিলে কল্পনার ফানুস আকাশে উড়িয়ে দিতাম—মহাশূন্যে ভ্রমণ, বৈজ্ঞানিক আবিস্কার, অভাবনীয় প্রাচুর্য্য, আর কত কি ! ১৯৩০ সালে লর্ড কেইনস তাঁর বিখ্যাত বই 'Economic Possibilities for our Grandchildren' এ বলেছিলেন যে তাঁর দৌহিত্র/দৌহিত্রীদের সময় হবে অর্থনৈতিক সংগ্রাম ও বঞ্চনা মুক্ত । তাঁর ভবিষ্যত বংশ-ধরেরা যা নিয়ে ব্যস্ত থাকবে তা হবে বেঁচে থাকার শিল্প এবং সংস্কৃতির পরিশোধিত আনন্দ । বলা বাহুল্য এটা আজকের উন্নত বিশ্বের জন্যও প্রযোজ্য নয়, এ অঞ্চলের তো কথাই ওঠে না । ২০০০ সালের সে মোহময় আকর্ষণ আর নেই । একটু ভাবলে দেখা যাবে যে আজকের তুলনায় ২০০০ সাল আগামীকালের মত, যেমন ১৯৭৪ সাল আজকের তুলনায় যেন গতকাল । কিন্তু আজকে যারা কিশোর-কিশোরী তাদের জন্য ২০০০ সালের বাংলাদেশ প্রত্যাশার সম্ভাবনায় পূর্ণ ; তারা নিশ্চয়ই রঙ্গীন ভবিষ্যতের কথা ভাবছে । তাই আজকের এ আলোচনার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ ।

লেখকদ্বয় তাঁদের প্রবন্ধে স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, তাঁদের বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন একটি প্রক্ষেপণ; যদিও তাঁরা বলেছেন যে, 'ভবিষ্যত অতীতের অভিন্ন প্রতিচ্ছবি নয় ।' আমি

---

* প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ।

আরও যোগ করব যে তাঁদের প্রক্ষেপণটি তাঁদের নিজস্ব কতগুলো অনুমানের ওপর ভিত্তি করে করা হয়েছে। তবে নিঃসন্দেহে লেখকদ্বয়ের বিশ্লেষণাত্মক প্রক্ষেপণ একটি সুপ্রচেষ্টা, কারণ এ প্রক্ষেপণ বিগত দু'দশকের ঘটনার ওপর ভিত্তি করে করা হয়েছে। কিন্তু একই কারণে তাঁদের প্রক্ষেপণটি হয়ে গেছে অতীতভিত্তিক মূল্যায়ণ। তবুও তাঁদের বিশ্লেষণ অত্যন্ত মূল্যবান। লেখকদ্বয় তাদের প্রতিবেদনের উপসংহারে বলেছেন ঃ ২০০০ সাল নাগাদ যে চিত্র পাওয়া যায় তা 'রীতিমত ভয়াবহ'; তখন আমরা একটি অবন্ধুসুলভ বহিঃর্বিশ্বের সম্মুখীন হব ; আরও বৃহত্তর ও বৈষম্য-প্রধান সমাজ কাঠামোয় বাস করব; তখনকার আর্থ-সামাজিক কাঠামো উন্নয়ন সহায়ক হবে না; জনসংখ্যা বিপুল পরিমাণে বেড়ে যাবে; প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হবে রীতিমত কষ্টসাধ্য; জাতীয় আয়ের বক্ষিমতা বৃদ্ধি পাবে; দেশ ক্রমবর্ধমান হারে বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে এবং সম্ভবতঃ সে সাহায্য প্রয়োজনীয় মাত্রায় পাওয়া যাবে না। তাঁরা আরও বলেছেন, এ কারণে এখন থেকেই সবার সঠিক সচেতনতা প্রয়োজন এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে একটি বিকল্প ব্যবস্থা ও কাঠামো গ্রাহণ আশু প্রয়োজন।

কিন্তু 'বিকল্প ব্যবস্থা' সম্বন্ধে তাঁরা কিছুই বলেননি। এতে আমরা কিছুটা হতাশ হয়েছি। সার্বিকভাবে দেখতে গেলে তাঁদের এ প্রক্ষেপণ নিতান্তই নৈরাশ্যজনক। কিন্তু কিছু কিছু বিষয় তাঁরা উল্লেখ করেছেন যেগুলোর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন, যেমন ঃ—

(ক) সমাজে নারীর ভূমিকার পরিবর্তন,

(খ) বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ও তার সম্ভাবনা,

(গ) রপ্তানী, বিশেষতঃ অ-প্রচলিত পণ্যের রপ্তানী বৃদ্ধি ও

(ঘ) অদুর ভবিষ্যতে গ্রামাঞ্চলে প্রযুক্তির বিস্তার।

কিন্তু মানব সম্পদ কিভাবে কাজে লাগানো যায় তার কোন উল্লেখ কিংবা বিশ্লেষণ তাঁরা করেননি; যদি আকস্মিকভাবে প্রাকৃতিক সম্পদ আবিষ্কৃত হয় তবে ২০০০ সাল কেমন হবে সে সম্বন্ধে কোন ইংগিত তাঁদের প্রবন্ধে নেই। গ্রামাঞ্চলে প্রযুক্তির বিস্তার হলে তার অভাবনীয় অনুকূল প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে তা তারা উল্লেখ করেননি।

লোক সংখ্যা বৃদ্ধি সম্পর্কে তাঁদের যে দুশ্চিন্তা সে সম্পর্কে আমরা সবাই সচেতন। ২০০০ সাল নাগাদ এ দেশে লোকসংখ্যা হবে ১৩/১৪ কোটি। কিন্তু জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে ২০০০ সালে কেন, তার কিছু পরেও দীর্ঘমেয়াদী কার্যক্রম ও কার্যসূচীর ব্যতিক্রমী কোন ব্যবস্থা গ্রহণ বাস্তবধর্মী নয়। এখানে কোন নাটকীয় পরিবর্তন, নাটকীয়ভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের হ্রাসের কোন সম্ভাবনা নেই। এক্ষেত্রে ধারণা, পরিকল্পনা কিংবা প্রক্ষেপণ যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন হচ্ছে সাংগঠনিক উন্নয়নের যা বর্তমান সরকার করছেন এবং যা করে যেতে হবে। এ ব্যাপারে আমাদের অবিচল প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। তবে বিষয়টি রাষ্ট্রীয় নীতির ওপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। বাংলাদেশের জনসংখ্যা সমস্যা সম্বন্ধে বিশ্ব ব্যাংকের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট রবার্ট

ম্যাকনামারা বলেছেন যে, এখানে প্রয়োজন একটি দৃঢ় উৎসাহীকরণ ও নিরুৎসাহীকরণ ব্যবস্থা । এ ধরনের ব্যবস্থা নিতে হলে সরকার এবং জাতিকে এক যোগে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যা সবচেয়ে জনপ্রিয় নাও হতে পারে । বর্তমান প্রবন্ধের লেখকদ্বয় এ ব্যাপারে কোন ব্যতিক্রমধর্মী সমাধান, প্রচলিত পদ্ধতির কোন পরিবর্তন সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করেননি ।

লেখকদ্বয় তাঁদের প্রবন্ধে বলেছেন, 'ভবিষ্যতে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজন, গুরুত্ব ও চাহিদা বেড়ে যাবে ।' এটি একটি বাস্তবধর্মী অনুধাবন । তাঁরা বলেছেন যে, আগামীতে বিনিয়োগ অনেক বাড়াতে হবে । এটিও সত্যি, কিন্তু কিভাবে তা করা যায়, কিভাবে অভ্যন্তরীণ সম্পদ ও সঞ্চয় বৃদ্ধি করা যায় সে সম্বন্ধে তাঁরা কিছু বলেননি । লেখকদ্বয় তাঁদের প্রবন্ধে বলেছেন, 'বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে শতকরা ৪ ভাগের বেশী বাৎসরিক গড় প্রবৃদ্ধি সম্ভব নয় ।' কোন হিসাবে বাস্তব ? এটা কি সরকারের চরিত্র নিরপেক্ষ ? তা'হলে তাঁদের বিশ্লেষণ ও মন্তব্যের অধিকাংশই অর্থহীন হয়ে পড়বে । তাঁরা আরও বলেছেন যে, অবকাঠামো সৃষ্টি হবে রীতিমত কষ্টসাধ্য । কিন্তু পরে আরও বলা হয়েছে যে, বৈদেশিক সাহায্যে প্রকল্প সাহায্যের পরিমাণ বেড়ে যাবে । যদি তাই হয়, তবে কেন অবকাঠামো সৃষ্টি করা কষ্টসাধ্য হবে ? এটাও তো সর্বজনবিদিত যে এমনকি খাদ্য সাহায্য দাতাগুলো ক্রমেই শর্ত আরোপ করছে যে, খাদ্য সাহায্য দিয়ে কর্মসংস্থান করে অবকাঠামো সৃষ্টিতে সহায়তা করতে হবে ।

লেখকদ্বয় বলেছেন যে, 'অর্থনীতি ক্রমবর্ধমান হারে বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল হবে', 'প্রয়োজনীয় মাত্রায় সাহায্য পাওয়া যাবে না' এবং 'অবন্ধুসুলভ বহিঃবিশ্বের সম্মুখীন হবে ।' অর্থাৎ তাঁরা একটা বৈরী আন্তর্জাতিক বৈদেশিক সাহায্য ও পুঁজির পরিবেশ সম্পর্কে বলেছেন । এটা হয় তো বর্তমানে সত্যি, কিন্তু এটা চিরকালের জন্য বৈরী থাকবে একথা আমি বিশ্বাস করি না । কারণ ঃ

(ক) আন্তর্জাতিক সাহায্যের পরিমাণ, চরিত্র ও আন্তর্জাতিক পুঁজি প্রবাহ পারস্পরিক স্বার্থের ওপর নির্ভরশীল । এ সম্পর্কে আমি পরে আরও বলব ;

(খ) পঞ্চাশ, ষাট ও সত্তুর এর দশকে বৈদেশিক সাহায্যের ভিত্তি ছিল মূলতঃ রাজনৈতিক । কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে, পারস্পরিক স্বার্থ সম্পর্কে দাতা দেশগুলো সজাগ হচ্ছে ;

(গ) বৈদেশিক সাহায্য সম্পর্কে স্থবিরতা কিংবা বিভ্রান্তি—এটা মূলতঃ শিল্পোন্নত দেশে একটা বিশেষ রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল । ধারণা ছিল যে, শিল্পোন্নত দেশগুলো একটি বদ্ধ কাঠামোর মাধ্যমে তাদের প্রবৃদ্ধি বাড়িয়ে যেতে থাকবে— উত্তর আমেরিকা, পশ্চিম ইউরোপ ও জাপান নিজেদের মধ্যে বাণিজ্য ও পুঁজি প্রবাহ মোটামুটিভাবে সীমাবদ্ধ রেখে তাদের প্রবৃদ্ধি বাড়াবে । কিন্তু এ চিন্তাধারার পরিবর্তন ঘটেছে— স্বার্থের পারস্পরিকতা সম্পর্কে উপলব্ধি ফিরে আসছে । 'বেকার (Becker) পরিকল্পনা' বা 'বেকার (Becker) উদ্যোগকে' আমি বলব সে উপলব্ধির

প্রাথমিক ও সীমিত উপসর্গ । আমরা যদি জাপানের কথা ভাবি তাহলে দেখব জাপানকে তার নিজস্ব স্বার্থে; রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থেই উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য সাহায্য বাড়াতে হবে ।

(ঘ) ২০০০ সালে শিল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলো সম্পর্কে যদি ভাবা যায়, তাহলে দেখা যাবে যে তখন তাদের জনসংখ্যা সম্পর্কিত কাঠামো হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন। শিল্পোন্নত দেশগুলোতে আনুপাতিকভাবে জনগোষ্ঠিতে বৃদ্ধির সংখ্যা বেড়ে যাবে এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোতে জনসংখ্যায় তারুণ্যের হার বৃদ্ধি পাবে । তখন বিশ্বের উৎপাদন কাঠামো —সেটা শুধুমাত্র ভোগ্যপণ্যের ক্ষেত্রেই নয় বরং মূলধন সামগ্রীর ক্ষেত্রেও—এ জনগোষ্ঠীর চাহিদার স্বরূপ দ্বারা নির্ণীত হবে । বাংলাদেশও এ ব্যাপারে একটি ব্যতিক্রম হবে না । শিল্পোন্নত দেশগুলোকে নিজেদের স্বার্থেই এদিকে দৃষ্টি দিতে হবে ।

বৈদেশিক সাহায্যের ওপর আমাদের নির্ভরশীলতা বাড়বে—এটা সত্যি ; তবে এখানে বিবেচ্য বিষয় আপেক্ষিক ও অনপেক্ষ নির্ভরশীলতা । অনপেক্ষ হিসাবে নির্ভরশীলতা বাড়লেও আপেক্ষিক হিসাবে কেন তা বাড়বে তা স্পষ্ট নয় । তৃতীয় পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতার পরিমাণ নির্ধারিত হয়েছে মোট বিনিয়োগের শতকরা ৫৫ ভাগ। দেশের কতিপয় অর্থনীতিবিদ আত্মনির্ভরশীলতা ভিত্তিতে একটি বিকল্প পরিকল্পনা করা সম্ভব কিনা সে সম্বন্ধে সমীক্ষা করেছেন । বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের অনুরোধে প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ডঃ ওয়াহিদুল হক সম্প্রতি এক সমীক্ষা ও বিশ্লেষণে নির্ধারণ করেছেন যে, বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ কমিয়ে যদি সব মৌলিক ভোগকে স্থির করে দেয়া হয়, তবে আগামী পাঁচ বছরে জাতীয় আয় প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ৩.৯ ভাগ হতে পারে ; কিন্তু তখনও পরিকল্পিত বিনিয়োগের শতকরা ৫২ ভাগ বৈদেশিক সাহায্য থেকে আসতে হবে । এর সঙ্গে যদি অমৌলিক ভোগ স্থির করে দেয়া হয় তবে এ প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ৬ ভাগে উন্নীত হতে পারে ; তবুও বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা থাকবে শতকরা ৪৮ ভাগ। অধ্যাপক হক আরও বলেছেন যে, শতকরা ৪৮ ভাগের নীচে নির্ভরশীলতা নামিয়ে নিয়ে এলে সেটা দেশের অর্থনীতির পক্ষে মঙ্গলজনক না হয়ে বরং ক্ষতিকর হবে । প্রশ্ন হচ্ছে অধ্যাপক ওয়াহিদুল হক যে ধরনের কৃচ্ছতা সাধনের কথা বলেছেন, সমাজ কি সে ধরনের কৃচ্ছতা মেনে নিতে রাজী আছে ? আমার ধারণা ঃ

(ক) আমাদের জনগণ পরিবর্তণ গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত ;

(খ) তারা কাজ করতে এবং সে কাজের বিনিময়ে আয় পেতে চায় এবং

(গ) স্বার্থত্যাগ, পরিবর্তন ও কষ্ট মেনে নিতে নাগরিক জনগোষ্ঠীর অনীহা আমাদের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর চাইতে বেশী । এখানে উল্লেখ্য যে, উত্থাপিত প্রবন্ধের সমস্ত বিশ্লেষণই নাগরিক জনগোষ্ঠীর দৃষ্টিকোণ থেকে করা হয়েছে ।

আমি মনে করি বিশ্বের যে কোন অন্য একটি উন্নয়নশীল দেশের চেয়ে বাংলাদেশের বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজন বেশী । আমরা যদি আমাদের জনসংখ্যামূলক কাঠামোর

কথা ভাবি, বর্তমান মাথাপিছু আয়ের কথা ভাবি, প্রাকৃতিক সম্পদের লভ্যতা সম্বন্ধে ভাবি এবং আমাদের জনগণের জীবন-যাত্রার মান একটি ন্যূনতম গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে উন্নীত করতে হলে যা প্রয়োজন তার কথা ভাবি, তবে বৈদেশিক সাহায্যের অবশ্যই প্রয়োজন হবে। এটাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বাংলাদেশ মাথাপিছু যে বৈদেশিক সাহায্য পেয়ে থাকে এটা অনেক মধ্যআয় ও নিম্ন আয়ের দেশের চেয়ে কম। যেটা মনে রাখা প্রয়োজন তা হল আজকের পৃথিবীতে বৈদেশিক সাহায্য, বিশেষতঃ সুবিধাজনক শর্তমূলক সাহায্যের জন্য প্রচণ্ড রকমের প্রতিযোগিতা ও প্রতিযোগিতামূলক চাহিদা রয়েছে। আজ আমরা যা পাব এবং আত্মভূত করতে পারব, তা আগামী দিনের জন্য প্রামাণ্য-মাত্রা হয়ে দাঁড়াবে। সাহায্যদাতা দেশগুলোর দৃষ্টি এখন ক্রমেই আফ্রিকা মহাদেশের উপর নিবদ্ধ হচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে বৈদেশিক সাহায্য প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা বাড়াতে হলে এটা আমাদের স্বার্থেই নিশ্চিত করতে হবে যে আমরা ক্রম বর্ধমান হারে প্রয়োজনীয় ও লাভজনকভাবে অধিক থেকে অধিকতর সাহায্য ব্যবহার করতে পারি। কিন্তু এটা অন্য বিষয়ের শর্তসাপেক্ষ— যার সম্পর্কে পরে কিছু বলব।

আমি আগেই বলেছি যে উত্থাপিত প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে, 'বিকল্প ব্যবস্থা কাঠামো ও নীতিমালা গ্রহণ আশু প্রয়োজন', কিন্তু কি এই ব্যবস্থা সে সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। আমি এ বিকল্প ব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই ঃ

(ক) উপস্থাপিত প্রবন্ধের প্রক্ষেপণ আমাদের জনগণের ক্ষমতা ও দক্ষতা সম্পর্কে একটি স্থবির অনুমানের ভিত্তিতে করা হয়েছে। যথাযথ উৎসাহের প্রেক্ষিতে আমাদের জনগণের ইতিবাচক প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারে তাদের ক্ষমতা এবং সচেতনতা সম্পর্কে আমাদের পূর্ণ আস্থা থাকা উচিত। সাধারণ মানুষ পরিবর্তিত ব্যবস্থার সাথে নিজেদের যেভাবে খাপ খাইয়ে নিতে পারে সেটা মনে রেখেই উৎপাদন নীতিমালা ও উৎপাদন ব্যবস্থা প্রণয়ন করতে হবে।

(খ) জনগণ উৎসাহে সাড়া দেবে, পৃষ্ঠপোষকতায় নয়। জাতীয় আয় পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে বাড়ানো সম্ভব নয়, একমাত্র উৎসাহ দিয়েই তা সম্ভব। তৈরী পোশাক শিল্পে যে উদ্দীপনা ও মৌলিক পরিবর্তন আমরা লক্ষ্য করেছি— এদেশের মানুষ, পুরুষ ও মেয়েরা, কিভাবে প্রচণ্ড বাধার বিরুদ্ধে এবং স্বল্প অভিজ্ঞতা নিয়ে নিজেদেরকে ব্যাপ্ত করে সমাজে মৌলিক পরিবর্তনের সুযোগ সৃষ্টি করেছে, তা উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে। এ শিল্পের প্রসারে, উৎপাদন ব্যবস্থায় ও নিয়ন্ত্রণে অনেক দুর্বলতা রয়েছে সন্দেহ নেই— কাপড় চোরাচালান হয়েছে, শ্রমিক শোষিত হয়েছে— কিন্তু এগুলো সংশোধনযোগ্য। এক হিসেবে দেখা গেছে যে যদিও এ শিল্পে সংযোজিত মূল্য হয়ত শতকরা ২৫ ভাগ, তবুও এ সৃষ্টমূল্যের প্রায় সবটাই সঞ্চয় হিসেবে অর্থনীতিতে প্রতিফলিত হচ্ছে।

(গ) খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমরা বিগত পাঁচ বছরে দেখেছি যে, উৎসাহের মাধ্যমে উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব। এটা বলতে হবে যে, আমরা এ বিষয়ে যথোপযুক্ত মনোযোগ দেইনি, উৎসাহের সর্বোৎকৃষ্ট গুচ্ছ নিয়ে এখনও বিতর্কের অবকাশ আছে, এ জাতীয় গুচ্ছের প্রকৃষ্ট নমুনার রূপরেখা এখনও আমরা গড়ে তুলতে পারিনি, সাংগঠনিক ও কাঠামোগত বিষয়াদি এখানে

মতৈক্যের ভিত্তিতে সমাধান করা যায়নি । কিন্তু আপনারা সকলেই স্বীকার করবেন যে, এ ব্যাপারে সম্ভাবনা যথেষ্ট রয়েছে । ভূমি সংস্কারের সম্ভাবনাকে কেন আমরা এড়িয়ে যাব ? আজকের এ সভায় যারা উপস্থিত রয়েছেন, তাদেরই অনেকে সমীক্ষার দ্বারা দেখিয়েছেন যে ভূমি সংস্কার করে কৃষি ও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব ।

(ঘ) শিক্ষা ব্যবস্থা, শিক্ষার প্রসার, প্রাথমিক, কারিগরী ও উচ্চশিক্ষার যথোপযুক্ত বিন্যাস করে এবং জনসংখ্যা পরিকল্পনা নীতির সঙ্গে তার সমন্বয় করে উৎসাহের ভিত্তিতে একটি বিস্তৃত ভিত্তিসম্পন্ন তুলনামূলক সুবিধার সুযোগ আমরা অবশ্যই নিতে পারি । তৈরী পোশাক শিল্প কেবল একটা উদাহরণ— অন্যান্য ক্ষেত্রও আবিস্কার করতে হবে । আমি মনে করি যুক্তিযুক্ত রাজস্ব নীতি এবং অন্যান্য উৎসাহমূলক ব্যবস্থাদির সঠিক সংযুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশে আগামী দশ বছরে ৫০০ থেকে ১০০০ মিলিয়ন ডলার মূল্যের রপ্তানীমুখী বৈদ্যুতিক শিল্প গড়ে তোলা সম্ভব । কিছুদিন আগে যে ক্ষুদ্র শিল্প প্রদর্শনী চলছিল তা দেখলে সত্যি চোখ খুলে যায়, আমাদের মানুষের উদ্ভাবনী শক্তি ও দক্ষতা সম্বন্ধে আমাদের মনে উৎসাহের সঞ্চার হয় । এদেশের লোক দূরদর্শন, বেতার ছাড়াও অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি সম্পূর্ণ নিজস্ব উদ্যোগে সংযোজন করছে এবং সেই সঙ্গে এসবের বিভিন্ন অংশ স্থানীয়ভাবে প্রস্তুত করছে । যদিও এগুলো প্রাথমিক অবস্থায় আছে, আমি শুধু এর সম্ভাবনা সম্বন্ধে ইঙ্গিত ও উদাহরণ দিয়েছি ।

(ঙ) কৃষি ও শিল্পে সম্পদের অধিকারের ক্ষেত্রে অবস্থাটিকে যদি ন্যায় সঙ্গত ও বৈষম্যহীন করা যায়, তাহলে উৎপাদন ও কর্ম সৃষ্টিতে বিরাট পরিবর্তন আসতে পারে । আমাদের বর্তমান প্রচেষ্টা হচ্ছে সম্পদের বৃত্তাকার একটি প্রবাহ নিশ্চিতকরণ, এ সম্বন্ধে সরকারের সর্বশেষ পদক্ষেপ তার ইঙ্গিত বহন করে । সমাজের সকল স্তরে, বিশেষ করে সর্বনিম্ন স্তরে যাতে শোষণ বন্ধ করা যায় এই পদক্ষেপ তারই সূচনা ।

(চ) উৎপাদন ও রপ্তানীতে অভ্যন্তরীণ ও বহিঃর্বিশ্ব থেকে অভিঘাতের সম্ভাবনা রয়েছে । আমরা তাদের সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করতে পারব না, কিন্তু এ ব্যাপারে যা করা যেতে পারে তা হচ্ছে এদের প্রভাব ন্যূনতম করার জন্য নীতিক্রম ও বিনিয়োগ গ্রহণ। আমরা অনুমান করতে পারি না এবং তা করাও উচিৎ নয় যে বছরের পর বছর আমরা উৎপাদনে ব্যর্থ হব । যে অবকাঠামোর সৃষ্টি হয়েছে তার মূল পর্যন্ত ব্যবহার অপরিহার্য, কিন্তু সে ব্যবস্থা অসম্পূর্ণ । উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, গঙ্গা-কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্প, কর্ণফুলী, মুহরী ও চাঁদপুর সেচ প্রকল্প, তিস্তা বাঁধ প্রকল্প ইত্যাদি । আমাদের দেশে কৃষি ক্ষেত্রে যে উৎপাদনের সম্ভাবনা রয়েছে, বর্তমানে তার এক তৃতীয়াংশ থেকে অর্ধেক পর্যন্ত মাত্র বাস্তবায়িত হচ্ছে।

মোদ্দা কথা হল প্রবৃদ্ধির জন্য যা প্রয়োজন তা হচ্ছে বিনিয়োগযোগ্য সম্পদ ও বৈদেশিক মুদ্রা সম্পদ কিভাবে আহরণ করা যায়, কিভাবে জাতীয় সঞ্চয়ের হার বাড়ানো যায়, কিভাবে রপ্তানী-আমদানী বাড়ানো/কমানো যায়, কিভাবে বৈদেশিক সাহায্যের ব্যবহার বাড়ানো যায়— তার জন্য কর্মসূচী প্রণয়ন করা । জাতীয় সঞ্চয় আসবে সরকারী ও বেসরকারী খাত থেকে । দেশে বর্তমানে যে কর ব্যবস্থা রয়েছে তার দক্ষ ব্যবহার, অবাঞ্ছিত অপচয় রোধ, নাগরিক ও গ্রামীণ সম্পত্তির উপর ধার্য করের যথার্থকরণ ইত্যাদি রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির বিপুল সম্ভবনার ইঙ্গিত দেয় । আমি মনে করি যে এ ধরনের বাস্তবমুখী পদক্ষেপ যদি গ্রহণ করা যায়, তবে জাতীয় সঞ্চয় হার সম্বন্ধে তৃতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনায় যে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে, তা সহজেই আগামী পাঁচ বছরে দ্বিগুণ করা যাবে । দ্বিতীয়তঃ রাষ্ট্রায়ত্ব বিভিন্ন শিল্প ও সংস্থা থেকে লভ্যাংশ ও উদ্বৃত্ত উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়ানো সম্ভব, যদি প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রশাসনিক শৃংখলা উন্নীত করে দক্ষতা বাড়ানো যায় । আর বেসরকারী খাতকে যথোপযুক্ত উৎসাহ দিয়ে এবং একই সঙ্গে আর্থিক শৃঙ্খলা ও সংশ্লিষ্ট আইনসমূহের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে, এই খাতের সঞ্চয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়ানো সম্ভব ।

সার্বিকভাবে যা প্রয়োজন তা হল কঠিন ব্যবস্থা বেছে নেয়া । কঠিন ব্যবস্থার মানেই একনায়কতান্ত্রিক বা নিয়ন্ত্রিত সরকার, যদিও এ জাতীয় কাঠামো কঠিন ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়ক হতে পারে । গুণার মির্ডাল তাঁর বিখ্যাত বিশ্লেষণে 'নমনীয় রাষ্ট্র' ও 'অনমনীয় রাষ্ট্রের' মধ্যে বেছে নেয়ার যে স্বাধীনতার কথা বলেছেন আমি তার কথাই বলছি । আমার মতে 'গণতন্ত্র' ও 'অনমনীয় রাষ্ট্রের' মধ্যে কোন অসঙ্গতি নেই । আমাদের যা প্রয়োজন তা হচ্ছে গণতন্ত্রের ওপর ভিত্তি করে একটি অনমনীয় রাষ্ট্র। একটা কথা অত্যন্ত বাস্তব যা আমাদের মনে রাখতে হবে, তা হল স্বাধীনতার পরবর্তী প্রথম দশকে আমাদের দেশে বিভিন্ন মতবাদের যে সব সরকার ক্ষমতায় ছিলেন, সবাই কঠিন ব্যবস্থা নিতে ইতঃস্তত করেছেন । এর কারণ হয়ত জনগণের দুঃখ-কষ্টের সাম্প্রতিক ইতিহাস— প্রথমে পাকিস্তানী ব্যবস্থায় এবং পরবর্তী সময়ে মুক্তিযুদ্ধের সময়ে সবারই মনে জাগরুক ছিল । এখন আমরা এমন একটি পর্যায়ে এসেছি সেখানে সরকার কঠিন ব্যবস্থা নিতে প্রস্তুত, যার বেশ ক'টি প্রমাণ ও ফলাফল আমরা পেয়েছি এবং এ ক্ষেত্রের সম্ভাবনাসমূহকে আমাদের খাটো করে দেখলে চলবে না । এ ক্ষেত্রে পূর্বশর্ত হল যে, যারা এ ব্যবস্থায় সুবিধাপূর্ণ স্থানে অবস্থান করছে, তাদের দুঃখ-কষ্ট ও শৃংখলা মেনে নিতে ও ভাগ করে নিতে প্রস্তুত থাকতে হবে ।

খাদ্য, সার এবং জ্বালানী, এগুলোই হচ্ছে আমদানী প্রতিকল্পনের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র । বিনিয়োগ সঠিক দিকেই পরিচালিত হচ্ছে এবং আরও বিনিয়োগের প্রয়োজন । রপ্তানী সম্ভাবনাকেও পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগাতে হবে । উদাহরণ হিসেবে বলা যায় ঃ— (ক) কৃষি-নির্ভর/সামুদ্রিক পণ্য, (খ) চামড়াজাত সামগ্রী ও প্রক্রিয়াজাত চামড়া, (গ) তৈরী পোশাক, (ঘ) বৈদ্যুতিক পণ্যাদি এবং (ঙ) গ্যাস-নির্ভর পণ্য, বিশেষতঃ সার । কিন্তু অন্যান্য সম্ভাবনাও রয়েছে । উৎসাহ এবং কম নিয়ন্ত্রিত বিনিয়োগ সুযোগের সংযুক্তি এ সব সম্ভাবনার বাস্তবায়নে সাহায্য করবে । কিছুদিন আগে সিলেটে তেল আবিষ্কৃত হওয়ার সংবাদ আপনারা নিশ্চয়ই শুনেছেন । এ সম্ভাবনাকেও আমাদের মনে রাখতে হবে ।

আমি আগেই বলেছি যে আন্তর্জাতিক অবস্থা চিরকাল বৈরী থাকবে না। সম্প্রতি বিশ্বব্যাংকের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার অষ্টম কিস্তির জন্য দাতা দেশগুলোর অঙ্গীকারণ ১২.৪ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে, যা পূর্ববর্তী সময়ে সপ্তম কিস্তির সময় ছিল ৯ বিলিয়ন ডলার। 'বেকার উদ্যোগের' কথা আমি আগেই উল্লেখ করেছি। এর ভিত্তিতে মধ্য-আয় ও নিম্ন-আয়ের দেশসমূহে পুঁজি প্রবাহ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক পুঁজি প্রবাহের জোয়ার ভাঁটাকে যে সব গতিময় পরিবর্তন প্রভান্বিত করে, সেগুলোকে আমাদের উপেক্ষা করলে চলবে না। সম্প্রতি আমি ইসলামাবাদে একটি সম্মেলনে যোগ দিতে গিয়েছিলাম। এতে বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল, জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচী, জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক জরুরী শিশু তহবিল, বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী, যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা, যুক্তরাজ্যের বৈদেশিক উন্নয়ন সংস্থা, সুইডিশ আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা, কানাডীয় আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা, নেদারল্যান্ডের সাহায্য সংস্থা এ সব প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ এবং দায়িত্ব সম্পন্ন বেশ কয়েকজন মন্ত্রী পর্যায়ের কর্মকর্তা সমবেত হয়েছিলেন। এ ছাড়া এ সভায় যোগ দেন জাতিসংঘের দু'নম্বরের কর্মকর্তা,আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা সংস্থার মহাপরিচালক এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন সংস্থার সভাপতি। এ সব সংস্থা ও দেশগুলো মিলিতভাবে প্রতি বছর প্রায় ৫০ বিলিয়ন ডলার পরিমাণ সাহায্যের কর্মসূচী প্রণয়ন করে। এ আলোচনায় সুপারিশ করা হয় যে দক্ষিণ এশীয় সহযোগিতা সংস্থাভুক্ত দেশগুলো যদি ২০০০ সাল নাগাদ তাদের জনগণের জন্য সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য রক্ষা,নিরাপদ খাবার পানি সরবরাহ, সার্বজনীন প্রতিষেধক কর্মসূচী ও পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত কার্যসূচী পৃথক পৃথকভাবে প্রণয়ন করে সমন্বিতভাবে 'দক্ষিণ এশীয় সহযোগিতা সংস্থা ২০০০' কার্যসূচী হিসেবে প্রস্তাব প্রণয়ন করেন, তবে সাহায্য দাতা দেশ ও সংস্থাগুলো উৎসাহিত হয়ে বর্ধিত সাহায্য প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন— এ রকম আশাবাদ অবাস্তব হবে না।

কিন্তু অধিকতর বৈদেশিক সাহায্য পেতে হলে আমাদের সঠিক কর্মসূচী ও প্রকল্প প্রণয়ন করতে হবে এবং আমাদের ফলাফল উন্নীত করতে হবে। ফলাফলের সূচকগুলো হল ঃ (ক) দেশজ সম্পদ যোগানের ক্ষেত্রে আমাদের নিজস্ব প্রচেষ্টা, (খ) সাহায্য, বিশেষতঃ খাদ্য সাহায্যের ক্ষেত্রে সমতা ও (গ) উন্নয়ন প্রচেষ্টায় দারিদ্র্য দূরীকরণমুখীকরণ। প্রকল্প সাহায্য নিশ্চয়ই বাড়বে, যা উত্থাপিত প্রবন্ধের লেখকদ্বয়ও বলেছেন, কিন্তু আমাদের প্রয়োজন অধিক পরিমাণে স্থানীয় ব্যয় সংকুলানের জন্য সাহায্য। এটা বিনিয়োগ বৃদ্ধির, বিশেষতঃ সামাজিক খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য। এর পূর্বশর্ত হবে সঞ্চয় বাড়ানোর ব্যাপারে আমাদের নিজস্ব প্রচেষ্টা, কর্মসূচী ও প্রকল্প প্রণয়নে ও বাস্তবায়নে আমাদের নিজস্ব ক্ষমতা সৃষ্টি।

ভবিষ্যতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ও কর্মসংস্থানের দ্রুত প্রসার করতে হলে আমাদের বাজার ও উৎসাহভিত্তিক ব্যবস্থার দিকে যেতে হবে। এ সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। উৎসাহ ও বিকেন্দ্রীকরণ বিষয়ে নতুন করে মূল্যায়ণ করা হচ্ছে। এমন কি কেন্দ্রীয় পরিকল্পিত অর্থনীতি, যাকে আমরা অ-বাজার অর্থনীতি বলে আখ্যায়িত করে থাকি, তারাও এ জাতীয় কর্মসূচী গ্রহণ করছে। এ জাতীয় পরিবর্তনই বিশ্বের সব জায়গায়

ঘটছে এবং এটা স্বীকার করার ব্যাপারে কোন রকমের দ্বিধা থাকার সুযোগ নেই। হাঙ্গেরী, চীন এমনকি সোভিয়েত রাশিয়া, ভিয়েতনাম ও আমাদের প্রতিবেশী দেশেও এর প্রতিফলন হচ্ছে।

উপসংহারে বলতে চাই যে আমি নৈরাশ্য ও হতাশার কারণ দেখি না। আমি আশাবাদী। যদি বিগত পঁচিশ বছরে দক্ষিণ এশিয়াকে সামগ্রিকভাবে দেখি, এখানকার ১০০ কোটি লোক দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এসেছে। পঞ্চাশ-ষাটের দশকে যে প্রক্ষেপণ করা হয়েছিল, তাতে অনেকেই ধারণা করেছিলেন যে ঃ (ক) দক্ষিণ এশিয়া একটি শূন্য ঝুড়ি অবস্থায় অবস্থান করবে, (খ) এখানকার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার গ্রহণযোগ্য সীমার মধ্যে থাকবে না এবং (গ) কিছুদিন পর পরই নিয়মিতভাবে এখানে দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব ঘটবে। ১৯৮০-৮৫ সালের মধ্যে এ ১০০ কোটি লোক তাদের জাতীয় আয় বাৎসরিক শতকরা ৫ ভাগ হারে বাড়িয়েছে। এটা প্রমাণ করে যে সংগঠন গড়ে তোলা, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং নিশ্চিত রাজনৈতিক সংকল্প, যা উন্নত বহিঃবিশ্বের অবস্থার কারণে আরও ইতিবাচক হতে পারে, থাকলে প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধির ত্বরণ অসম্ভব নয়।

আমরা যদি বাংলাদেশের দিকে তাকাই তা'হলে দেখব, বিগত ৫ বছরে খাদ্য উৎপাদনের হার জনসংখ্যা উৎপাদনের হার ছাড়িয়ে গেছে, কৃষি খাতে আমাদের চাষীরা উন্নত প্রযুক্তি গ্রহণ করেছে, এক দশকের ওপর এ দেশে কোন দুর্ভিক্ষ হয়নি, এদেশে ব্যবহৃত সারের শতকরা ৭৫ ভাগ এখন এ দেশেই উৎপাদিত হয়, খাদ্য-শস্য ভিন্ন অন্যান্য কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদনের দিকে মনোযোগ দেয়ার ব্যাপারে একটি ক্রমবর্ধমান ও সুস্পষ্ট সচেতনতা দেখা দিয়েছে, সত্তুর দশকের প্রথম দিকে যখন জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রায় শতকরা ৩ ভাগ ছিল, এখন তা প্রায় শতকরা ২.৪৫ ভাগে নেমে এসেছে, পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে এখন আর কোন বিভ্রান্তি নেই, সমাজে নারীরা একটি সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে, পাঁচ বছর আগে যেখানে আমাদের জ্বালানী চাহিদার শতকরা ৪৫ ভাগ অভ্যন্তরীণ সম্পদ থেকে আসত, আজ সেখানে এ চাহিদার শতকরা ৬০ ভাগ অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে আসছে এবং গত পাঁচ বছরে জ্বালানী আমদানীর পরিমাণ মোটামুটিভাবে স্থিরকৃত হয়ে আছে, গত পাঁচ বছরে ডলারেও আমাদের রপ্তানী আয় শতকরা ৫০ ভাগ বেড়েছে এবং গত ৮ বছরে অপ্রচলিত পণ্যের রপ্তানী প্রায় তিনগুণ বেড়েছে।

চার দিকে দারিদ্র দূরীকরণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান সচেতনতা দেখা যাচ্ছে। গ্রামীণ উন্নয়ন এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ক্ষেত্রে আমরা দেশজ সংগঠন ও নমুনা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছি যা বিশ্বব্যাপী মনোযোগ আকর্ষণে সমর্থ হয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে গ্রামীণ ব্যাংক প্রকল্প, মৌখিক জলশূন্যতা নিরোধক নিরামক ব্যবস্থা ইত্যাদি। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান, যেমন গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র, বাংলাদেশ গ্রামীণ উন্নয়ন কেন্দ্র, প্রশিখা ইত্যাদির মাধ্যমে সামাজিক খাতে বেসরকারী প্রচেষ্টা বিস্তৃততর হচ্ছে, যাতে বেসরকারী প্রচেষ্টায় সামাজিক সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনা প্রতিফলিত হচ্ছে।

২০০০ সাল সম্বন্ধে চিন্তা করলে অর্থনৈতিক প্রেক্ষিতে বাদ দিয়েও আর কিছু বলতে হয় ঃ

(ক) ২০০০ সালে জীবিত মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা হবে নগণ্য এবং ততদিনে প্রায় সব বাংলাদেশীর কাছেই মুক্তিযুদ্ধ একটি অতীত ঘটনায় পরিণত হবে ।

(খ) তখনকার প্রজন্মের মানুষেরা, বিশেষ করে প্রায় ১০ কোটি তরুণ, আমরা যতখানি আশা করি তার চাইতে কম কৃতজ্ঞ থাকবে এবং এখনই যদি আমরা যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ না করি তা হলে যে সুযোগ আমরা হারাব তার প্রতি সম্ভবতঃ অঙ্গুলি নির্দেশ করবে । তারা হয়তো জানতে চাইবে তাদের স্বপ্নের বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষ অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো গড়ে তোলায় কেন আমরা ব্যর্থ হয়েছি ।

(গ) ঐতিহাসিকভাবে আমরা শোষিত হয়েছি এটা তারা মেনে নেবে, কিন্তু তারা যুক্তি দেখাবে যে এ কথা প্রাসঙ্গিক নয় । আমরা হয়তো বলব যে আমরা দরিদ্র ছিলাম কিন্তু তারা যুক্তি দেখাতে পারে যে কোন কোন পরিবর্তনের জন্য অর্থ প্রয়োজন হয় না— প্রয়োজন হয় সাহস ও দূরদৃষ্টির ।

(ঘ) একটি সমন্বিত এবং উন্নতিশীল জাতি গঠনের প্রচেষ্টায় প্রয়োজন কার্যকরী একটি সরকারের, কিন্তু কার্যকরী সরকারের জন্য আবার প্রয়োজন দায়িত্ব এবং সামাজিক শৃঙ্খলার দৃঢ় নিশ্চিতকরণ। রাজনৈতিক গণতন্ত্রে যদি কাজ করতে হয়, তা'হলে সামাজিক শৃঙ্খলা একটি অত্যাবশ্যকীয় শর্ত ।

দুঃখ-কষ্ট এবং স্বার্থত্যাগের প্রয়োজন যখন দেখা দেয় তখন ঃ

(ক) এটা সাধারণ মানুষের কাছে ব্যাখ্যা করার ব্যাপারে শিক্ষাজীবিদের একটি দায়িত্ব আছে ;

(খ) এটা শুধু মাত্র সরকারের একার দায়িত্ব নয় ;

(গ) কৃচ্ছ্রতা ও স্বার্থত্যাগ এবং উন্নয়নের মধ্যে যে কার্যকরণ সম্পর্ক তা জনগণের কাছে ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব শুধু সরকারের নয় ।

আলোচিত প্রবন্ধে এ সব বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত হয়নি । সেদিক থেকে প্রবন্ধটি আমাদের কাঙ্খিত মাত্রায় পৌছতে পারেনি । এর মধ্যে, কেউ বলতে পারেন, প্রচুর আদর্শগত কচকচি আছে । নিশ্চিতভাবে আমরা আরও বেশী বাস্তবতা ও প্রায়োগিক দৃষ্টিভঙ্গী এ প্রবন্ধে আশা করেছিলাম ।

DEVELOPMENT STRATEGY FOR NORTH-WEST BANGLADESH

বাংলাদেশে পল্লী উন্নয়ন কৌশল ও দারিদ্র্য নিরসন

এম, এ হামিদ *

১ পটভূমি

দারিদ্র্য নিরসনই পল্লী উন্নয়নের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। এ ব্যাপারে পল্লী অর্থনীতিবিদদের মধ্যে কোন দ্বিমত না থাকলেও এই উদ্দেশ্য অর্জনের কৌশল প্রণয়নের ক্ষেত্রে তাঁদের মধ্যে মত-পার্থক্য প্রচুর। বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে নানা রকমের (বিভিন্ন মাত্রার গুরূত্বসহ) কৌশল প্রয়োগ হয়েছে। কিন্তু দারিদ্র্য নিরসনের মাপকাঠিতে এদের চূড়ান্ত ফলাফল ঋণাত্বক বৈ ধনাত্বক হয়নি। প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় ঃ দারিদ্র্য সীমার নীচে (২২৭৩ ক্যালোরী) বসবাসকারী পল্লী পরিবারের সংখ্যা ১৯৬২-৬৩ সালে ৫৩% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৭৫-৭৬ সালে ৫৯% এবং ১৯৮৪-৮৫ সালে ৬৪%। ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা ১৯৫০ সালে ১৭.২% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৮৪-৮৫ সালে ৫৬.৫%, পরিবার পিছু আবাদকৃত জমির পরিমাণ ১৯৭৭ সালে ১.৪২ হেক্টর থেকে হ্রাস পেয়ে ১৯৮৩-৮৪ সালে ০.৯৩ হেক্টর এবং ০.৬০ হেক্টর (১.৫ একর) জমি আবাদকারী পরিবারের সংখ্যা ১৯৬০ সালে ৩৩% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৮২ সালে ৪৮.৭ এ দাঁড়ায়। অধিকন্তু, ১৯৮৩-৮৪ সালে কৃষিতে প্রকৃত মজুরী ১৯৬৩-৬৪ সালের তুলনায় ছিল মাত্র ৬৪% [১০,১১]।

বাংলাদেশের পল্লী অর্থনীতির ক্রমবর্ধমান অবনতির এই চিত্র আজ অনেককেই ভাবাতে শুরু করেছে। পল্লী উন্নয়নে অনুসৃত কৌশল সমূহের আপাতঃদৃশ্য গুণাবলী যতই আকর্ষণীয় হোক না কেন, হয়ত এদের মধ্যে কোথাও না কোথাও বিরাট গলদ রয়েছে যার জন্য পল্লীর অবস্থা আজ এত দূর্দশাগ্রস্ত। বাংলাদেশে পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে অনুসৃত কৌশলগুলো পর্যালোচনা করে এদের বিশেষ বিশেষ দুর্বলতা চিহ্নিত করা এবং দারিদ্র্য নিরসনের নিরিখে একটি বিকল্প কৌশলমালা রচনা করার প্রচেষ্টাই এই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য।

---

* অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

২ বর্ত্তমানে প্রচলিত কৌশল সমূহের মূল্যায়ন

২.১ উফশী প্রযুক্তি

এশিয়ার অনেক দেশের তুলনায়ই (বিশেষ করে জাপান ও কোরিয়া) বাংলাদেশের ভূমির উৎপাদনশীলতা অনেক কম। এ কারণেই অনুমিত হয় যে, উফশী প্রযুক্তি ব্যবহার করে যদি কৃষির উৎপাদনশীলতা বাড়ানো যায় তাহলে তা শুধু ভূমি মালিকদের আয়ই বৃদ্ধি করবে না বরং এর সাথে জড়িত সবার (যেমন বর্গাদার ও মজুর শ্রমিক) আয়ও বেড়ে যাবে। ভূমি মালিকদের বর্দ্ধিত আয় একদিকে যেমন কৃষিকে আরও আধুনিকীকরণ করতে সহায়ক হবে, অন্য দিকে কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প এবং কৃষি-সহায়ক শিল্পও গড়ে উঠবে। সার্বিক পল্লী উন্নয়নের ভিত্তি এখান থেকেই শুরু হওয়া সম্ভব। এ জন্যই উফশী প্রযুক্তি (অথবা বীজ-সার-সেচ প্রযুক্তি) পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হিসেবে বহুদিন থেকেই বাংলাদেশে বিবেচিত হয়ে আসছে।

এ প্রযুক্তির বহুল প্রচার ও ব্যবহার শুরু হয়েছে প্রায় দুই দশক আগে থেকে। উফশী বীজ, রাসায়নিক সার (ইউরিয়া, এম, পি ও টি, এস, পি) এবং বিভিন্ন ধরনের আধুনিক সেচ পদ্ধতি (গভীর নলকূপ, অগভীর নলকূপ, শক্তি চালিত পাম্প, অভিকর্ষ শক্তি চালিত পাম্প ইত্যাদি) ব্যবহৃত হচ্ছে এখন যত্রতত্র। ১৯৮৪-৮৫ সাল নাগাদ প্রায় ৬০ লাখ একর জমি এই কৌশলের মাধ্যমে চাষ হয়েছে। আলোচ্য প্রসংগে আমাদের প্রশ্ন ঃ পল্লী উন্নয়নের অর্থাৎ দারিদ্র্য নিরসনের ক্ষেত্রে এই কৌশল কতখানি কার্যকর ?

এ প্রসংগে গবেষণালব্ধ ফলাফল পাওয়া যায় অনেক। তবে এগুলো মোটামুটি একই ধরনের ; পার্থক্য মাত্রাগত, প্রকারগত নয়। এই কৌশল কৃষি উৎপাদনশীলতার ওপর দর্শনযোগ্য প্রভাব রেখেছে। চাষের ধরনের আমূল পরিবর্তন হয়েছে (দেশী শস্যের পরিবর্তে উফশী ফসল কিংবা পতিত জমিতে বাড়তি ফসল আবাদ হচ্ছে)। চাষের নিবিড়তা উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়ে গেছে। সেচ বর্হিভূত জমিতে যেখানে চাষের তীব্রতা মাত্র ১২০% সেচ এলাকায় তা ১৬০% থেকে ১৬৪% [১৭]। হেক্টর প্রতি ফলনও সেচ এলাকায় অনেক বেশী। উফশী বোরো ধানের ফলন যেখানে প্রতি হেক্টরে ২.৭৮ টন, দেশী বোরোর ক্ষেত্রে তা মাত্র ১.৫০ টন। এই প্রযুক্তিতে অন্যান্য প্রভাবের মধ্যে অধিকতর কর্মসংস্থান সৃষ্টিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সেচ এলাকার জমিতে শ্রমের ব্যবহার অসেচ এলাকার তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। নিম্নে দারিদ্র্য নিরসনে এই কৌশলটির ভূমিকা সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো।

প্রথমেই যে বিষয়টি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হলো সেচ এলাকা সম্প্রসারণে অগ্রগতি। বিশ্ব ব্যাংকের মতে নৌ পরিবহন, মাছ চাষ, অন্যান্য পানির ব্যবহার নিশ্চিত করেও বাংলাদেশের মোট আবাদি জমির প্রায় ৬২% জমিতে সেচ দেয়া সম্ভব, কিন্তু ১৯৮৪-৮৫ সাল নাগাদ বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক এবং প্রযুক্তিগত কারণে এর পরিমাণ দাঁড়ায় মাত্র ২৬% [১৩]। এটিকে সর্বোচ্চ সীমা হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে; কারণ, যে জমি পরিপূরক সেচের আওতায় আনা হয় বা কোন কোন সময় যদি বৃষ্টির পানিতেও সেচের কাজ হয়ে যায়, সে জমিও বাংলাদেশে সেচ এলাকা হিসেবে গণ্য করা

হয় । আলোচনার খাতিরে যদি ধরেও নেওয়া হয় যে দেশের এক-চতুর্থাংশ জমিতে সেচ দেয়া হচ্ছে, তবুও প্রশ্ন থেকে যায়, যারা সুবিধা পাচ্ছেন তাঁরা কারা ? এতে কি দারিদ্র্য নিরসন হচ্ছে ?

এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে এর সুবিধা পাচ্ছেন প্রাথমিকভাবে যাঁরা জমির মালিক তাঁরাই । এই বর্দ্ধিত আয় পল্লী উন্নয়নে কতটুকু সহায়ক হবে তা নির্ভর করবে ঐ আয় খরচের প্রকৃতির ওপর । এক সমীক্ষায় দেখা যায় সেচ থেকে প্রাপ্ত আয়ের সিংহভাগই খরচ হয় মাত্র দু'টো খাতে, ভোগ (৩২%) এবং জমি ক্রয় (৩১%)। কৃষি যন্ত্রপাতির জন্য ব্যয় হয় মাত্র ২% । বাকী অর্থ ব্যয় হয় শিক্ষা, ব্যবসা, চিকিৎসা, ইত্যাদি খাতে । এখানে আরও উল্লেখ প্রয়োজন যে যাঁরা জমি ক্রয় করেন, তাঁদের প্রায় সবই বড় কৃষক; পক্ষান্তরে যাঁরা ভোগের জন্যে ব্যয় করেন, তাঁদের অধিকাংশই ক্ষুদে কৃষক [১৭;৯৯] । অন্য একটি সমীক্ষায় দেখা যায় যে সমস্ত ধনবান কৃষক তাঁদের নগদ টাকা শিল্প স্থাপনের (বিশেষ করে ওয়ার্কশপ স্থাপনে) জন্যে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী ছিলেন, তাঁরা তা বাস্তবায়ন করতে সমর্থ হননি প্রধানতঃ দুটো কারণেঃ এক, তাঁদের প্রযুক্তিগত জ্ঞান একেবারেই সীমিত, এবং দুই, নেতৃত্বদানকারী সংস্থার (বি,এ,ডি,সি) উদাসীনতা এবং অদক্ষতা [১৮] । মূলতঃ এ দুটো কারণেই কৃষি ও অকৃষি খাতের মধ্যে সংযোগ স্থাপন সম্ভব হয়ে উঠছে না । তাই বাধ্য হয়েই তাঁরা তাঁদের অর্থ জমি কেনার কাজে ব্যবহার করছেন । বলা বাহুল্য, অতি সম্প্রতি এ ব্যাপারে কিছু সংস্কার নীতি (পরে আলোচিত হয়েছে) ঘোষিত হলেও, ক্ষুদে কৃষকদের জমি বিক্রয়ের হাত থেকে বাঁচানোর কোন কার্যকরী আইন প্রণীত হয়নি । যারা জমি বিক্রি করতে বাধ্য হন তাদের সমস্যার মূল কারণগুলোও কি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা হচ্ছে ? মনে হয় না । এক প্রবন্ধে দেখানো হয়েছে যে, এর মূল কারণ গুলোর মধ্যে রয়েছে বিপদের সময় মহাজনদের নিকট ঋণ গ্রহণ এবং তার জন্যে অবিশ্বাস্য হারে সুদ প্রদান । ভোগ ও পূর্ব ঋণ পরিশোধের জন্যেও লোকজন ঋণ গ্রহণ করতে বাধ্য হয় তাও সর্বজনবিদিত [১৫] । অধিকন্তু; এই বর্দ্ধিত আয়ের একটা অংশ কৃষি করের মাধ্যমে আদায় করে তা পল্লী উন্নয়নের জন্যে ব্যয় করার নীতিও আজ পর্যন্ত সাফল্যের মুখ দেখতে পারেনি ।

উফশী প্রযুক্তির সুবিধা শুধুমাত্র জমির মালিকরাই পাচ্ছেন, এটা সম্পূর্ণ সত্য নয় । বর্গাচাষী এবং মজুর শ্রমিকরাও এ সুবিধার অংশীদার হবার কথা । এটা সম্পূর্ণ সত্য হলে আলোচ্য কৌশলটি পল্লী উন্নয়নের সহায়ক হতে পারে ।

মাঠ তথ্য থেকে জানা যায় যে, আজও বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় আধা-আধি অংশের ভিত্তিতে বর্গাদারী প্রথা প্রচলিত রয়েছে । অনেক পল্লী গবেষকই দাবী করেছেন বর্গাদার সমস্ত খরচ বহন করে অর্ধেক ফসল মালিককে দিলে তাদের অংশের অনুপাত দাঁড়ায় ২২% (বর্গাদার) ঃ ৭৮% (মালিক)। অন্য একটি গবেষণায় দেখা যায়, যদি বর্গদারদের পারিবারিক শ্রমের যোজিত মূল্য ধরা হয় তাহলে অনেক ফসলের ক্ষেত্রেই (১৯টি ফসলের মধ্যে ১০টিতে) বর্গাদারের নীট আয় হয় ঋণাত্বক [১৯ ; ১৬৪] । এই যদি বাস্তব অবস্থা হয়, তবে বর্গাদারেরা উফশী প্রযুক্তির মাধ্যমে তাদের দারিদ্র্যর হাত থেকে মুক্তি পাচ্ছেন, সে আশা অসার হয়ে যায় । ঐ সীমিত এলাকায় মজুর শ্রমিকদের অন্ততঃ একটি মৌসুমে কিছু বাড়তি কাজের সংস্থান হয়েছে নিঃসন্দেহে । সেচ এলাকায়

শ্রমিকদের বর্ধিত চাহিদার জন্যে তারা কিছুটা বাড়তি মজুরিও পেয়েছে, কিন্তু তাকে কি অন্ততঃ "সর্বনিম্ন" মজুরী বলা যায় ? একটি গবেষণা রিপোর্টে দেখানো হয়েছে যে, ঐ সময় শ্রমিকেরা মোটামুটি দৈনিক ১৬ টাকা হারে (খাবার মূল্য ধরে নিয়ে, যদি থাকে) মজুরি পেয়েছে [১৮ ; ১২৭] । তখন (১৯৮১-৮২) ঐ এলাকার চালের খুচরা মূল্য ছিল সের প্রতি টাকা ৫.৭৮ । এই হিসেবে তাদের সর্বনিম্ন মজুরি হবার কথা টাকা ২০.২৫ । তাহলে প্রকৃত মজুরি দাঁড়ায় প্রায় ২০% কম । সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, বর্তমানের আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে সেচের সুবিধা জমির মালিকদের মাধ্যমে চুঁইয়ে অতি সামান্যই বর্গাদার বা মজুর শ্রমিকদের হাতে পৌছাচ্ছে।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে নিঃসন্দেহে বলা যায় দারিদ্র্য নিরসনের মাপকাঠিতে পল্লী উন্নয়নের জন্যে উফশী প্রযুক্তির ব্যবহার একটি আবশ্যিক শর্ত হতে পারে, কিন্তু পর্যাপ্ত শর্ত নয় ।

২.২ উৎসাহব্যঞ্জক মূল্য

সরাসরি উৎপাদন বাড়ানোর ক্ষেত্রে এটি আর একটি কৌশল । এই কৌশলটি প্রণয়নের পেছনে যে যুক্তিটি কাজ করে তা'হলো ঃ কৃষকেরা তাদের বাজারজাতকৃত মোট ফসলের সিংহভাগই বিভিন্ন কারণে ধানকাটা মৌসুমের পরপরই বিক্রি করে দেয় । এ সময় তুলনামূলকভাবে ফসলের দাম অনেক কম থাকে বিধায় তারা বাড়তি উৎপাদন বৃদ্ধির উৎসাহ হারিয়ে ফেলে । তাই মনে করা হয় যে যদি তাদেরকে ঐ সময় বিক্রীত ফসলের ন্যায্য মূল্য দেওয়া হয়, তা'হলে তারা বাড়তি উৎপাদন করার চেষ্টা করবে এবং দারিদ্র্য নিরসনের পথ সুগম হবে । খাদ্য সংগ্রহ নীতি কর্মসূচীর মাধ্যমে এই কৌশলটি বাস্তবায়ন করা হয় । উহা সংগ্রহ কালে কৃষকদের চলতি বাজার মূল্যের চাইতে অতিরিক্ত দাম (উৎসাহব্যঞ্জক মূল্য) দেবার কথা । এর মাধ্যমে মূল্য স্থিতিশীল হবে বলেও আশা করা হয় ।

উৎসাহব্যঞ্জক মূল্য কৌশলটি পঞ্চাশ দশকের শেষার্ধ থেকেই এদেশে (তখনকার পূর্ব পাকিস্তান) প্রচলিত আছে । আগে শুধু ধান / চাল সংগ্রহ করা হত, এখন গমও এর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে । এই ক্ষেত্রে আরও একটি পরিবর্তন এসেছে, তা হলো বাধ্যতামূলক সংগ্রহের পরিবর্তে স্বেচ্ছাধীন প্রথার প্রচলন । এই খাদ্য সংগ্রহ কর্মসূচীর মাধ্যমে উৎসাহব্যঞ্জক মূল্য কৌশলটি পল্লী উন্নয়নের (বিশেষ করে দারিদ্র্য নিরসনে) জন্যে কতটুকু ভূমিকা পালন করছে, তা নিম্নের আলোচনা থেকে অনুমান করা যাবে ।

(ক) এই কর্মসূচীর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অনুযায়ী সংগ্রহমূল্য অবশ্যই বাজার মূল্যের বেশী হতে হবে; তা না হলে সেটিকে উৎসাহব্যঞ্জক মূল্য হিসেবে গণ্য করা যায় না । কালীন-সারির তথ্য বিশ্লেষণ করে ইসলাম দেখিয়েছেন যে ১৯৫৯-৬০ থেকে ১৯৭৫-৭৬ সময়ের মধ্যে একমাত্র ১৯৭৫-৭৬ সাল বাদে (সে বছরে সংগ্রহ মূল্য বাজার মূল্যের চাইতে ৩% বেশী ছিল) কোন বছরেই সংগ্রহ মূল্য বাজার মূল্যের চাইতে বেশী ছিল না [২৩] । অন্যান্য বছরে সংগ্রহ মূল্য ও বাজার মূল্যের অনুপাত ০.৫৮(১৯৭৪-৭৫) থেকে ০.৮৭(১৯৬২-৬৩) এর মধ্যে উঠানামা করেছে । তৃতীয় পরিকল্পনায় প্রদত্ত তথ্যে দেখা যায় যে উক্ত অনুপাত ১৯৭৯-৮০ সালে ০.৬৮ থেকে বেড়ে ১৯৮১-৮২ সালে ০.৮৯ এ

উন্নীত হয় [১০;১৫১] । কিন্তু পরবর্তী বছর গুলোতে তা ক্রমাগত হ্রাস পেয়ে ১৯৮৪-৮৫ সালে ০.৬৫ এ দাঁড়ায় । তা'হলে প্রমাণিত হলো যে, কোন মানেই প্রাপ্ত সংগ্রহ মূল্যকে উৎসাহব্যঞ্জক মূল্য বলে অভিহিত করা যায় না ।

(খ) এর পরেও প্রশ্ন রয়েছে, কৃষি উৎপাদন সত্যিকার অর্থেই কি মূল্যসুবেদী (price sensitive) ? উত্তর নির্ভর করবে উৎপাদন মূল্য স্থিতিস্থাপকতা পরিমানের ওপর । একটি অর্থনৈতিক গবেষণায় দেখা যায় বাংলাদেশে কৃষি উৎপাদন মূল্য স্থিতিস্থাপকতা মোটামোটি ০.১৩ থেকে ০.১৮ এর মধ্যে সীমিত [২] ।যদি এই পরিমাপ গ্রহনযোগ্য হয় তা'হলে এর তাৎপর্য হলো যে, ১% উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে ১০% মূল্য কমাতে হবে । আবার আমরা যদি সংগ্রহ মূল্য স্থিতিস্থাপকতা একক বলে ধরে নেই তা'হলে প্রতি ১% সংগ্রহ-পরিমান বৃদ্ধির জন্যে ১% মূল্য বৃদ্ধির প্রয়োজন হয় [৬] । সোজা কথায় উৎসাহব্যঞ্জক মূল্যের মাধ্যমে (অন্ততঃ যতটুকু অভিজ্ঞতা পাওয়া যায় তার ভিত্তিতে) কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করে পল্লী উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা হবে, সে আশা দূরাশা ছাড়া কিছুই নয় ।

(গ) আবার, সংগ্রহ মূল্য বাজার মূল্যের ওপর কতখানি প্রভাব বিস্তার করে তা অবশ্য অন্যান্য শর্ত অপরিবর্তিত থাকা সাপেক্ষে নির্ভর করবে সংগ্রহ পরিমাণের উপর । পরিকল্পনা কমিশন মনে করেন এ পরিমাণটি অন্ততঃ ১.৫ মিলিয়ন টন হওয়া উচিত (১৯৮৫ সালের অবস্থায়) [১০ ; ১৫২] । প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, এই পরিমাণ শস্য কোন বছরেই সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি । একমাত্র ১৯৮১-৮২ সালে প্রচুর শস্য উৎপাদন এবং মোটামুটি ভাল সংগ্রহ মূল্যের (অনুপাতটি ছিল ০.৮২) কারণে এই সংগ্রহের পরিমাণ ১.২ মিলিয়ন টনে উপনীত হয়েছিল । অন্যদিকে বাংলাদেশের মোট উৎপাদনের মোটামুটি ২৯% বাজার জাত হয় [২] । এই হিসাব মোতাবেক ১৯৮৪-৮৫ সালের (উদাহরণ স্বরূপ) মোট ১৬ মিলিয়ন টন খাদ্যশস্য উৎপাদনের মধ্যে ৪.৬ মিলিয়ন টন বাজার জাত হয়েছিল । দ্বিতীয় পরিকল্পনা নাগাদ গড়ে ০.৪ মিলিয়ন টন খাদ্য শস্য সংগৃহীত হয়েছিল, যা মোট বাজারজাতকৃত খাদ্য শস্যের মাত্র ৮.৭%। এই পরিমান সংগ্রহীত খাদ্য শস্য বাজার মূল্যের উপর কতখানি কার্যকরী প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে তা সহজেই অনুমেয় ।

(ঘ) পরিশেষে, এই উৎসাহব্যঞ্জক মূল্যের সুবিধা (যদি হয়ে থাকে) প্রকৃত পক্ষে কারা ভোগ করছে সেটাও জানা দরকার । প্রথমেই দেখা যাক শস্য বিক্রি করে কারা ? স্বভাবতঃই এর উত্তর হবে, যাদের অতিরিক্ত ফসল উৎপাদিত হয়, মূলতঃ তারাই ; কেবল তাদের পক্ষেই বেশী পরিমাণ শস্য দূরের রাস্তায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব । কিন্তু আসলে এই কৃষকেরাই কি সংগ্রহ কেন্দ্রে ফসল বিক্রি করে ? মাট তথ্য থেকে জানা যায় যে মাত্র ৭% থেকে ২২% ধান/চাল সরাসরি কৃষকেরা বিক্রি করে, বাকী গুলো যোগান দেয় ব্যবসায়ীরা [২৩;৯৬] । অতি সম্প্রতি পরিচালিত অন্য একটি গবেষণায় দেখা যায় যে কৃষকদের কাছ থেকে এখন ধান/চাল সরাসরি কেনা হয় না বললেই চলে । তাহলে বুঝা যাচ্ছে, এই সংগ্রহ কর্মসূচীর মাধ্যমে যদি কোন সুবিধা হয়ে থাকে তার গ্রহীতারা হচ্ছেন মূলতঃ দালাল ও ফড়িয়ারা ।

উপরোক্ত আলোচনা থেকেই এটাই প্রতীয়মান হয় যে, উৎসাহব্যঞ্জক মূল্য

উৎপাদনের ওপর কোন অর্থপূর্ণ প্রভাব রাখতে সমর্থ হয়নি । তাহলে, আমরা প্রশ্ন করতে পারি, একে কি সত্যিকার অর্থেই পল্লী উন্নয়নের কৌশল হিসেবে পরিগণিত করা যায় ?

২.৩ কর্মসংস্থান সৃষ্টি

অর্থনীতির ইতিহাসে উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে কর্মসংস্থান সৃষ্টি সব সময়ই সমান গুরুত্ব পেয়ে আসছে । তবে আলোচ্য প্রসংগে এই কর্মসংস্থান সৃষ্টি একটু ভিন্ন প্রকৃতির । পল্লীর জনগণ, বিশেষ করে যারা ভূমিহীন অথচ জীবন ধারণের জন্যে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ ভাবে ভূমির উপর নির্ভরশীল, কৃষির আবর্তক মৌসুমের কারণে তারা প্রতি বছর একটি বিশেষ সময়ে (সাধারণতঃ শুষ্ক মৌসুমে) বেকার থাকতে বাধ্য হয় এবং দুঃখ কষ্টে দিন কাটায় । এ কারণেই পরিকল্পনাবিদরা কর্মসংস্থানকে একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হিসেবে বরাবরই চিহ্নিত করে আসছেন । অবশ্য ইদানীং কালে ঐ কৌশলটার গুণগত মান বৃদ্ধি কল্পে এর পূর্বে বিভিন্ন ধরনের শব্দ যোগ করা হচ্ছে, যেমন "লাভজনক" "উৎপাদনশীল", ইত্যাদি ।

পল্লী উন্নয়নের এই কৌশলটি বাংলাদেশে বিভিন্ন পূর্ত কর্মসূচীর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয় । সত্যিকার অর্থে এ দেশে পল্লী পূর্ত কর্মসূচীটি কুমিল্লার কোতওয়ালী থানায় সামাজিক গবেষণাগারের পল্লী গবেষণারই ফসল । এর মূল উদ্দেশ্য দুটো ঃ (এক) কৃষি ও যাতায়াতের ক্ষেত্রে ভৌত কাঠামো নির্মাণ এবং (দুই) যখন মাঠে কাজ থাকে না তখন কিছু কর্মসংস্থান সৃষ্টি । ১৯৭৪ সালে দেশে যখন দুর্ভিক্ষাবস্থা বিরাজ করছিল, তখন আরও একটি সহযোগী কর্মসূচী— "কাজের বিনিময়ে খাদ্য"— চালু করা হয় । পরবর্তী পর্যায়ে অবশ্য এই শেষোক্ত কর্মসূচীটি প্রথমটির চাইতে বেশী গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে । আমরা এখন দারিদ্র্য নিরসনের নিরিখে পল্লী উন্নয়নে এই কৌশলটির ভূমিকা নিয়ে দু'চারটা বক্তব্য রাখবো ।

এই কৌশলটির একটি দুর্বল দিক হলো যে এর সুবিধা শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট এবং সংক্ষিপ্ত সময়ের মৌসুমের জন্যে প্রযোজ্য । বৃষ্টি-বাদলের সময়েও যে ভূমিহীন কৃষকেরা বেকার থেকে আধপেট খেয়ে বা না খেয়ে থাকতে পারে, সে ব্যাপারে এই কর্মসূচীর কোন বিবেচনা নেই । এখন প্রশ্ন, এই নির্দিষ্ট মৌসুমে কৌশলটি কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে পল্লী উন্নয়নে কতখানি সাহায্য করে ? আলমগীর দেখিয়েছেন যে পল্লী পূর্ত কর্মসূচীর মাধ্যমে ১৯৬২-৬৩ থেকে ১৯৭০-৭১ সাল পর্যন্ত গড়ে প্রতি বছরে ৩৪.০৪ মিলিয়ন শ্রমদিবস সৃষ্টি করে এবং তা ১৯৭১-৭২ থেকে ১৯৭৬-৭৭ সালে হ্রাস পেয়ে ১৪.০৩ মিলিয়ন এ দাঁড়ায় [৩;১২২] । তিনি দেখান যে এই কর্মসূচীর মাধ্যমে প্রাপ্ত শ্রম দিবস দেশের মোট শ্রম দিবসের শতকরা এক ভাগও হয় না । পরবর্তী পর্যায়ে অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে । কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর মাধ্যমে দ্বিতীয় পরিকল্পনা সময় কালে প্রায় ১,১৫৬ মিলিয়ন শ্রম দিবসের সৃষ্টি হয় এবং পূর্ত কর্মসূচীর ৩৪.০০ মিলিয়ন সহ সর্বমোট শ্রম দিবস দাঁড়ায় ১,১৯০ মিলিয়ন [১০] । এই হিসাব যথাযথ সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে । কারণ, এই পরিমাণের প্রতিদিনের জন্য ২ সের গম ধরা হয়েছে । এ থেকে যে একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ গম (কম পক্ষে ২৫%) নষ্ট, অপচয়

কিংবা চুরি হয় তা বিবেচনায় আনা হয়নি । পরিকল্পনা কমিশনের উক্ত হিসাব ব্যবহার করলেও দেখানো যায় যে, বাংলাদেশের মোট প্রাপ্ত শ্রম দিবসের (মোট জন সংখ্যা ঃ ৯৫.৫ মিলিয়ন ১৯৮২-৮৩ সালে, মধ্যম বছর, অসামরিক শ্রম ৩১.২৫% ঃ অর্থাৎ মোট সংখ্যা = ২৯.৮৪ মিলিয়ন) অর্থাৎ ২৯.৮৪ মিলিয়ন × ৩০০ দিন = ৮,৯৫৩ মিলিয়ন শ্রম দিবসের মাত্র ২.৬% হয় ।

উপরিলিখিত দিকটি ছাড়াও সর্বশেষ হিসাবটির আরও একটি দুর্বল দিক রয়েছে । ঐ ২.৬% কর্মসংস্থান একেবার্র নতুন, সে কথা বলা ঠিক হবে না । কারণ, যেহেতু এই কর্মসূচীতে মজুরীর হার বেশী, সেহেতু মজুর শ্রমিকেরা তাদের নিজস্ব তুলনামূলক ভাবে কম উৎপাদনশীল কাজ ছেড়ে দিয়ে এই কাজে যোগদান করে । আহমেদ ও হোসেন তাঁদের প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে প্রায় ৪৫% শ্রমিক এ ধরনের স্ব-নিয়োজিত শ্রম ছেড়ে উক্ত কর্মসূচীতে কাজ করেছে [১] । এতে অন্যান্যদের তুলনায় আয় বেড়েছে শতকরা ১০ থেকে ১১ ভাগ। অধিকন্তু, উল্লেখিত প্রবন্ধে আরও বলা হয়েছে যে মজুরীর হার বেশী হবার দরুন অন্যান্য ভাড়াকারী কৃষকেরা শ্রম ভাড়া নেয়া কমিয়ে দিয়েছেন । তাঁদের সমীক্ষা অনুযায়ী প্রায় ১৮% কৃষক এমনটি করেছেন বলে স্বীকার করেছেন ।

এই সমস্ত কর্মসূচীর দ্বারা যে ধরনের কাজ করা হয় তার মধ্যে রয়েছে রাস্তা ঘাট নির্মাণ, কালভার্ট নির্মাণ, ডোবা-পুকুর খনন বা সংস্কার, ইত্যাদি । সংগৃহীত তথ্য থেকে জানা যায় যে, বিভিন্ন নীতি বহির্ভূত কাজের জন্যে (যেমন কোন কাজ না করেই একই স্থানে পুকুর খনন ও মাটি ভরাট করে রাস্তা তৈরী) এবং বিশেষ করে সম্পাদিত কাজের সাথে পল্লী উন্নয়নের সার্বিক কর্মকাণ্ডের কোন কার্যকর সংযোগ না থাকায়, পল্লী উন্নয়নের উপর এর প্রভাব একেবারেই দুর্বল । যেটুকু সুবিধাও বা হয়, তার সবটুকু জমির মালিকরা বা বিত্তবান লোকেরাই ভোগ করে ।

অতএব পল্লী পূর্ত কর্মসূচী ও কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী গুলোর প্রসংগে সংঘটিত নীতি বহির্ভূত কাজের সম্প্রসারণের কথা বাদ দিলেও দারিদ্র্য নিরসনে এগুলোর ভূমিকা একেবারেই নগন্য ।

২.৪ প্রাতিষ্ঠানিক পল্লী ঋণ যোগান

পল্লী উন্নয়নে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের গুরুত্ব অপরিসীম, এই ধরনের ঋণ পল্লীর জনগণের শুধু যে স্থানীয় মহাজনদের আকাশ চুম্বি সূদের হার থেকেই রেহাই দেয় না বরং তাদেরকে নগদ টাকার যোগান দিয়ে উফশী প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করে, কৃষি ফসল বাড়াতেও সাহায্য করে । ঋণ এমন এক শক্তিশালী উপকরণ যা এর ব্যবহারকারীদের আয় বাড়াতে এবং এমনকি সম্পদের মালিক হতেও সাহায্য করে । ঠিক এরূপ চিন্তা ধারাই বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণপ্রদান ব্যবস্থা সম্প্রসারণ করছে ।

পঞ্চাশ দশকের দিকে যেখানে মোট পল্লী ঋণের শতকরা ৫ ভাগও প্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে পাওয়া যেত না, সেখানে বর্তমানে প্রায় শকতরা ১৫/২০ ভাগে দাঁড়িয়েছে । মূলতঃ চারটি প্রাতিষ্ঠানের মাধ্যমে পল্লী ঋণ বিতরণ করা হচ্ছে, যথাঃ (ক) বাংলাদেশ ব্যাংক, (খ) রাষ্ট্রয়াত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংক, (গ) বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক এবং (ঘ) বি, আর, ডি,

বি । পল্লী ঋণের পরিমাণ বেশ দ্রুত গতিতে বেড়েছে । ১৯৭২-৭৩ সালে যেখানে মাত্র টাকা ৩২.১৫ কোটি বিতরণ করা হয়, তা ক্রমশঃ বেড়ে ১৯৭৯-৮০ সালে ২৮২.০৯ কোটি টাকা এবং ১৯৮৪-৮৫ সালে ১১৪৯.৮৪ কোটি টাকায় দাঁড়ায় । এর মধ্যে কৃষি ব্যাংকের অংশ ৫৩% ভাগ (১৯৮৪-৮৫ সালে)। এই রূপ বর্দ্ধিত হারে পল্লী ঋণ বিতরণ দারিদ্র্য নিরসনে কতখানি কার্যকর প্রভাব রাখছে তা অবশ্যই মূল্যায়নের দাবী রাখে।

প্রথমতঃ এই প্রাতিষ্ঠানিক উৎস পল্লী জনগণের মোট চাহিদার কত অংশ পূরণ করছে ? ঋণের চাহিদার সঠিক হিসাব সহজ নয় । তবে আলোচনার জন্যে একটি অতি সরলীকরণ মডেল বিবেচনা করা যায় । বাংলাদেশে মোট ৯.১৭ মিলিয়ন হেক্টর আবাদি জমি রয়েছে । প্রতি হেক্টরে যদি টাকা ৫,০০০ (একরে প্রায় ২,০০০ টাকা) ঋণের চাহিদা ধরি, তা হলে মোট পরিমাণ দাঁড়ায় টাকা ৪৫,৮৫০ মিলিয়ন । এই হিসেবে ১৯৮৪-৮৫ সালে বিতরণকৃত ঋণ মোট চাহিদার মাত্র এক-চতুর্থাংশ। তৃতীয় পরিকল্পনা দলিলে ১৯৮৪-৮৫ সালে ১,১৩১ কোটি টাকার ঋণ বিতরণের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে ঋণের অংক এত মোটা হওয়া সত্ত্বেও এই পরিমাণ মোট কৃষি উৎপাদনের যোজিত মূল্যের ৭.৪% অংশ মাত্র [১০;১৩৩] । আসলেই ঋণের এই পরিমাণ দেখে এই কৌশলের যথার্থতা বিচার করা যুক্তি সংগত হবে না । এর আসল মানদণ্ড হওয়া উচিত— ঋণ কিভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, কি ধরনের গ্রহীতা ঋণ ব্যবহার করেছে এবং কত অংশ ঋণ পরিশোধিত হচ্ছে।

শেষোক্ত মানদণ্ডটিই প্রথমে বিবেচনা করা যাক । সত্যিকার অর্থে বিতরণকৃত ঋণ যদি পরিশোধিত না হয় তাহলে সেই ঋণ বিতরণ এবং ব্যবহারের মধ্যে যেমন দুর্বলতা থাকার সম্ভাবনা থাকে, ঠিক তেমনি অন্যদিকে ঋণলগ্নী প্রতিষ্ঠানগুলোও নিজের পায়ে দাঁড়াতে না পেরে হয় দেউলিয়া হয়ে যায় কিংবা অতি মাত্রায় সরকারের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে । ইউনুস ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত বিতরণকৃত ঋণ ও পরিশোধিত ঋণের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন বিভিন্ন বছরে পরিশোধের হারের তারতম্য থাকলেও গড়ে ৬৫% ঋণ আদায় হয়েছে [২৫;২৬৮] । বি.বি.এস এর ১৯৮২ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী এই পরিশোধের হার ১৯৭৮-৭৯ সালের ৬৮.৬% থেকে ক্রমাগত কমে ১৯৮২-৮৩ সালে ৪৯.৭% হয় [৮] । তৃতীয় পরিকল্পনায় বলা হয়েছে মোট বকেয়া ঋণের পরিশোধিত হার ১৯৮০-৮১ সালে ৩৬% থেকে হ্রাস পেয়ে ১৯৮৪-৮৫ সালে ২১% এ দাঁড়িয়েছে [১০;১৩৩] । কিন্তু এই পরিশোধিত হারের মধ্যেও শুভঙ্করের ফাঁকি রয়েছে । মাঠ তথ্য থেকে জানা যায় যে উপরের চাপে কিংবা স্বীয় অবস্থান দৃঢ় করার লক্ষ্যে ঋণ লগ্নী প্রতিষ্ঠানসমূহ অন্ততঃ দুটো পদ্ধতিতে আরও খারাপ পরিশোধের হার গোপন রাখার চেষ্টা করে । এক, "পেপার ট্রানজাক্সন" এর মাধ্যমে সুদসহ পুরাতন ঋণের সমপরিমাণ (কোন কোন সময় বেশী পরিমাণও) অর্থ বরাদ্দ করে নতুন ঋণ হিসেবে দেখানো হয় এবং দুই, ঋণ পরিশোধের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও বহুদিন ধরে তা বকেয়া খাতায় না তুলে চলতি ঋণ হিসেবেই দেখানো হয় । শওকত আলী তাঁর এক নিবন্ধে দেখিয়েছেন যে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি ও বিতরণকৃত পল্লী-ঋণের সাথে কোন সম্পর্ক নেই [৪] । তাঁর যুক্তির সপক্ষে তিনি দেখান যে, ১৯৭২ থেকে ১৯৮৫ সালের

মধ্যে যেখানে পল্লী ঋণ বিতরণের চক্র বৃদ্ধির হার ৩২%, সেখানে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির হার মাত্র ৩.৫% । উৎপাদনের সাথে যে ঋণের সম্পর্ক নেই কিংবা একেবারেই দুর্বল তা অন্য একটি সমীক্ষার ফলাফল থেকে নিশ্চিত হওয়া যায় । এটি একটি অর্থনৈতিক গবেষণা । গবেষক খাদ্য উৎপাদনকে নির্ভরশীল চলক এবং আধুনিক সেচের আওতার জমির পরিমাণ ও বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণকে স্বাধীন চলক হিসেবে নিয়ে একটি সমীকরণ পরিমাপ করেছেন । তাতে দেখা গেছে বিতরণকৃত ঋণের সহগ (যদিও ধনাত্বক) মাত্র ০.২০৩ এবং তাও পরিসংখ্যানগত দিক থেকে মোটেই নির্ভরযোগ্য নয় । তাই তিনি মন্তব্য করেন যে উৎপাদন ও ঋণের মধ্যকার সম্পর্ক একেবারেই দুর্বল [২২;৫] ।

যে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে, তার গ্রহীতা কারা ? এ প্রশ্নের উত্তরের জন্য আমরা বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংককে উদাহরণ হিসেবে ধরতে পারি । এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় ঃ (ক) ক্ষুদে কৃষকদের (যাদের জমি ০.৫ একর থেকে ২.৫ একর) মোট ঋণের অংশ ১৯৭৫-৭৬ সালে ৫৪.৭% থেকে হ্রাস পেয়ে ১৯৮১-৮২ সালে ৩২.১% হয়েছে, পক্ষান্তরে, বড় কৃষকদের (যাদের জমি ১২.৫১ একরের বেশী) অংশ একই সময়ে ৪.৬% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০.১% হয়েছে । (খ) ঋণ বন্টনের মধ্যেও চরম বৈষম্য বিদ্যমান: যেমন ১৯৮০-৮১ সালে নীচের ৫৬% কৃষক ৩২% ভাগ ঋণ পেয়েছে, পক্ষান্তরে, উপরের ১.৬% কৃষক ২০% ঋণ পেয়েছে [৭] । এই তথ্য অবশ্য বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের নিজস্ব। মাঠ তথ্য থেকে আরও বেশী বৈষম্যের চিত্র পাওয়া যায় ।

প্রাতিষ্ঠানিক পল্লী ঋণের ফলাফল সম্পর্কে উপরে যে তথ্যাদি পরিবেশিত হয়েছে তা থেকে সহজেই পল্লী উন্নয়নে ঋণের ভূমিকা সম্পর্কে সকলেই সন্দিহান হতে বাধ্য । কিন্তু এর জন্য দায়ী কে ? পল্লী ঋণ নিজেই না যারা তাকে ব্যবহার করে বা করায় তারা ? পল্লী গবেষকরা হয়তঃ তাঁদের অভিজ্ঞতা থেকে নানা ধরনের সমস্যার কথা বলবেন— যেমন, সময়মত, পরিমানমত ঋণ না দেয়া ; বহু প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ সংস্থা ; সুদের উচুঁ হার ; ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়া, অর্থ ফরৎ না দেবার মানসিকতা ; ইত্যাদি । কিন্ত আমি পাঠকদের শুধুমাত্র নিচের সমস্যার দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করব ।

প্রাতিষ্ঠানিক পল্লী ঋণ যে ভাবে পরিচালিত হচ্ছে তা দেখে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, এর মূল উদ্দেশ্য পল্লীর জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন না হয়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলই বেশী প্রাধান্য পাচ্ছে। জাতীয় নির্বাচনের পূর্বে বিশেষ ঋণ চালু করা কিংবা ঋণ আদায় স্থগিত করা কিংবা সুদ মওকুফ করা এমনকি সমস্ত বকেয়া ঋণ মওকুফ করা, ইত্যাদি পদক্ষেপ এরূপ চিন্তার খোরাক যোগায় । কোথায় কত টাকা কিংবা কোন কাজে কত টাকা ঋণ দিতে হবে তা আজও "ঢাকা" থেকে নির্দেশিত হচ্ছে। এই নির্দেশই মূলতঃ স্থানীয় ব্যাংক ম্যানেজারদের ব্যাংকের নিয়ম কানুন শিথিল করে অতিরিক্ত ঋণ বিতরণ করতে প্ররোচনা যোগায় কিংবা বাধ্য করে । গ্রামের ধনী, টাউট, জাতীয় রাজনীতির সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিরা নানান ছলে-বলে-কৌশলে ম্যানেজারদের থেকে বিশেষ সুবিধা আদায় করে । প্রদত্ত/প্রাপ্ত তথ্যে কিংবা প্রমাণ পত্রে বিভিন্ন কিসিমের গড়মিল বা অভাব থাকার জন্যে যে যন্ত্রটি ব্যবহার করা হয় তা সকলের পরিচিত, ঐ

"ঘুষ", যাকে আভিজাত্যের খোলস পড়িয়ে বলা হয় "পারসেনটেজ" । গত এক যুগের অভিজ্ঞতা থেকে দৃঢ় ভাবে বলতে চাই, এই ঘুষের উপর মূলতঃ নির্ভর করেই যেখানে যেখানে ঋণ দেয়া হয়েছে, সেই সব ঋণই আজও বাকী পড়ে আছে । এই ধরনের ঋণই মূলতঃ যে উদ্দেশ্যে দেয়া হয়, সেক্ষেত্রে ব্যবহাত না হয়ে অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহাত হয় । সেচের জন্যে অগভীর নলকূপ ঋণের মাধ্যমে নিয়ে তা দিয়ে নৌকা চালানো কিংবা ধান ভানার কাজে ব্যবহাত করা, গরু কেনার জন্যে ঋণ নিয়ে তা দিয়ে মেয়ের বিয়ে দেয়া, জমি কেনা কিংবা ব্যবসা করা ইত্যাদি তো আজ নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা । মৃত ব্যক্তির নামে ঋণ নেয়ার খবর কাগজে উঠলে লোকজন তা পড়তেও আর আগ্রহ প্রকাশ করে না ।

অতএব, প্রাতিষ্ঠানিক পল্লী ঋণকে উন্নয়নের কৌশল হিসেবে ব্যবহার করতে হলে মানুষের (ঋণ গ্রহীতা ও ঋণ দাতা) নৈতিকতার দিকটাও লক্ষ্য রাখতে হবে । তা না হলে অপচয়, অপকার ও দূর্নীতির সয়লাব বিরাজ করতে থাকবে তা থেকে পরিত্রানের কোনও উপায় থাকবে না ।

২.৫ সমবায় ঋণ

আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় সম্পদ একেবারেই অপ্রতুল । এই সীমিত সম্পদ যদি সমবায়ের নীতিতে ব্যবহার করা যায়, তাহলে সেই সম্পদের পূর্ণ এবং কার্যকরী ব্যবহার যেমন নিশ্চিত হবে, তেমনি ধনী-গরীবের মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্যও দূর করা সম্ভব হবে । এ ধরনের বিশ্বাসের ভিত্তিতেই বাংলাদেশে পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে "সমবায়" উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হিসেবে ব্যবহাত হচ্ছে।

এই অঞ্চলে (এখন বাংলাদেশ) সমবায় আন্দোলন ১৯০৪ সাল থেকে শুরু হলেও, ষাট দশকের গোড়ার দিকে কুমিল্লায় আখতার হামিদ খানের নেতৃত্বে যে দ্বি-স্তর বিশিষ্ট সমবায় গড়ে উঠেছিল আজকে বাংলাদেশে সেটিই বহুল প্রচলিত, সর্বাধিক গুরুত্বের দাবীদার । এই পদ্ধতি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নামে সাধারণ ভাবে পরিচিতি লাভ করেছে । প্রথম ছিল কুমিল্লা সমবায়, পরে সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচী এবং সর্বশেষে হয়েছে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড । এতে প্রথম স্তরে রয়েছে গ্রাম ভিত্তিক কৃষি সমবায় সমিতি (কে, এস, এস) এবং দ্বিতীয় স্তরে থানা ভিত্তিক (এখন উপজেলা ভিত্তিক) কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি । ১৯৬০ সালে মাত্র ৩টি থানা থেকে শুরু করে ১৯৮৪-৮৫ সাল নাগাদ সর্ব মোট ৪৪৮টি উপজেলা এই কর্মসূচীর আওতায় আনা হয়েছে । এই সময়ের মধ্যে প্রায় ২৩ লাখ সদস্য নিয়ে প্রায় ৬২ হাজার কৃষি সমবায় সমিতি গঠিত হয়েছে যাতে মূলধন রয়েছে প্রায় ৩২ কোটি টাকা । এর কৃষি ঋণের পরিমাণ ১৯৭৮-৭৯ সালে টাকা ১১.৭৯ কোটি থেকে বেড়ে ১৯৮২-৮৩ সালে টাকা ৪৮.৯৪ কোটি হয় । এই পাঁচ বছরে গড়ে কৃষি ঋণের পরিমাণ ছিল টাকা ২৮.২১ কোটি ।

পল্লী উন্নয়নের কৌশল হিসেবে বি,আর,ডি,বি এর ভূমিকা ইতিমধ্যে অনেকেই মূল্যায়ন করেছেন । ফলাফল মোটামুটি অভিন্ন। উদাহরণ হিসেবে মূল ফলাফল গুলো তুলে ধরা হলো ।

বি,আর,ডি,বি'র উপস্থিতি কুমিল্লা মডেলের বদনাম ছাড়া আর কিছুই নয় । কুমিল্লা মডেলের সব ক'টি অংশই (সমবায়, পল্লী পূর্ত কর্মসূচী, উপজেলা সেচ কর্মসূচী ও উপজেলা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্র) বাস্তবায়নের দায়িত্ব নিয়েই তৎকালীন "সমন্বিত" পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচীর জন্ম হয়েছিল । কিন্তু বাস্তবে এটা শুধুমাত্র একটি অংশ (সমবায়) নিয়েই নাড়াচাড়া করছে, ফলাফলও এ কারণেই অন্যান্য সমবায় আন্দোলনের চাইতে মোটেই ভিন্ন হয় নি । যেহেতু ঋণ প্রদান এর মূল দায়িত্ব তাই এ কাজে কৃষির উপর কিছুটা ভাল প্রভাব পড়া অস্বাভাবিক নয় । তবে প্রশ্ন উঠেছে যে এর মাধ্যমে সেই সমবায়ী চেতনা কিংবা 'ধনী-গরীব সবারই সমভাবে উন্নয়ন' ; তার কি হলো ? এক গবেষণায় দেখা যায় যে সবচাইতে পুরাতন দু'টো (৩টার মধ্যে) উপজেলায় যত সদস্য এই সমিতির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তাদের প্রায় সবাই বড় কৃষক [১৬] । তাদের আবাদি জমির পরিমাণ (৪.২০ একর) যা অসদস্যদের চাইতে ৪৭% বেশী । ভূমিহীন বা ক্ষুদে কৃষকদের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য । কার্যকরী সংসদের সবার জমিই গড় জমির চাইতে অনেক উপরে । তখনকার সময়ে কার্যকরী সংসদের একজন সদস্যের ঋণের পরিমাণ (টাকা ১,০৮২), যা একজন সাধারণ সদস্যের ঋণের প্রায় সাড়ে চার গুণ। অথচ টাকা পরিশোধ না করার ব্যাপারে এরাই অগ্রণী । এই ছবি দেখেই কেউ কেউ প্রতিষ্ঠানকে "বড় লোকের ক্লাব" বলে আখ্যায়িত করেছেন ।

ঋণ পরিশোধের দিক থেকে এই প্রতিষ্ঠানের অবস্থা অন্যের চাইতে খুব একটা ভাল নয় । ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত মোট ঋণের ৬৯% পরিশোধিত হয় [২৫] । পরবর্তী বছর গুলোয় এই পরিশোধের হার কিছুটা বেড়ে গেলেও ১৯৮২-৮৩ সালে আবার ৫৪% নেমে আসে। জন্মের পরে পাঁচ বছরের মধ্যে প্রতিটি কেন্দ্রীয় সমিতি নিজের পায়ে দাঁড়ানোর কথা থাকলেও আজ পর্যন্ত একটি সমিতিও এই পর্যায়ে আসতে পারেনি ।

বি,আর,ডি,বি-এর সমবায় ঋণ সম্পর্কে শিকড় নাড়ানো যে অভিযোগটি উত্থাপিত হচ্ছে তাহলো যে সমস্ত সমবায় সমিতি (৬২ হাজার) গড়ে উঠেছে তার কত অংশ সত্যিকার অর্থে "সমবায়" ? মাঠ তথ্য থেকে জানা যায় যে, এদের অধিকাংশই কাগজ-সর্বস্ব সমবায় । ঋণ পাবার আশায় ভুয়া সদস্য তালিকা তৈরী করে ভুরি ভুরি সমবায় গঠিত হয়েছে ও হচ্ছে। বি,আর,ডি,বি'র কর্মকর্তারা জেনে শুনেই নিজেদের স্বার্থে এরূপ 'সমবায়' দিনের পর দিন পুষে যাচ্ছেন । গরমিলের ক্ষেত্রে, আগের মতই ঘুষ বা "পারসেনটেজ" সমাধান এনে দিচ্ছে। মনে পড়ে সমবায় ঋণকে উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে জোরদার করার উদ্দেশ্যে উত্তর-পশ্চিম বাংলাদেশে একটি অগভীর নলকূপ প্রকল্পে (আই,ডি,এ ক্রেডিট নং ৭২৪) কত গুলো বিশেষ সুবিধা দেয়াও হয়েছিল । একটি নির্দিষ্ট কোটা এবং কম ডাউনপেমেন্ট (দুই হাজার টাকার স্থলে এক হাজার টাকা) দিয়ে এই সমিতি গুলোকে ঋণে অগভীর নলকূপ দেবার কর্মসূচী ছিল । একটি গবেষণায় দেখানো হয়েছে উক্ত কর্মসূচীর আওতায় দ্বৈবচয়ন পদ্ধতিতে যে ১৯টি অগভীর নলকূপ বাছাই করা হয়েছিল তার ১৮টি ছিল ভুয়া সমবায় । যে একটি সত্যিকার সমবায় ছিল তাও ছিল বাপ-বেটা ও নিকট আত্মীয়-স্বজনের সমবায় [১৭;১৬৬-৭] ।

২.৬ গরীবদের পৃথক প্রতিষ্ঠান

যেহেতু প্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে বিতরণকৃত ঋণের সিংহভাগই পাচ্ছে বড় কিংবা মাঝারী কৃষক, সেহেতু মনে করা হলো যে গরীবদের জন্য আলাদা কোন লগ্নী প্রতিষ্ঠান না থাকলে সত্যিকারের দারিদ্র্য নিরসন তথা পল্লী উন্নয়ন অসম্ভব । এই অনুমিত সত্যকে সামনে রেখেই সৃষ্টি হয়েছে গরীবদের জন্য পৃথক ব্যাংক— গ্রামীন ব্যাংক ১৯৭৬ সালে । যে অনুমানসিদ্ধ কল্পনাটি যাচাই করার জন্য গ্রামীণ ব্যাংকের আত্মপ্রকাশ, তা হলো ঃ যদি কঠোর তদারকীর মাধ্যমে যুক্তিসংগত শর্তে গরীবদের (এবং শুধুমাত্র গরীবদের) আর্থিক সম্পদ দেয়া হয়, তাহলে তাদেরকে দারিদ্র্যের চক্র থেকে বের করে নিয়ে আসা সম্ভব । প্রাথমিকভাবে একটি "প্রকল্প" হিসেবে কাজ শুরু করে এই প্রতিষ্ঠান ১৯৮৩ সাল থেকে একটি পৃথক পূর্ণাঙ্গ সরকারী ব্যাংক হিসেবে কাজ করছে । এর পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ টাকা ৩০ মিলিয়ন, যার ৪০% এর মালিক সরকার, ৪০% ঋণ গ্রহীতা সদস্য-সদস্যারা এবং বাকী ১০% বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক । বর্তমানে এই ব্যাংকের অর্থ সংস্থান দিচ্ছে মূলতঃ একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, আই, এফ, এ,ডি (কৃষি উন্নয়নের আন্তর্জাতিক তহবিল)।

১৯৮৭ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত গ্রামীণ ব্যাংক ৫,৪৫২টি গ্রামে কাজ করছিল । এর মোট সদস্য সংখ্যা প্রায় ২.৪৭ লাখ, যার মধ্যে ৭৫% ই মহিলা । ঐ সময় পর্যন্ত সর্বমোট বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ টাকা ১,৫৮৩ মিলিয়ন, যার মধ্যে মহিলাদের অংশ ছিল ৬১% । বস্তুতঃ দুস্থ মহিলাদের উপর অধিক গুরুত্ব দেয়াটাই গ্রামীণ ব্যাংকের একটি মূল বৈশিষ্ট্য । এই ব্যাংকের সবচাইতে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো যে খেলাপী ঋণের পরিমাণ মাত্র ১.৩৫% । পরিশোধকৃত ঋণের পরিমাণ ৯৭% এরও বেশী । ঋণ আদায়ের ব্যাপারে এই ব্যাংকের কার্যকারিতা অনন্য । এর একটি সঞ্চয়ী তহবিল আছে, তাতে এ পর্যন্ত মহিলাদের ৬০% অংশ সহ সর্বমোট টাকা ১২২.৪০ মিলিয়ন জমা হয়েছে । পাঁচ জনের সমন্বয়ে গঠিত গ্রুপের যে কোন সদস্য/সদস্যা অন্য সদস্য/ সদস্যাদের সম্মতিক্রমে এই তহবিল থেকে ঋণ নিতে পারে । আলোচ্য সময়ের মধ্যে সদস্যরা প্রায় ৪৪.১ মিলিয়ন টাকা এই তহবিল থেকে ঋণ নিয়েছে । এ ছাড়াও রয়েছে আপদকালীন তহবিল যাতে জমা রয়েছে মোট টাকা ২৪.২ মিলিয়ন । এই ব্যাংক যেহেতু মোটামুটি ভূমিহীনদের নিয়েই কারবার করে, সেহেতু এর সিংহভাগ ঋণই ব্যবহৃত হয় অকৃষি কাজের জন্য । উদাহরণ স্বরূপ, ১৯৮৪ সালে মোট বিতরণ কৃত ঋণের মাত্র ১.৬% ব্যবহৃত হয়েছিল কৃষি ও বনায়নের জন্যে, ২৮.৩% গবাদি পশু ও মাছ চাষের জন্যে, ২৩.৪% প্রক্রিয়াজাত ও শিল্পায়নের জন্যে ৩৫.৫% ব্যবসা ও দোকানদারীর জন্যে এবং বাকীটা অন্যান্য খাতে [১৫] । উল্লেখ্য, মহিলা সদস্যারা সবচাইতে বেশী টাকা নেয় গবাদি পশু ও মাছ চাষের জন্যে এবং পুরুষরা ব্যবসা ও দোকানদারীর জন্যে ।

এ পর্যায়ে আগ্রহী পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, এই ঋণের টাকা সত্যিকার অর্থে কারা পেয়েছে বা পাচ্ছে ? গ্রামীণ ব্যাংক থেকে ঋণ পেতে হলে তাকে ভূমিহীন অথবা তার মোট আবাদি জমির পরিমাণ ৫০ শতাংশের বেশী হবে না কিংবা তার কৃষি সম্পদের বাজার মূল্য মধ্যম শ্রেণীর ঐ পরিমাণ জমির মূল্যের অধিক হবে না এই শর্ত

কি বাস্তবে রূপান্তরিত হয়েছে ? বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বি,আই,ডি,এস)-এর গবেষণালব্ধ ফলাফল থেকে জানা যায় যে, এই শর্তটি বাস্তবেও রূপায়িত হয়েছে [১] । এতে দেখানো হয়েছে যে মোট ঋণ গ্রহীতাদের মধ্যে ২.৭% ছিল যাদের আবাদি জমির পরিমাণ এক একরের (০.৪০ হেক্টর) বেশী, শতকরা ৫২ জনের কোন কৃষি জমি ছিল না এবং মাত্র ২.৭% কৃষকের ২.৫ একরের (এক হেক্টর) বেশী জমি ছিল । এই রিপোর্টে আরও দেখা যায় যে ৬২% ঋণ গ্রহীতাদের অকৃষি সম্পদের মূল্য ছিল এক হাজার টাকা বা তার নীচে এবং মাত্র ৬.২% এর ছিল পাঁচ হাজার টাকা বা তার উপরে । অতএব দেখা যাচ্ছে যে, গ্রামীন ব্যাংকের ঋণের সুবিধা মূলতঃ (৯৫%) "টারগেট" গ্রুপের লোকজনই ভোগ করছে ।

এই ঋণ ব্যবহারে ঋণ গ্রহীতাদের কি আর্থিক অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়েছে ? উক্ত রিপোর্টের তথ্য ব্যবহার করে এর জবাব দেয়া যায় । এতে দেখানো হয়েছে যে "নিয়ন্ত্রিত" গ্রামবাসীদের এবং অন্যান্য ভূমিহীনদের তুলনায় গ্রামীন ব্যাংকের সদস্যদের বার্ষিক আয় যথাক্রমে ৩১% ও ১৮% বেশী । পরিবার পিছু স্থির সম্পদের মূল্য গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্যদের তুলনামূলক ভাবে বেশী (নিয়ন্ত্রিত গ্রামের তুলনায় প্রায় ২৫%)। এ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণ গ্রহীতারা ঋণ নিয়ে আর্থিক ভাবে লাভবান হচ্ছেন ।

উপরোক্ত বিশ্লেষনাত্বক তথ্যের ভিত্তিতে আমরা কি তা হলে গ্রামীণ ব্যাংককে দারিদ্র্য নিরসণের তথ্য পল্লী উন্নয়নের একটি যথোপযুক্ত কৌশল কিংবা মডেল হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি ? শুধু "হ্যাঁ" বা "না" বলে এর সঠিক উত্তর দেয়া যুক্তি সংগত হবে না । জাতীয় পর্যায় গ্রামীণ ব্যাংককে একটি "আদর্শ কৌশল" হিসেব বিচার করতে হলে নিম্নের মন্তব্যগুলো বিশেষ বিবেচনার দাবী রাখে।

এক, অতীতের তুলনায় গ্রামীণ ব্যাংক এখন দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে। তবুও গত এক দশকে ৮৬ হাজার গ্রামের মাত্র ৬% এর আওতায় এসেছে । এই গতিতে চললে হিসেবে দেখা যায়, সমগ্র বাংলাদেশকে এর আওতায় আনতে আরও ১০০—১৫০ বছর সময় লাগবে । দুই, গ্রামীণ ব্যাংক "টারগেট" গ্রুপদেরকেই মূলতঃ ঋণ দিচ্ছে। কিন্তু সব লোকদেরকেই কি এর আওতায় আনতে পেরেছে ? আহমদ ও হোসেন তাঁদের এক গবেষণায় দেখান যে, ভূমিহীন কৃষকদের সংখ্যা মোট "টারগেট" গ্রুপের প্রায় এক তৃতীয়াংশ হলেও, গ্রামীন ব্যাংক তাঁদের অংশ মোট ঋণ গ্রহীতার মাত্র এক দশমাংশ [১] । অতএব সব চাইতে দরিদ্র লোকদের সামান্য অংশই গ্রামীণ ব্যাংকের আওতায় এসেছে । এটা হচ্ছে আর একটি কারণে তা হলো একই ব্যক্তিকে বার বার ঋণ দেবার রীতি । কেউ কেউ এমন অভিযোগও করেন যে বার বার ঋণ দেয়া পদ্ধতি বিলুপ্তি ঘটলে ঋণ আদায়ের রেকর্ডে ভাটা পড়তে বাধ্য । তিন, পূর্ব প্রদত্ত-তথ্য থেকে দেখা গেছে যে, এই ব্যাংকের ঋণ প্রকৃত পক্ষে শুধুমাত্র অকৃষি কাজের জন্যে ব্যবহৃত হচ্ছে আসলে পল্লী উন্নয়ন নির্ভর করছে কৃষি বা শস্য উৎপাদনের উপর । অতএব শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি না করে এবং তার বৃদ্ধির সাথে সম্পৃক্ত অকৃষি কাজের সম্প্রসারণ করার চেষ্টা না করলে সত্যিকারের পল্লী উন্নয়ন অসম্ভব । চার, সাধারণতঃ এ ধরনের কর্মসূচী বাস্তবায়নে যে

সমস্ত সমস্যা প্রকট হয়ে দেখা দেয় তার মধ্যে সঠিক ও সৎ নেতৃত্ব উল্লেখযোগ্য । জানা গেছে শুধুমাত্র উচুঁ পর্যায়ে নয়, সংশ্লিষ্ট অফিসারদের বাছাই ও প্রশিক্ষণসহ নিম্ন পর্যায়ের কাজেও ব্যবস্থাপনা পরিচালক স্বয়ং নেতৃত্ব দিচ্ছেন । তাঁর 'সৎ' নেতৃত্বের জন্যই এখনও নীচের পর্যায়ের প্রায় সব অফিসারই উন্নত নৈতিক মানের পরিচয় দিয়ে মোটামুটি নিঃস্বার্থভাবেই কাজ করে যাচ্ছে। কে জানে যখন এর পরিধি আরও বিস্তার লাভ করবে এবং /অথবা উচুঁ পর্যায়ের নেতৃত্ব ঢিলা হয়ে যাবে এবং/অথবা মাঠ পর্যায়ের কর্মীরা অন্যান্য সরকারী কর্মচারীদের "ষ্টাইলে" কাজ করার দাবী জানাতে থাকবে, তখন এর সার্বিক অবস্থা কি হবে ? গ্রামীণ ব্যাংকের বিপক্ষে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ সমালোচনা হলো এর মাধ্যমে পল্লী উন্নয়নের জন্য কোন প্রক্রিয়ার সৃষ্টি হয়নি । ঋণ গ্রহণকারীরা কেবলমাত্র তাদের খুশী মত ঋণ নিচ্ছে, ব্যবহার করছে এবং তা ফেরৎ দিচ্ছে। মনে রাখতে হবে কেবল মাত্র টাকাই সব কিছু করতে পারে না, আরও যা দরকার তা হলো প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ যার ব্যবস্থা এই ব্যাংকের এখনও করা হয়নি ।

এ সব সমালোচনা সত্ত্বেও দারিদ্র্য নিরসনের নিরিখে গ্রামীণ ব্যাংক পদ্ধতিটিকে এক ফলপ্রসু কৌশল হিসেবে অভিহিত করা যায় ।

২.৭ পরিপূরক আয় বৃদ্ধি

দারিদ্র্য নিরসনের নিরিখে পল্লী উন্নয়নের কৌশল বিবেচনায় উৎপাদনের সাথে সাথে ভোগও সমান গুরুত্ব পাবার অধিকারী । যেহেতু পল্লী এলাকার অধিকাংশ জনগণের আয় 'প্রবেশ দ্বার আয়ের' (Threshold income) নিম্নে অবস্থিত, সেহেতু নিম্ন আয়ের ভোক্তাদের উন্নয়নের অংশ পৌছিয়ে দেবার ব্যবস্থা হিসেবেই উপরোক্ত কৌশলের আবির্ভাব । অনুমান করা হয় যে, নিম্ন আয়ের লোকদের যদি অপেক্ষাকৃত কম দামে খাদ্য যোগান দেয়া হয়, তাহলে এক দিকে পরোক্ষভাবে তাদের আয় বেড়ে যাবে এবং ধনী গরীবদের মধ্যে দৃশ্যমান আয় বৈষম্যেরও অবসান ঘটবে । অন্যদিকে বিপদের সময় অল্প দামে খাদ্য শস্য কিনতে পারলে তারা ঐ সময় তাদের বিভিন্ন সম্পদ বিক্রির হাত থেকেও বেঁচে যাবে । এতে পল্লী উন্নয়ন ত্বরান্বিত না হলেও তা ব্যহত হবে না—এটিই সরকারী খাদ্য বন্টন ব্যবস্থা কৌশলের অন্তর্নিহিত যুক্তি ।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই ব্যবস্থা চালু হয় ১৯৪৩ এর মন্বন্তরের সময়ে । বর্তমানে এই ব্যবস্থায় আট রকমের গ্রহীতাদের খাদ্য দেয়া হচ্ছে। যেমনঃ (ক) বিধিবদ্ধ রেশনিং (এস আর-এর আওতায় রয়েছে রাংগামাটি ও নারায়নগঞ্জসহ দেশের ৪টি বিভাগীয় শহর, (খ) সংশোধিত রেশনিং (এন আর—শহরাঞ্চলের বাহিরের এলাকাসমূহ), (গ) রিলিফ (বিপদের সময় বিনা মূল্যে খাদ্য), (ঘ) প্রয়োজনীয় অগ্রগন্য গ্রুপ (যেমনঃ পুলিশ, সেনা বাহিনী, ছাত্র) (ঙ) অন্যান্য গ্রুপ (যেমন সরকারী ও বেসরকারী কর্মচারীগণ) (চ) খোলা বাজারে বিক্রি, (ছ) টেষ্ট রিলিফ (রেশনের জন্য লোকজন কাজ করতে আগ্রহী কিনা তা যাচাই করা) এবং (জ) দুঃস্থ মাতাদের খাওয়ানো গ্রুপ (ভি এফ জি)। সংগ্রহ কর্মসূচীর মাধ্যমে প্রাপ্ত খাদ্য শস্য এবং বিদেশ থেকে বিভিন্ন ভাবে প্রাপ্ত খাদ্য শস্য এই সকল গ্রুপের লোকদের জন্যে ব্যবহার করা হয় । প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে, ৬০ দশক থেকে দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষ বছর নাগাদ মোটামুটি প্রতি বছরে ৬

থেকে ২৬ লাখ টন খাদ্য শস্য উক্ত ব্যবস্থায় বিতরণ করা হয়েছে । এই সর্বোচ্চ পরিমাণ বিতরণ করা হয় ১৯৭২-৭৩ এবং ১৯৮৪-৮৫ সালে । আমাদের প্রশ্ন ঃ এই খাদ্য বন্টন, ব্যবস্থার মাধ্যমে পল্লী দারিদ্র্য নিরসন করা কতখানি সম্ভব হয়েছে ? নীচের আলোচনা থেকে এর জবাব পাওয়া যাবে ।

পল্লী জনগণের দারিদ্র্য লাঘব করাই যদি মূল উদ্দেশ্য হয়, তাহলে এই কর্মসূচীর মাধ্যমে যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্য শস্য 'টারগেট' গ্রুপের কাছে পৌঁছুতে হবে । বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায় যে, মোট বিতরণকৃত ঋণের সিংহভাগই শহর এলাকায় দেয়া হয়, পল্লী এলাকায় নয় । উদাহরণ স্বরূপ ইসলাম তাঁর এক প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে, ১৯৭৩-৭৪ সালের মোট বিতরণকৃত খাদ্য শস্যের দুই-তৃতীয়াংশই দেয়া হয়েছিল শহরের জনগণকে যেখানে মোট জনসংখ্যার মাত্র ৯% লোক বাস করত [২৩] । বাকী ৯১% লোক পেয়েছিল মোট খাদ্য শস্যের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ। এই তথ্য থেকেই বুঝা যায়, পল্লীর জনগণ সার্বিকভাবে এই ব্যবস্থা থেকে কতটুকু উপকার পেয়েছে ।

যে পরিমাণ খাদ্য শস্য পল্লী এলাকায় বন্টন করা হয়, তা কি আয়ের বৈষম্য দূর কিংবা উপশম করতে সক্ষম ? উক্ত লেখক ১৯৭৩—৭৪ সালের জাতীয় ব্যয় জরীপের তথ্য ব্যবহার করে দেখিয়েছেন যে, সরকারী খাদ্য বন্টন ব্যবস্থা আয় বৈষম্য দূর করতে কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারেনি । এছাড়া ইদানিং অনেকেই মনে করছেন এই ব্যবস্থায় বিলিকৃত খাদ্য মূলতঃ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হচ্ছে, দারিদ্র্য নিরসনের জন্যে নয় ।

সুতরাং ; যুক্তিসংঙ্গতভাবেই বলা যায় যে, উক্ত কৌশল দারিদ্র্য নিরসনের হাতিয়ার হিসেবে চিহ্নিত হতে ব্যর্থ হয়েছে । এটি বরং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে অথবা বড় জোড় দারিদ্র জিইয়ে রাখবার জন্যে উপযুক্ত কৌশল, পল্লী উন্নয়নের জন্যে নয় ।

২.৮ প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণ

বাংলাদেশের পল্লী উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সংক্রান্ত আদেশ-নির্দেশ-উপদেশ সব কিছুই ঢাকা কেন্দ্রিক । এ ধরনের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় বেশ ক'টি এটি লক্ষণীয় । (ক) স্থানীয় পর্যায়ে যে সমস্ত সম্পদ (আবাদি ও অনাবাদি জমি, ভূ-উপরিভাগ ও ভূ-গর্ভস্থ পানি, পুকুর-নালা-খাল-বিল, রাস্তা-ঘাট ইত্যাদি) ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে তাদের প্রকৃতি ও পরিধি সম্পর্কে না জেনেই সমষ্টিগত তথ্যের উপর নির্ভর করে উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরী হয়; (খ) স্থানীয় সম্পদ ব্যবহারে যে সমস্ত আর্থ-সামাজিক, প্রাতিষ্ঠানিক, রাজনৈতিক, প্রযুক্তিগত এবং ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সমস্যা রয়েছে তার সঠিক রূপ নির্ধারণ করা সম্ভব হয় না; (গ) যত ছোটই হোক অনেক অঞ্চলেই স্থানীয় জনগণের বিশেষ ধরনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চরিত্র লক্ষ্য করা যায় যা বিবেচিত হয় না এবং (ঘ) উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে ও তা বাস্তবায়নে স্থানীয় জনগণের কোন অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায় না । পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে এগুলোকে বাধা হিসেবেই চিহ্নিত করা হয় [৫ ; ১৫৫] । এ ধরনের বাধা দূরীকরণের উদ্দেশ্যেই স্থানীয় পরিকল্পনাকে একটি কৌশল হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। সম্ভবতঃ এরই প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে উপজেলা পদ্ধতির মাধ্যমে প্রশাসনকে বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে । এই কৌশলের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ তথা পল্লী উন্নয়ন

কতখানি ত্বরান্বিত হচ্ছে, সে সম্পর্কে চূড়ান্ত কোন মন্তব্য এখনই করা উচিত হবে না, তবে এর প্রয়োগযোগ্যতা সম্পর্কে দু-চারটি কথা বলা উচিৎ ।

প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণ কর্মসূচী ১৯৮২ সাল থেকে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ পর্যন্ত বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ গৃহীতও হয়েছে । নির্বাচিত ও মনোনীত সদস্যদের দ্বারা উপজেলা পরিষদকে ঢেলে সাজান হয়েছে । উচুঁ ক্ষমতাসম্পন্ন পদস্থ কর্মকর্তাকে উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ, এন, ও) হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে । এই পরিষদকে পল্লী উন্নয়ন সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের কিছু কিছু দায়িত্বও দেয়া হয়েছে । এর মধ্যে রয়েছে উফশী প্রযুক্তির ব্যবহার, পরিবার পরিকল্পনা, পল্লী পূর্ত কর্মসূচী ইত্যাদি । পাশাপাশি সরকারী উদ্যোগে অন্যান্য কর্মকাণ্ড যেমন দালান-কোঠা নির্মাণ, রাস্তা-ঘাট তৈরী ইত্যাদিরও বন্দোবস্ত করা হয়েছে । বিচার বিভাগ উপজেলাতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে । স্থানীয় পরিষদকে কর আদায়ের ক্ষমতা ছাড়াও অনুদান-সাহায্য দেবার বন্দোবস্ত আছে । উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরী করার দায়িত্ব এখন মূলতঃ স্থানীয় পরিষদের । এর জন্য জাতীয় পরিকল্পনা কমিশন কিছু কিছু নীতিমালাও তৈরী করেছেন । সমন্বয়ের জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গৃহীত হচ্ছে বলে জানা গেছে । দ্বিতীয় পরিকল্পনা নাগাদ উপজেলা পদ্ধতি বাস্তবায়নের খাতে ৫২৫.৩০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে । ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের জন্যে ৩৭০.৯৫ কোটি টাকার অনুদানও দেয়া হয়েছে । এর উপরও রয়েছে পল্লী পূর্ত কর্মসূচীর খাতে ৮.৪৫ লাখ টন খাদ্য শস্য । তৃতীয় পরিকল্পনার অবকাঠামো তৈরীর জন্য টাকা ১,০০০ কোটি এবং উন্নয়নের জন্য টাকা ১,২৫০ কোটি বরাদ্দ রয়েছে [১০] ।

পাঠকের কৌতুহল জাগার কথা যে, এত কিছু করার পরে দারিদ্র্য নিরসনে আলোচ্য কৌশলটির ভূমিকা কতখানি ? ইতিপূর্বে বলা হয়েছে, এ ব্যাপারে চূড়ান্ত কোন মন্তব্য এখন দেয়া উচিত হবে না । তবে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে, পল্লী উন্নয়নের ভিত্তি হিসেবে স্থানীয় পর্যায়ের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কোন কার্যকরী পদক্ষেপ এখনও নেয়া হয়নি । জানা যায় উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেটই সরকারী কমিশনার হিসেবে উক্ত পদের দায়িত্ব পালন করছেন কিংবা দায়িত্বে আছেন । পরিকল্পনা তৈরীর ব্যাপারে খুঁটি-নাটি বিষয়াদি সম্পর্কে তাঁদের কোন অভিজ্ঞতা আছে বলে অনেকেই মনে করেন না । ঠিক একথাটিই তৃতীয় পরিকল্পনায় একটু ঘুরিয়ে বলার চেষ্টা করা হয়েছে । এতে বলা হয়েছে, উপজেলায় পরিকল্পনা প্রণয়নের উপযুক্ত কোন অফিসার নেই কিংবা তাদের কোন প্রশিক্ষণ দেবারও ব্যবস্থা নেয়া হয়নি [১০;১২৫] । পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্যে যে বিস্তারিত তথ্যের প্রয়োজন তা সংগ্রহ কিংবা মনিটরিং সম্পর্কে কোন চিন্তা-ভাবনা করা হয়নি । বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোও এ পর্যন্ত কোন কার্যকরী পদক্ষেপ হাতে নেয়নি । এতে আরও উল্লেখ করা হয় যে পল্লী উন্নয়ন একটি সমষ্টিগত কর্মসূচী । অন্যান্য কর্মসূচীর সাথে সংযোগ স্থাপন না করে শুধুমাত্র প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণ করে কোন সুফল পাওয়া যাবে না । ভূমি সংস্কারের পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়ন একান্ত প্রয়োজন [১০; ১২৫] । অবশ্য প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণ পল্লী উন্নয়নের একটি অত্যাবশ্যক শর্ত হিসেবে বিবেচিত হতে পারে । তবে পর্যাপ্ত শর্ত হিসেবে জনগণকে উন্নয়ন কাজে অংশগ্রহণের জন্যে উদ্বুদ্ধ করতে হবে ।

প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণের পদক্ষেপ হিসেবে বিচার ব্যবস্থা জনগণের দোর গোড়ায় নিয়ে যাওয়ায় দারিদ্র্য নিরসনের ক্ষেত্রে কি প্রতিক্রিয়া হচ্ছে, সে সম্পর্কে দু'একটা মন্তব্য করা যায় । আগে জেলা পর্যায়ে কিংবা আরও দূরে বিচার ব্যবস্থা থাকায় জনগণের বিচার পেতে অনেক সময় লাগত এবং অনেক অর্থও ব্যয় করতে হতো ।•এ দুটো কারণে অনেকেই বিচারের জন্য অগ্রসরই হতো না । এখন দোর গোড়ায় বিচার ব্যবস্থা যাবার দরুন সেই অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে, "খাসির পরিবর্তে মুরগী দিয়ে" বিচার পাচ্ছে এবং সময় বাঁচিয়ে, খরচা বাঁচিয়ে তা উন্নয়ন মূলক কাজে লাগাচ্ছে। আসলেই কি তাই ? কিছুদিন আগে সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেলার উকিলদের ক্লাবে একটি পুরো দিন কাটবার সুযোগ হয়েছিল এই প্রবন্ধকারের । তাদের বক্তব্য থেকে যা জানা গেল তা হলোঃ বিচার বিভাগ দোর গোড়ায় এনে মানুষে মানুষে কলহের জের আরও দীর্ঘায়িত করা হয়েছে এবং বিচারের খরচ আরও বেড়ে গেছে । প্রতিযোগিতায় পড়ে "খাসির পরিবর্তে মুরগী তো দূরে থাক, গরু দিয়েও" বিচারের খরচ মিটানো সম্ভব হচ্ছে না । আরও জানা গেল, তাদের সবারই উপার্জন বেশ ভালই হচ্ছে। ঐ উপজেলাতেই তখন (১৯৮৬ সালে) মোট ৩৪ জন উকিল কাজ করছিলেন, সবার আনুমানিক মাসিক আয় ৩,০০০ টাকা থেকে ১০,০০০ টাকা ।

৩. বিকল্প কৌশলের মর্মবাণী

আমরা পূর্ববর্তী সেকশনে যে সব পল্লী উন্নয়ন কৌশল মূল্যায়ন করেছি তার ফলাফলের মধ্যেই নিহিত রয়েছে বিকল্প কৌশলের মর্মবাণী । এখানে সেই আলোচনার সংক্ষিপ্তসার উল্লেখ করে অনুসৃতব্য কৌশলের স্বরূপ তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে ।

মূল্যায়নকালে দেখা গেছে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকল্পে যেসব কৌশল ব্যবহৃত হচ্ছে তার মধ্যে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ হলো উফশী প্রযুক্তি । দেখা গেছে সীমিত এলাকায় হলেও এই প্রযুক্তির মাধ্যমে জমির উৎপাদনশীলতা বেড়েছে নিঃসন্দেহে; কিন্তু বন্টনের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে দারিদ্র্য নিরসনের নিরিখে এর ভূমিকা একেবারেই নগণ্য । সমস্যা হিসেবে প্রচলিত ভূমি ব্যবস্থাকে আপাততঃ বাদ রাখলে, মূল দায়িত্ব বর্তায় কৃষি উৎপাদনশীলতার সাথে অকৃষি খাতের কার্যকর সংযোগ স্থাপনে এর ব্যর্থতার ওপর । উদ্যোক্তার অভাবকেই অনেকে এই ব্যর্থতার জন্যে দায়ী করে থাকেন । কিন্তু মাঠ তথ্য থেকে জানা যায়, এর জন্য মূলতঃ দায়ী উদ্যোক্তাদের অভাব নয় বরং তাঁদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কারিগরি জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অভাব এবং সর্বোপরি, যাঁরা বিদেশী দাতাদের চাপে পড়ে এই অভাব পূরণে এগিয়ে আসেন তাঁদের নিরুদ্যম অদক্ষ নেতৃত্ব । অতএব পল্লী উন্নয়নের কৌশল হিসেবে উফশী প্রযুক্তির শুধু 'সহযোগী' নয় বরং 'জ্যেষ্ঠ ভাতা' হিসেবে কৃষি ও অকৃষি খাতের মধ্যে কার্যকরী সংযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয় । এটিই এ ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত শর্ত । উৎপাদন বৃদ্ধির দ্বিতীয় কৌশলটি (উৎসাহব্যঞ্জক মূল্য) মূল্যায়নকালে দেখা গেছে এটি একদিকে ব্যয় সাপেক্ষ অন্যদিকে উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যাপারে এর অতি দুর্বল ভূমিকা । এ কারণে উৎসাহব্যঞ্জক মূল্যকে বর্তমান অবস্থায় পল্লী উন্নয়নের কৌশল হিসেবে বিবেচিত না করাই অধিকতর যুক্তি সংগত ।

শুষ্ক মৌসুমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি আর একটি কৌশল । আলোচনায় দেখা গেছে দারিদ্র্য নিরসনের ক্ষেত্রে এর সম্পর্ক নিবিড় । অর্থাৎ এর সুবিধা যত কিঞ্চিতই হোক কিংবা যত স্বল্প সময়ের জন্যেই হোক, এর একটি অংশ ভূমিহীন ও গরীব জনগণই পাচ্ছে। কিন্তু এর সমস্যা অন্যত্রঃ (এক) সৃষ্ট কর্মসংস্থান নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী, (দুই) সৃষ্ট কর্মের সাথে পল্লী এলাকায় সার্বিক কর্মকাণ্ডের সংযোগ নেই বললেই চলে এবং (তিন) এ ধরনের প্রকল্পে কোনরূপে কৈফিয়ত দেবার শর্ত না থাকায় দুর্নীতির অবাধ বিচরণ। অতএব প্রকৃত কৌশলটি হওয়া উচিত শুধুমাত্র 'কর্মসংস্থান' নয় বরং পল্লী জনগণের জন্যে স্থায়ী এবং উৎপাদনমুখী কর্ম 'সৃষ্টি' । পর্যাপ্ত শর্ত হিসেবে মানুষ গড়ার বিষয়টি এর সাথে যুক্ত থাকা বাঞ্ছনীয় ।

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ঋণের ভূমিকা যে সন্দেহাতীত তা আদিকাল থেকেই স্বীকৃত । অন্যদিকে এই ঋণই যে মানুষকে অর্থনৈতিকভাবে পংগু করে দেয়, তাদের সর্বনাশ করে, সে কথাও আজ সর্বজনবিদিত । ঋণের এই অর্ন্তদ্বন্দ্বমুখী সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যেই চালু করা হচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক পল্লী ঋণ। কিন্তু আজও কি পল্লীর জনগণ এর অভিশাপের কবল থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ? আলোচ্য অভিজ্ঞতার ফলাফলের ভিত্তিতে এর জবাব ঋণাত্বক বৈ ধণাত্বক নয় । এর কারণ একই জাতেরঃ পল্লীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের চাইতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের প্রাধান্য, বন্টনে বৈষম্য এবং সর্বস্তরে দাতা গ্রহীতার দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি । তাই বলা যায় যে পল্লী উন্নয়নের জন্যে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের যোগান একটি আবশ্যিক শর্ত হতে পারে, কিন্তু পর্যাপ্ত নয় । এই পর্যাপ্ত শর্তটি হবে জনগণের চাহিদা মোতাবেক তদারকী ঋণ সরবরাহ এবং এই ঋণের সুষ্ঠু ব্যবহারের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সবাইকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান । অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তনীয় থাকা সাপেক্ষে, সমবায় ঋণের ক্ষেত্রে এই পর্যাপ্ত শর্তটির গুরুত্ব আরও অনেক বেশী । সৎ নেতৃত্বের মাধ্যমে উপযুক্ত তদারকী ঋণ প্রদান করলে যে ফলাফল শুভ হয় তার প্রকৃষ্ট নজীর গ্রামীণ ব্যাংক । তবে যেহেতু এই প্রতিষ্ঠানটি গ্রামের শুধুমাত্র একটি বিশেষ শ্রেণীর লোকদের নিয়ে কারবার করে এবং যেহেতু তাদের কর্মকাণ্ডের সাথে পল্লী উন্নয়নের সার্বিক কর্মকাণ্ডের, বিশেষ করে কৃষি উৎপাদনশীলতার সংগে কোন কার্যকর সম্পর্ক এখনও গড়ে উঠেনি কিংবা সার্বিক পল্লী উন্নয়নের উপলব্ধি করা যায় এমন কোন প্রক্রিয়া এখনও চালু করা সম্ভব হয়নি, সেহেতু একে এখনও পল্লী উন্নয়নের আদর্শ কৌশল হিসেবে গণ্য করা যায় না । তবে গ্রামের জনগণকে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে এবং তাদের সংগঠিত করার ব্যাপারে গ্রামীণ ব্যাংকের মডেল অনন্য; একটি যথোপযুক্ত কৌশল ।

পরিপূরক আয় বৃদ্ধির প্রচেষ্টাকে কেউ কেউ দারিদ্র্য নিরসনের একটি প্রত্যক্ষ হাতিয়ার হিসেবে চিহ্নিত করে থাকেন । আমাদের আলোচনায় দেখানো হয়েছে যে, যেভাবে খাদ্য শস্য বিভিন্ন শ্রেণীর লোকজনের মধ্যে বন্টিত হচ্ছে, তাতে আয় বৈষম্য হ্রাসের সম্ভাবনা তো নেই বরং দারিদ্র্যকে জিইয়ে রাখবার প্রচেষ্টা চলছে । অতএব পরিপূরক আয় বৃদ্ধির প্রচেষ্টাকে পল্লী উন্নয়নের কৌশল হিসেবে বিবেচনা না করাই বুদ্ধিমানের কাজ ।

পল্লী উন্নয়নের ইতিহাসে প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণ আর একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। কিন্তু

পল্লী উন্নয়নের নিরিখে মানসিকতা পরিবর্তনের অভাবে এই কৌশলটি আজও কার্যকরী ভূমিকা পালনের প্রস্তুতি নিতে সক্ষম হয়নি । উপযুক্ত প্রশিক্ষণসহ আদর্শ মানুষ গড়াই হবে এই ধরনের কর্মসূচী বাস্তবায়নের যথোপযুক্ত কৌশল ।

৪. সমাপ্তি মন্তব্য

দারিদ্র্য নিরসনে পল্লী উন্নয়নের ভূমিকা এখানেই, কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির সাথে সম্পর্ক রেখে অকৃষি খাতের উন্নয়ন । অন্য কথায়, কৃষি প্রক্রিয়াকরণ ও কৃষি সহায়ক শিল্পের বিকাশ। উফশী প্রযুক্তি, ভূমি সংস্কার, কর্মসৃষ্টি, প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ যোগান, স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণ, এ সবই ঐ সংযোগ স্থাপনের অত্যাবশ্যকীয় শর্তগুলো পূরণ করে বটে কিন্তু এ গুলো পর্যাপ্ত নয় । এ গুলো প্রত্যাশিত কার্যকরী সম্পর্কের একটি পক্ষ মাত্র । অন্য পক্ষে রয়েছে যাদের জন্য এবং যাদের দ্বারা উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়িত হয়, তাদের কর্মদক্ষতা, বিচক্ষণতা এবং নৈতিক চরিত্র । আমাদের আলোচনায় এই পক্ষটিরই নানা রকম অসম্পূর্ণতার চিত্রই পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে । তাই পল্লী উন্নয়নের যে কোন স্বাভাবিক কৌশল প্রয়োগের ক্ষেত্রে এই অপর পক্ষটির অসম্পূর্ণতাগুলো দূরীকরণ বা উপশম একান্ত আবশ্যক এবং এ গুলো পল্লী উন্নয়নের কৌশল মালায় অন্তর্ভুক্ত করার জোর সুপারিশই এই প্রবন্ধের অন্যতম লক্ষ্য ।

অনেকেই মনে করেন, উক্ত সুপারিশকৃত "মানুষ উন্নয়নের ব্যবস্থা" বর্তমানে বাংলাদেশে কার্যকর । চারটি সংস্থার মাধ্যমে এ জাতীয় কর্মসূচী বাস্তবায়িত হচ্ছে। সেগুলো হলোঃ কুমিল্লায় বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়ায় পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, সিলেটে পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট এবং জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনষ্টিটিউট । তৃতীয় পরিকল্পনায় দাবী করা হয়েছে ১৯৮৪-৮৫ সাল নাগাদ উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে বিভিন্ন জাতি গঠন বিভাগ/সংস্থার এবং স্থানীয় সরকারের সর্বমোট ২৩,০০০ কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে [১০;২১৫] । এর উপরেও রয়েছে অগণিত আদর্শ কৃষক, সেচ সংগঠনের ম্যানেজার এবং অন্যান্য স্থানীয় লোকজনের প্রশিক্ষণ। এই হিসাবটি যদি সত্য হয় তা হলে এর সরল অর্থ অনুযায়ী প্রতি উপজেলায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মীদের সংখ্যা দাঁড়ায় গড়ে ৫০ জন অর্থাৎ কোন উপজেলাতেই কোন অপ্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মী না থাকারই কথা । অথচ এই পরিকল্পনাবিদরাই স্থানীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এই পর্যায়ের কর্মীদের অপর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা, অদক্ষতা এবং অক্ষমতাকে দায়ী করেছেন । তাহলে সহজেই অনুমান করা যায় যে, উক্ত হিসেবটি অতিরঞ্জিত করে দেখান হয়েছে অথবা প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তুর মধ্যে কিংবা প্রশিক্ষকদের দক্ষতার মধ্যে মারাত্মক ধরনের গলদ রয়েছে ।

এই গলদ অন্যভাবেও থাকতে পারে । এই প্রবন্ধে অন্যান্য মানুষের বিভিন্ন দিক উন্নয়নের কথা বলতে গিয়ে তাদের নৈতিক উন্নয়নের ওপরও গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে । বলা বাহুল্য, পরিকল্পনাবিদদের কাছে এটিও কোন নতুন কথা নয় । যথাঃ "For Bangladesh particularly, morality should be considered as an essential input for development. Though invisible, it is the only element which can stop leakage and ensure effective utitisation of visible

development inputs." [১০;৩৫১] । তবে হাসি পায় তাঁদের উক্ত চিন্তা ধারা বাস্তবায়নের কৌশল দেখে। তাঁরা মনে করেন, জনগণের নৈতিকতা উন্নয়নের মূল বাহন হচ্ছে দেশের সর্বত্র ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন করা, মসজিদে মসজিদে পাঠাগার গড়ে তোলা, বায়তুল মোকাররমে মিনার তৈরী করা এবং সর্বোপরি ইমামদের কয়েক সপ্তাহ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা [১০;৩৫২-৩] । আসলে কি তাই ? এ সবের সংশ্লিষ্ট লোকজন কি বাস্তবিকই অধিকতর হারে নৈতিকতা বিরোধী কাজে লিপ্ত ? কি করা হচ্ছে তাদের নৈতিকতা উন্নয়নের ব্যাপারে যারা সরকারী ঋণ নেয়া ও দেয়ার কাজে লিপ্ত ? যাঁরা উৎপাদনমূলক কাজে ঋণ নিয়ে অনুৎপাদন কাজে ব্যয় করছেন ? যাঁরা ঋণ নিয়ে ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ফেরৎ দিতে অনীহা প্রকাশ করছেন ? যাঁরা সরকারী টাকা লুটে নিয়ে সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলছেন ? সমস্ত সমস্যার গোড়া এখানেই । ইসলাম ধর্মকে যেমন আজ মসজিদের ভেতর কিংবা দু-চারটা ইসলামী নামের সংস্থার মধ্যে আটকিয়ে রাখার অপচেষ্টা করা হচ্ছে, ঠিক তেমনি গাছের গোড়া বাদ দিয়ে অন্যত্র পানি ঢেলে গাছ বাঁচানোর কথা মহা সোরগোল করে সবাইকে অবহিত করা হচ্ছে। দারিদ্র্য নিরসনের নিরিখে পল্লী উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণের ক্ষেত্রে আমরা উপরোক্ত বক্তব্যটির অন্তর্নিহিত সত্য যত তাড়াতাড়ি উপলব্ধি করতে পারব ততই মংগল ।

গ্রন্থপঞ্জী

1. Ahmed, Q.K. and M. Hossain : An Evaluation of Selected Policies and Programmes for the Alleviation of Rural Poverty in Bangladesh, In Strategies for Alleviating Poverty in Rural Asia, Edited by R. Islam, BIDS, Dhaka and ARTEP, Bangkok, 1985.
2. Ahmed, R. : Foodgrain Supply, Distribution and Consumption Policies within a Dual Pricing Mechanism; A Case Study of Bangladesh, Research Report No. 8. IFPRI, Washington D.C, USA, 1979.
3. Alamgir, M. : The Experiences of Rural Works Programme (RWP) in Bangladesh, Institute for International Economic Studies, Stockholm, 1977.
4. Ali, A.K.M. Shawkat : Role of BKB in Rural Development, Inaugural Address at the Seminar Organised by RDA, Bogra, May 1986.
5. Planning Commission : The First Five Year Plan, 1973-78, Government of Bangladesh, Dhaka, 1973.
6. World Bank : Bangladesh : Current Trends and Development Issues, 1979.
7. Bangladesh Bureau of Statistics : Statistical Year Book, 1981, Government of Bangladesh, Dhaka, 1981.
8. Bangladesh Bureau of Statistics : Statistical Year Book of Bangladesh, 1982, Government of Bangladesh, Dhaka, 1982.
9. World Bank : Bangladesh Bank and Bangladesh Economic and Social Development Prospects, Report No. 5409, 1985.
10. Planning Commission : The Third Five Year Plan, 1985-90, Government of Bangladesh, Dhaka, 1985.
11. Bangladesh Bureau of Statistics : The Bangladesh Census of Agriculture Livestock : 1983-84. Vol. 1, Structure of Agricaltural Holdings and Livestock Population, Government of Bangladesh, Dhaka, 1986.

12. Grameen Bank : Monthly Report, February, 1987.

13. Hamid. M.A. : Irrigation Development in Bangladesh : Achievements, Potential and Constraints, In Resources, Environment and Economic Development, ICIOS—II, Perth, Western Australia, 1984.

14. Grameen Bank in Bangladesh. Is it an Anti-Poverty Programme, COMMERCE (Weekly), November, Bombay, India, 1986.

15. Hamid M.A : And Spend Out of What We Have Provided for Them : Its Significance in Dealing with Economic Inequality in Bangladesh, Presented at the National Seminar on Distribution of Wealth and Income in Islam, Organised by IERB, Dhaka, April, 1987.

16. Hamid, M.A. et al : Integrated Rural Development Programme : An Evaluation of Natore and Gaibandha Projects, Department of Economics, Rajshahi University, Rajshahi, 1975.

17. Hamid M.A. et al : Shallow Tube-wells Under IDA Credit in North West Bangladesh : An Evaluation Study, Rural Development Studies Series No. 10, Department of Economics, Rajshahi University, Rajshahi, 1982.

18. Hamid M.A. et al : Survey on Privatization of Repair and Maintenance Facilities for Irrigation, Rural Development Studies Series No. 13, Department of Economics, Rajshahi University, Rajshahi, 1984.

19. Hamid M.A. : Low Lift Pump Under IDA Credit in South East Bangladesh, Rural Development Studies, Series No. 12, Deparment of Economics, Rajshahi University, Rajshahi, 1984.

20. Haq, Ataul. : Public Expenditure Policies and Regional Distribution in Bangladesh, The Bangladesh Journal of Political Economy, Regional Development Seminar, Rajshahi University, 1984.

21. Hoque, A, and Islam T.S. : Regional Disparity in Investment in Human Capital : The Case of University Education, The Bangladesh Journal of Political Economy, Regional Development Seminar, Rajshahi University, 1984.

22. Hossain, M. : Institutional Credit for Rural Development : An Overview of the Bangladesh Case, The Bangladesh Journal of Agricultural Economics, Dhaka, 1985.

23. Islam, R, : Foodgrain Procurement, Input Subsidy and the Public Food Distrbution System in Bangladesh : An Analysis of the Policy Package, The Bangladesh Development Studies, Winter— Summar, Dhaka, 1980.

24. Islam R. : Strategies for Alleviating Poverty in Rural Asia, in Strategies for Alleviating Poverty in Rural Asia, Edited by R, Islam, BIDS, Dhaka and ARTEP, Bangkok, 1985.

25. Yunus, M. : Rural/Agricultural Credit Operation in Bangladesh, The Bangladesh Journal of Political Economy, Conference Issue, Dhaka, 1981.

উত্তর-পশ্চিম বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে শিক্ষা উন্নয়নে আঞ্চলিক বৈষম্য ঃ একটি অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ

শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান *
মুহম্মদ রফিকুল ইসলাম *

ভূমিকা

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষা উন্নয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রসংগ। বিশেষজ্ঞদের মতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। শিক্ষা জনশক্তির দক্ষতা বৃদ্ধিতে শুধু সহায়কই নয়, সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে জনগনের কাছে বোধগম্য করে তুলতে এবং উন্নয়নের কর্মধারায় প্রাণশক্তির সঞ্চার করতে এর চেয়ে শ্রেষ্ঠতর উপকরন আর নেই। জনশক্তির যে অংশ শিক্ষার আলোক হতে বঞ্চিত, স্বাভাবিক কারণেই সেই অংশ শিক্ষা-কৃষি-বাণিজ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে যথাযোগ্য ভূমিকা রাখতে বা কার্যকর অংশগ্রহনে অক্ষম। পক্ষান্তরে যারা শিক্ষিত, বিশেষতঃ পেশাগত দক্ষতা অর্জন করেছে তারা যে কোন ধরণের কর্মসংস্থান মূলক তৎপরতায় অংশ গ্রহনে সক্ষম। এই প্রেক্ষিতে দ্ব্যর্থহীন ভাবেই বলা যায়, যে কোন দেশের যে অঞ্চলের জনগন যত বেশী শিক্ষিত এবং পেশাগত প্রশিক্ষণ লাভের যত বেশী সুযোগ তাদের জন্যে উন্মুক্ত তারা তত বেশী কর্মসংস্থান লাভের সুযোগ পায় এবং স্বভাবতঃই জাতীয় আয়ে তাদের অংশ থাকে তুলনামূলকভাবে যথেষ্ট বেশী।

বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে এ সত্য যে কত বড় বাস্তব তার প্রকৃষ্ট নজীর দেশের উত্তর-পশ্চীমাঞ্চল। এই অঞ্চলের মধ্যে রয়েছে সাবেক বৃহত্তর রাজশাহী,রংপুর,বগুরা, দিনাজপুর ও পাবনা জেলা। দেশের মোট জনসংখ্যার ২৪% বাস করে এই অঞ্চলে। পক্ষান্তরে জনসংখ্যার ৫০% বাস করে দেশের পূর্বাঞ্চলে। শিক্ষা খাতে দেশের পূর্বাঞ্চলে সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ ১৯৭৭-৭৮ সালে ছিল মাথাপিছু টাকা ৩.৫০, অথচ একই সময়ে আলোচ্য অঞ্চলে এই ব্যয়ের পরিমাণ ছিল মাথাপিছু মাত্র টাকা ০.৯০। এর ফলে এ অঞ্চলে শিক্ষার সুযোগ যে সংকুচিত এবং ফলশ্রুতিতে কর্মসংস্থানের পরিমাণও যে তুলনামূলকভাবে কম জাতীয় আয়ের দিকে তাকালেই তা পরিষ্কার উপলব্ধি হয়। ১৯৮২ সালে এই অঞ্চলে মাথাপিছু আয় ছিল জাতীয় গড়ের তুলনায় ১০% কম। শিক্ষার ক্ষেত্রে বিদ্যমান বৈষম্যের জন্যেই যে এই অবস্থা তা বলাই বাহুল্য।

---

* অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

শিক্ষা ও জনশক্তি উন্নয়নে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এদেশে দীর্ঘকাল ধরে যে আঞ্চলিক বৈষম্য চলেছে সে বিষয়েই বক্ষ্যমান প্রবন্ধে সমীক্ষার চেষ্টা করা হয়েছে । দেশের চারটি বিভাগ বা অঞ্চলের মধ্যে রাজশাহী বিভাগ বা দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল অপেক্ষা পূর্বাঞ্চল বা ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ যে শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ ও বাড়তি সুযোগ পেয়ে আসছে সে বিষয়ে ইতিমধ্যেই কোন কোন আলোচনায় দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত হয়েছে [৮] । দেশের বিভাগ চতুষ্টয়ের মধ্যে রাজশাহীই তুলনামূলক ভাবে অনুন্নত । অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে এই বিভাগ যেমন সব সময়ে সর্বাপেক্ষা কম সরকারী সহায়তা পেয়েছে শিক্ষার ক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি । অর্থ-বিনিয়োগ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি ও সংখ্যা এবং শিক্ষক-ছাত্রের অনুপাতের সাহায্যে এই বক্তব্যই সপ্রমাণের চেষ্টা করা হয়েছে পরবর্তী আলোচনায় তিনটি অংশে বিভক্ত প্রবন্ধের প্রথম অংশে দেশের বিদ্যমান শিক্ষা পদ্ধতির আলোচনা রয়েছে । দ্বিতীয় অংশে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সাথে এই বৈষম্যের তুলনা করা হয়েছে প্রধানতঃ পরিসংখ্যান তথ্যের ভিত্তিতে । সব শেষে রয়েছে অনুসৃতব্য সুপারিশ মালা ।

শিক্ষার স্তরের শ্রেণী বিন্যাস

এদেশের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা পদ্ধতিকে প্রধানতঃ চারটি বড় ভাগে ভাগ করা যেতে পারে । যথা-- প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর । স্নাতক পর্বেই যেহেতু পেশাগত ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার শুরু সেহেতু এই স্তরকে কয়েকটি সমান্তরাল পর্বে বিন্যাস করা যায় । যথা-- প্রকৌশল, চিকিৎসা, কৃষি, বাণিজ্য, আইন, শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং বিশেষ বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ। এই সকল ধরনের শিক্ষার ক্ষেত্রেই উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল দেশের বাকী অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষা অনেক বেশী পশ্চাৎপদ । তার মূখ্য কারণ শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা এখানে আশানুরূপ সম্প্রসারিত হয়নি । উপরন্তু সংখ্যা সাম্যের প্রতি নজর দিয়ে বিভিন্ন ধরনের বৃত্তিমূলক বা পেশাদারী শিক্ষার প্রতিষ্ঠানও এ অঞ্চলে স্থাপিত হয়নি ।

এমনিতে বিদ্যমান ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত দূর্বলতা মারাত্মক সামাজিক ভারসাম্য হীনতার সৃষ্টি করেছে । এর জন্যে তৃতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় যে সমস্ত কারণকে দায়ী বলে চিহ্নিত করা হয়েছে সে সবের মধ্যে রয়েছে ঃ (ক) শিক্ষিত এবং অশিক্ষিতের মধ্যে বিরাজমান দুস্তর ব্যবধান । ১৯৬১ সালে দেশের শিক্ষিতের হার ছিল ১৭.০% । দুই দশকে বৃদ্ধি পেয়ে এই হার ১৯৮১ সালে দাঁড়িয়েছে ১৯.৭%-এ; (খ) উদার শিক্ষা গ্রহণকারী লোকের সংখ্যা বেড়েছে বিপুল ভাবে, অথচ দক্ষ জনশক্তির তীব্র সংকট বিরাজমান; (গ) শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যেও শিক্ষিতের হারের ব্যবধান দুস্তর । ১৯৮১ সালের শুমারী অনুযায়ী শহরাঞ্চলের শিক্ষিতের হার ছিল ৩৫.০%, পক্ষান্তরে গ্রামাঞ্চলে এই হার ছিল জাতীয় হারেরও নীচে--মাত্র ১৭.০% ।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে এই বৈষম্য বিচার করলে যে ফলাফল পাওয়া যাবে তা আরও হতাশাব্যঞ্জক । এই সংগে যদি উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের সাথে দেশের সামগ্রিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের তুলনা করা হয় এবং সেই নিরিখে আলোচ্য অঞ্চলের শিক্ষিতের হার বিবেচনা করা হয় তা হলে যে চিত্র পাওয়া যাবে তা আরও নৈরাশ্যজনক ।

সারণী-১

জনসংখ্যার ঘনত্ব (প্রতি বর্গ মাইলে)

বছর	বাংলাদেশ	উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল
১৯৫১	৭৬১	৭১৩
১৯৬১	৯২২	৯৪২
১৯৭৪	১,২৮৬	১,২৯৭
১৯৮১	১,৫৬৭	১,৫৯৮

উৎস ঃ [৬ ; ৬৩]

সারণী-১ এ বিভিন্ন আদমশুমারীতে ১৯৫১ হতে ১৯৮১ পর্যন্ত বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের জনসংখ্যার ঘনত্ব বৃদ্ধির সাথে সমগ্র দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনা দেখানো হয়েছে । দেখা যাবে শুধুমাত্র ১৯৫১ সালের শুমারী ছাড়া পরবর্তী সকল শুমারীতেই গোটা দেশের তুলনায় এই এলাকার জনসংখ্যা বৃদ্ধির ঘণত্ব ক্রমশঃই বৃদ্ধি পেয়েছে ।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈষম্য

শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনার ক্ষেত্রে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসংগই সর্বাগ্রে গণ্যতার দাবী রাখে। এক্ষেত্রে স্কুলের সংখ্যা, ছাত্রবৃদ্ধির হার এবং শিক্ষকের সংখ্যার তুলনার দ্বারা এই স্তরে কী হারে বা কীভাবে শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাচ্ছে তা সহজেই নিরুপণ করা যায় । সারণী-২ এ ১৯৮৩-৮৪ সালে অঞ্চল ভিত্তিক সরকারী মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা ও শিক্ষকের সংখ্যা দেখানো হয়েছে ।

সারণী-২

এলাকা ভিত্তিক সরকারী মাধ্যমিক স্কুল ও শিক্ষকের বিবরণ, ১৯৮৩-৮৪

এলাকা	স্কুলের সংখ্যা	শিক্ষকের সংখ্যা
চট্টগ্রাম	৪৮(২৪.৭৪%)	৯০৭(২১.৬৭%)
ঢাকা	৭৪(৩৮.১৪%)	১,৬৪১(৩৯.২১%)
খুলনা	৩৪(১৭.৫৩%)	৭৯০(১৮.৮৮%)
রাজশাহী	৩৮(১৯.৫৯%)	৮৪৭(২০.৩৪%)

উৎস ঃ [৬ ; ৭৪০-১]

উপরের সারণীতে দেখা যাচ্ছে মোট সরকারী মাধ্যমিক স্কুলের প্রায় ৬৩% ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগে অবস্থিত । পক্ষান্তরে খুলনা ও রাজশাহী বিভাগে এই পরিমাণ মাত্র ৩৭% যদিও এই দুই অংশের জনসংখ্যা দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক । শিক্ষকের সংখ্যা সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য । তবে কলেজ পর্যায়ের শিক্ষার ক্ষেত্রে এ জাতীয় বৈষম্য তেমন লক্ষ্য করা যায় না । কিন্তু তার কারণ ভিন্নতর । সারণী—৩ হতে কলেজ পর্যায়ের শিক্ষার একটা চিত্র পাওয়া যাবে ।

সারণী-৩

এলাকা ভিত্তিক কলেজের ছাত্র ও শিক্ষকের বিবরণ, ১৯৮৩-৮৪

এলাকা	কলেজের সংখ্যা		শিক্ষকের সংখ্যা		ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা	
	সরকারী	বেসরকারী	সরকারী	বেসরকারী	সরকারী	বেসরকারী
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
চট্টগ্রাম	৩১	১১০	১৪২৯	১৮৯৯	২৬,২০৯	৬৪,৮১৭
ঢাকা	৩৩	১৬৪	১১৩৫	২৭৪২	৩৬,১৭৯	৭৭,০৮৪
খুলনা	২৫	১১১	১০৩৭	১৯৬৮	৩৪,৬৫৮	৮০,১০২
রাজশাহী	৩৩	১৪৯	১৩৫৭	২৪২৪	৩১,৯৫০	৬৫,৭৭৮

উৎস ঃ [৬ ; ৭৩২]

উপরের সারণীতে ১৯৮৩-৮৪ সালে বাংলাদেশের এলাকা ভিত্তিক সরকারী ও বেসরকারী কলেজের সংখ্যা, ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা এবং শিক্ষক/শিক্ষিকার বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে । সারণীটিতে দেখা যাচ্ছে, খুলনা বিভাগ ছাড়া অন্যান্য বিভাগের সরকারী কলেজ, ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা এবং শিক্ষকের সংখ্যা প্রায় সমান । দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে সরকারী কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধির পশ্চাতে অর্থনৈতিক বা সামাজিক কারণ অপেক্ষা রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের উদ্দেশ্যই অধিক কার্যকর । বিভিন্ন সময়ে ক্ষমতাসীন মহলের পক্ষ হতে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্যে জনসমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে রাতারাতিই বহু কলেজকে "জাতীয়করণ" করা হয়েছে । বিশেষতঃ গত দুই-তিন বছরে এই হার অতি দ্রুত সম্প্রসারিত হয়েছে এবং ফলে শিক্ষার মান যে উঁচু হয়েছে কিংবা ঐসব কলেজে ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা বেড়েছে তার কোন প্রমাণ নেই ।

পেশাদারী ও বৃত্তিমূলক কলেজ বা ইনষ্টিটিউটের ক্ষেত্রে এই চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্নতর । প্রকৌশল, চিকিৎসা, বাণিজ্য, কৃষি প্রভৃতি বিষয়ের কলেজ এবং বিশেষ ধরনের পেশায় প্রশিক্ষণ ও ভকেশনাল ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট প্রভৃতি ক্ষেত্রে আলোচ্য অঞ্চল যে কত পশ্চাৎপদ তথা সরকারী "নেক নজর" হতে বঞ্চিত নীচের সারণী হতে তা সহজেই উপলব্ধি হবে ।

সারণী—৪

পেশাদারী ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কলেজ/ইনষ্টিটিউটের বিবরণ

কলেজ/ইনষ্টিটিউট	বাংলাদেশ		উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল	
	১৯৭৫	১৯৮৫	১৯৭৫	১৯৮৫
১. চিকিৎসা	৮	১০	১	২
২. আইন	২২	২৭	৫	৮
৩. প্রকৌশল	৩	৪	১	১
৪. বাণিজ্য	২	২	–	–
৫. কৃষি	১	১	–	–
৬. চারু ও কারুকলা	১	২	–	১
৭. হোম ইকনমিক্স্	১	১	–	–
৮. গ্রাফিক আর্টস	১	১	–	–
৯. লেদার টেকনোলজী	১	১	–	–
১০. টেক্সটাইল টেকনোলজী	১	১	–	–
১১. গ্লাস ও সিরামিক	১	১	–	–
১২. শরীর চর্চা প্রশিক্ষণ	১	২	–	১
১৩. শিক্ষক প্রশিক্ষণ	৬	১০	১	২
১৪. প্রাথমিক প্রশিক্ষণ	৪৭	৪৭	১২	১২
১৫. পলিটেকনিক	১৭	১৭	৫	৫
১৬. ভকেশনাল প্রশিক্ষণ	২৩	৫৪	৯	১৩
১৭. হোমিওপ্যাথি	১৬	২১	৫	৭
১৮. ইউনানী ও তিব্বিয়া চিকিৎসা	১	১	–	–

উৎস ঃ [৬,৩] এবং সংশ্লিষ্ট কলেজ ও ইনষ্টিটিউট সমূহের অধ্যক্ষ ও অধিকর্তাগণ।

সারণী—৪ হতে লক্ষ্য করা যাবে যে, প্রকৌশল, চিকিৎসা, আইন, শিক্ষক-প্রশিক্ষণ, প্রাথমিক প্রশিক্ষণ, ভকেশনাল্ প্রশিক্ষণ, হোমিওপ্যাথি ও পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউটের ক্ষেত্রে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের সংগত হিস্সা রয়েছে। তাও ১৯৮৫ সালের হিসাব অনুসারে। ১৯৭৫ সালের চিত্রটি অনেকখানি নিষ্প্রভ। অপর দিকে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৃত্তিমূলক বা পেশাদারী প্রশিক্ষণ লাভের সুযোগ এই অঞ্চলে আদৌ নেই। এসবের মধ্যে রয়েছে কৃষি, বাণিজ্য, লেদার টেকনোলজী, টেকসটাইল টেকনোলজী, গ্লাস

ও সিরামিক টেকনোলজী, গ্রাফিক আর্টস, হোম ইকনমিক্স্, ইউনানী ও তিব্বিয়া চিকিৎসা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ।

প্রসংগত উল্লেখযোগ্য, দেশে উদার শিক্ষা ব্যবস্থার আওতায় শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও তাদের ক্ষেত্রেই বেকারত্বের হার সব চেয়ে বেশী । অথচ দক্ষ জনশক্তির অভাব আমাদের দেশে তীব্র। আন্তর্জাতিক নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রতি জন প্রকৌশলীর জন্যে পাঁচ জন টেকনিশিয়ান ও পনের জন দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন হয় । বাংলাদেশে এর বর্তমান অনুপাত ২:১:৩ ।সুতরাং দক্ষ শ্রমিকের অভাব যে খুবই প্রকট তা সহজেই অনুমেয় । বাংলাদেশে কারিগরী শিক্ষার যে সীমিত সুযোগ রয়েছে তাও নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত । এ কারণেই দক্ষ জনশক্তি কাংখিত মাত্রায় তৈরী হচ্ছে না [৪ ;৩১] । দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ক্ষেত্রে একথা যে কত বেশী সত্য এবং এর তাৎপর্য যে কত সুদুর প্রসারী উপরের সারণীর আলোকে তা বোঝা মোটেই দুরুহ নয় ।

শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে সরকারী ব্যয়ের গতি প্রকৃতিও বিশেষ মনোযোগের দাবী রাখে। এ সম্পর্কে একটা সুষ্ঠু ধারণা পাওয়া যাবে সারণী—৫ হতে ।

সরণী—৫
শিক্ষা খাতে সরকারী ব্যয়

(কোটি টাকায়)

প্রতিষ্ঠান	১৯৬৭-৬৮	১৯৮২-৮৩
বিশ্ববিদ্যালয়	৫.৪২ (২২.৬৩%)	৩৬.০০ (১৩.৯৯%)
কলেজ	২.৩৫ (৯.০০%)	২৭.৬১ (১০.৭৩%)
মাধ্যমিক স্কুল	৬.০৬ (২৫.২৪%)	৫১.৬৯ (২০.০৯%)
প্রাথমিক স্কুল	১০.১৫ (৪২.৩৩%)	১৪২.০০ (৫৫.১৯%)

উৎস ঃ [৬; ৫০৩-৪]

উপরের সারণী হতে দেখা যাবে, ১৯৬৭-৬৮ সালে শিক্ষা খাতে মোট সরকারী ব্যয়ের ৩২.০০% এর মত ব্যয় হয়েছে উচ্চ শিক্ষার জন্যে (কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সহ)। পক্ষান্তরে ১৯৮২-৮৩ সালে সেই পরিমাণ কমে এসে দাঁড়িয়েছে ২৪.৭২% এ । উপরন্ত ১৯৬৭-৬৮ সালে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ সরকারী ব্যয়ের ২২.৬৩% পেয়েছিল, কিন্তু ১৯৮২-৮৩ সালে তার পরিমাণ কমিয়ে আনা হয়েছে ১৩.৯৯% এ । এর মধ্যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশ– যেটি উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়-- যে কত নগণ্য তা সহজেই অনুমেয় । এ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানা যাবে সারণী—৭ হতে । মাধ্যমিক পর্যায়েও সরকারী ব্যয়ের হ্রাস ঘটেছে । বিগত পনের বছরে এই হ্রাসের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫.০০% এরও বেশী । আলোচ্য সারণী এবং বাংলাদেশ সরকারের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় শিক্ষাখাতে সরকারী বরাদ্দের

পরিমাণ থেকে এটা সুস্পষ্টতঃই প্রমাণ হয় যে, মাধ্যমিক শিক্ষাসহ উচ্চ শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্যে সরকারী ভূমিকা নেতিবাচক ।

উচ্চতর শিক্ষা, বিশেষতঃ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে আলোচ্য এলাকার অবস্থা যে আরও নাজুক সে বিষয়ে ইতিপূর্বেই ইংগিত করা হয়েছে । বাংলাদেশের মোট ছটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে পাঁচটিই দেশের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত । রাজশাহী ও খুলনা বিভাগের জন্যে উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ই সবেধন নীলমণি। দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বশীল এই বিদ্যাপীঠও সাংঘাতিকভাবে অবহেলিত । উদাহরণ স্বরূপ সারণী—৬ এ দেশের ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-ছাত্রের অনুপাত দেখানো হয়েছে ।

সারণী—৬

বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে শিক্ষক-ছাত্রের অনুপাত

বিশ্ববিদ্যালয়	১৯৭৩	১৯৭৭	১৯৭৯	১৯৮৩
ঢাকা	১ঃ১৮	১ঃ১৫	১ঃ১৪	১ঃ১৪
জাহাংগীর নগর	১ঃ৭	১ঃ৮	১ঃ৭	১ঃ৮
চট্টগ্রাম	১ঃ১৩	১ঃ১১	১ঃ১৩	১ঃ১৩
বাংলাদেশ কৃষি	১ঃ৯	১ঃ৫	১ঃ৬	১ঃ১০
বাংলাদেশ প্রকৌশল	১ঃ৮	১ঃ৭	১ঃ১০	১ঃ১০
রাজশাহী	১ঃ২৫	১ঃ২১	১ঃ১৯	১ঃ২২

উৎস ঃ [২]

উপরের সারণীতে দেখা যাবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়েই শিক্ষক-ছাত্রের অনুপাত সবচেয়ে কম । ১৯৭৩ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন প্রতি পঁচিশ জন ছাত্র/ছাত্রীর জন্যে একজন শিক্ষক ছিলেন তখন জাহাংগীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি সাতজন ছাত্র/ছাত্রীর জন্যেই একজন করে শিক্ষক ছিলেন । একই সময়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এই অনুপাত ছিল ১ঃ১৩ । দীর্ঘ এক দশক পরেও এই অবস্থার তেমন কোন উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়নি । ১৯৮০ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক/ছাত্রের অনুপাত ১ঃ২২ যখন জাহাংগীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ে এই অনুপাত ১ঃ৮ এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্বের অনুপাতই বহাল রয়েছে । ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই অনুপাত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে অনেক উন্নত । কৃষি ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসংগ না তোলাই উত্তম । এই আলোচনার সরলার্থ দাঁড়ায় পশ্চিমাঞ্চলের একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়টিতে যখন শিক্ষক সম্পদকে মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার করা হচ্ছে সেই সময়েই দেশের অন্য বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে এই সম্পদকে ক্ষমতার তুলনায় কম ব্যবহার করা হচ্ছে। অন্য কথায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রীরা শিক্ষকদের নিকট হতে সর্বাধিক উপযোগ প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত হচ্ছে। উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে এই বৈষম্য অপনোদনের যে কার্যকর প্রচেষ্টা

চালানো হয়েছে এমনও নয়। ফলশ্রুতিতে এই অঞ্চলের শিক্ষার মান উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে যে প্রতিকূল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে তার ধারা অব্যাহত রয়েছে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারের বৈষম্যমূলক আচরণ আরও পরিস্ফুট হয়ে উঠবে যদি বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে শিক্ষার্থী পিছু বার্ষিক পৌনঃপুনিক ব্যয় বিশ্লেষণ করা হয়। সারণী—৭ এ সন্নিবেশিত তথ্য হতে দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৮৪ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে শিক্ষার্থী পিছু বার্ষিক পৌনঃপুনিক ব্যয় সবচেয়ে কম (টাকা ৭,২১৩/-)। অথচ জাহাংগীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ব্যয় ছাত্র পিছু টাকা ২৪,২০০/- যা কিনা পূর্বোক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে তিন গুণেরও বেশী। ১৯৭৪ সাল থেকে ১৯৮৪ পর্যন্ত দীর্ঘ দশ বছরের কোন সময়েই এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে এই পার্থক্য দ্বিগুণ, এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে দেড়গুণ বা তার কাছাকাছি।

সারণী—৭

বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে শিক্ষার্থী পিছু বার্ষিক পৌনঃপুনিক ব্যয়

বিশ্ববিদ্যালয়	১৯৭৪	১৯৭৭	১৯৮০	১৯৮৪
ঢাকা	২,২২৫	৪,১৭৪	৫,৬৯৪	১০,৬৬৬
জাহাংগীরনগর	৭,২২৮	১০,৮৬৩	১৬,১৯১	২৪,২০০
চট্টগ্রাম	৩,৩৮৬	৬,৯৬৮	৭,১৯২	১১,৩৭৯
বাংলাদেশ কৃষি	৬,০৩০	১৫,১৮৮	১৪,৮৯০	২৪,০৫৯
বাংলাদেশ প্রকৌশল	৫,৩২৬	৯,১২৫	১০,৭৩৭	১৮,৪০৯
রাজশাহী	২,১৯৫	৩,৭৭৮	৪,৬৫২	৭,২১৩

উৎস ঃ [২]

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের মত প্রতিষ্ঠানও বিশ্ববিদ্যালয় ভিত্তিক অর্থ বন্টনে আঞ্চলিক বৈষম্য পরিহার করতে ব্যর্থ হয়েছে, এই লজ্জা রাখার জায়গা কোথায় ? যদি মোট বন্টনকৃত অর্থ বিশ্ববিদ্যালয় ভিত্তিক বিচার না করে আঞ্চলিক ভিত্তিতে বিচার করা হয় তাহলে দেখা যাবে পূর্বাঞ্চাল ও পশ্চিমাঞ্চলের অনুপাত দাঁড়িয়েছে ১০ঃ১। অর্থাৎ, পূর্বাঞ্চলের শতকরা পঞ্চাশ জন লোকের জন্যে যখন দশ টাকা ব্যয় করা হচ্ছে তখন দেশের বাকী পঞ্চাশ জন লোকের (খুলনা ও রাজশাহী বিভাগ একত্রে) জন্যে ব্যয় করা হচ্ছে মাত্র এক টাকা। কিন্তু নগ্ন বাস্তবতা হলো উত্তর-পশ্চিম এলাকার জন্যে (যেখানে জনসংখ্যার ২৪% লোক) উচ্চ শিক্ষার খাতে এক টাকা ব্যয় করা হলেও দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের (খুলনা বিভাগের) জন্যে আদৌ কোন টাকাই ব্যয় করা হয়নি। প্রসংগতঃ সমর্তব্য, দীর্ঘদিন ধরে খুলনা বিভাগে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্যে ক্রমাগত চাপ ও চেষ্টা অব্যাহত থাকা সত্বেও আজ অবধি কার্যকর ইতিবাচক ফলোদয় ঘটেনি।

অনুসৃতব্য পদক্ষেপ

পূর্ববর্তী আলোচনা হতে সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যে, জনশিক্ষা বিস্তারের এবং জনশক্তি উন্নয়নের ক্ষেত্রে দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল নিদারুণ ভাবে অবহেলিত ও পশ্চাৎপদ। এই অবস্থা আরও চলতে দেয়া সমীচিন নয়। ইতিমধ্যেই যে ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি হয়েছে তার ফল মোটেই শুভ নয়। সুতরাং, কার্যকর ভাবে এই বৈষম্য দূর করতে হলে প্রয়োজন সুচিন্তিত, দীর্ঘ মেয়াদী ও পরিকল্পিত পদক্ষেপ। যেসব পদক্ষেপ বা কর্মসূচী গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় সেগুলি সম্পর্কে নীচে সংক্ষেপে আলোকপাতের চেষ্টা করা গেল।

ক) প্রথমেই যে পদক্ষেপটি গ্রহণ করা দরকার তা হ'ল এই অঞ্চলে শিক্ষা খাতে সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি। এ ক্ষেত্রে পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলের ব্যয়ের বিদ্যমান অনুপাত অবশ্যই কমিয়ে আনতে হবে। এ জন্যে প্রতিষ্ঠানিক অবকাঠামো গড়ে তোলা ছাড়াও ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানগুলির সংস্কার, প্রয়োজনীয় সম্প্রসারণ এবং পাঠদানে সহায়ক উপকরণ সমূহের যোগান নিশ্চিত করতে হবে। ছাত্রাবাস গড়ে তুলতে হবে এবং শিক্ষক সংখ্যা বৃদ্ধির বাস্তব কর্ম কৌশল গ্রহণ করতে হবে।

খ) এই অঞ্চলের জনগণ তথা শিক্ষার্থীদের জনশক্তিতে রূপান্তরিত করতে এবং প্রকৃতই কর্ম সংস্থানমুখী করে গড়ে তোলার স্বার্থে সাধারণ উদার শিক্ষা সম্প্রসারণ অপেক্ষা বিভিন্ন পেশা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণের উপায় আরও উদার ও সুগম করতে হবে। সারণী—৪ হতে দেখা যাবে এই জাতীয় সুযোগ হতে এ অঞ্চল নিদারুন ভাবে বঞ্চিত। এই বঞ্চনা দূর করার স্বার্থে এবং জাতীয় আয়ে এই অঞ্চলের অবদান বৃদ্ধির জন্যে যেসব পদক্ষেপ গৃহীত হওয়া উচিৎ সে সবের মধ্যে থাকবে ঃ

১) বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব টেকনোলজী (সাবেক প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়), রাজশাহীর মান ও সুযোগ আরও সম্প্রসারণ করা, আসন সংখ্যা বৃদ্ধি সহ বিভিন্ন বিভাগ চালু করা এবং একই সংগে বগুড়া/রংপুরে আরও একটি সমমানের ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা ;

২) এই অঞ্চলে কৃষি কলেজের অভাব দূর করার জন্যে অবিলম্বে বৃহত্তর পাবনা, রাজশাহী বা দিনাজপুরের কোন এলাকায় পশু সম্পদের উপর প্রশিক্ষণের সুযোগসহ একটি কৃষি কলেজ প্রতিষ্ঠা করা ;

৩) দেশের ক্রমপ্রসারমান ব্যবসা বাণিজ্যের জন্যে যে পরিমাণ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বাণিজ্য গ্রাজুয়েট প্রয়োজন এই অঞ্চল তার সামান্য ভগ্নাংশই মাত্র যোগান দেবার সুযোগ পায়। এই অবস্থা নিরসনের এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্যে একটি বাণিজ্য মহাবিদ্যালয় স্থাপন করা ;

৪) ঢাকাস্থ গ্রাফিক আর্টস ইনষ্টিটিউট, লেদার টেকনোলজী, টেকসটাইল টেকনোলজী, গ্লাস এ্যান্ড সিরামিক টেকনোলজী প্রভৃতি বিষয়ক কলেজে এই অঞ্চলের ছাত্র/ছাত্রীদের জন্যে সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা করা ;

৫) শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ, হোমিওপ্যাথি কলেজ, ভকেশনাল প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট প্রভৃতির সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করার বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ ; এবং

৬) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরুপ প্রশাসন ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠানসহ অনতিবিলম্বে অন্যান্য বিভাগ (যেমন--- সাংবাদিকতা, মৃত্তিকা বিভাগ, পুষ্টি বিজ্ঞান) চালু করা ।

গ) সর্বোপরি খুলনাতে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়টি ত্বরিৎ প্রতিষ্ঠা করে এই অঞ্চলের উপর চাপ হ্রাসের জন্যে সকল মহলের তৎপরতা চালানো প্রয়োজন । এর ফলে এই এলাকায় সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধির মাধ্যমে শিক্ষা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও ভারসাম্য সৃষ্টি হবে ।

উপরের পদক্ষেপগুলি একই সংগে বা এক বছরেই বাস্তবায়িত হতে হবে এমন দাবী করা অযৌক্তিক । কিন্তু আগামী পাঁচ বছরের মধ্যেই পর্যায়ক্রমে এবং ক্ষেত্র বিশেষে যুগপৎ এই সব পদক্ষেপ বাস্তবায়িত হওয়া জরুরী । অন্যথায় বিদ্যমান বৈষম্যই শুধু বৃদ্ধি পাবে না, আর্থ-সামাজিক দিক দিয়ে এই এলাকা যে পশ্চাৎপদ রয়েই যাবে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই ।

উপসংহার

নাতিদীর্ঘ এই আলোচনায় বাংলাদেশের বর্তমান প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় বিদ্যমান স্তরের শ্রেণী বিন্যাস হতে শুরু করে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ক্ষেত্রে দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে সৃষ্ট বৈষম্য, সরকারী বিনিয়োগের বৈষম্য, সরকারী ও বেসরকারী কলেজ সমূহের সংখ্যায় দুস্তর ব্যবধান, বিশেষ করে যে বৃত্তিমূলক ও পেশাদারী শিক্ষা লাভের মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও আয়গত ব্যবধান দূর হতে পারে, দেশের এই অঞ্চলে অন্য অঞ্চলের মতই কর্মচাঞ্চল্যের জোয়ার আসতে পারে সেক্ষেত্রেও বিরাজমান মারাত্মক বৈষম্যের চিত্র তুলে ধরার প্রয়াশ চালানো হয়েছে । উপরন্ত বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে এই এলাকার উপর যে বৈষম্যমূলক ও অবহেলাপূর্ণ আচরণ করা হয়েছে সংক্ষেপে তারও বিশ্লেষণধর্মী চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে ।

একই সংগে সমাধানের ইংগিত বা পথ নির্দেশেরও চেষ্টা করা হয়েছে । এই অঞ্চলে শিক্ষাখাতে সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি, কারিগরী, পেশাদারী ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ লাভের সুযোগ সৃষ্টি, শিক্ষক-ছাত্রের অনুপাত বৃদ্ধি প্রভৃতি কার্যকর ও সময়োপযোগী কর্মসূচী গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে । এসব পদক্ষেপ যত দ্রুত গৃহীত ও বাস্তবায়িত হবে ততই এই অঞ্চলের বেদনাদায়ক অবস্থার পরিসমাপ্তি ঘটবে । দেশের অন্যান্য এলাকার মতই এই এলাকাও কর্মমুখর ও হাসি-খুশীতে প্রাণোচ্ছল হয়ে উঠবে ; জাতীয় আয় বৃদ্ধিসহ উন্নয়নমূলক কর্মসূচীতে তার যথোপযুক্ত ভূমিকা রাখতে সমর্থ হবে । এক মাত্র এভাবেই গোটা দেশের সুসামঞ্জস্য অর্থনীতির উন্নয়ন নিশ্চিত হতে পারে ।

গ্রন্থপঞ্জী

১ । বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন ঃ শিক্ষা ও পরিকল্পনা, ঢাকা, ১৯৮১ ।

২ । বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ঃ বার্ষিক রিপোর্ট, ১৯৮১-১৯৮৪, ঢাকা ।

৩। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ঃ বার্ষিক রিপোর্ট, ১৯৮১-৮৫, রাজশাহী।

৪। পরিকল্পনা কমিশন ঃ দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা, ১৯৮০-৮৫, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা, ১৯৮০।

৫। Planning Commission : The Third Five Year Plan, 1985-90, Government of Bangladesh, Dhaka, 1985.

৬। Bangladesh Bureau of Statistics : Statistical Year Book of Bangladesh, 1984-85, Government of Bangladesh, Dhaka, 1985.

৭। Bangladesh Bureau of Statistics : Statistical Pocket Book of Bangladesh, 1983, Government of Bangladesh, Dhaka, 1984.

৮। Hoque, Asraul and Tariq Saiful Islam : Regional Disparity in Investment in Human Capital : The Case of University Education, The Bangladesh Journal of Political Economy. Regional Development Seminar, Rajshahi University, Rajshahi, 1984.

Problems and Prospects of Small and Cottage Industries in North-West Bangladesh : A Case Study of Brass and Bell Metal Industry

M. AZHAR-UD-DIN *

1. Introduction

The brass and bell-metal industry is one of the most important small and cottage industries of Bangladesh. This industry is located at Rajshahi, Dhaka, Mymensingh and Faridpur districts. In the district of Rajshahi, the villages of Kalam (Singra), Budhpara (Rajshahi) and Kansari Patti under Chapai-Nawabganj Upazila have been famous as the oldest centres of this industry. The important products of this industry are pitchers, jugs, plates, glasses, bowls, water pots, spoons, ash-trays, and flower-vasses of different sizes and shapes. The products are very essential in the day-to-day life of the people. These are solid and durable compared to those of other metals.

During the riots of the Bargees (at the time of Nawab Alibardi Khan of Murshidabad), a class of brass and bell-metal artizans were displaced from various parts of Murshidabad and came to settle at the above villages. The present owners of the factories of brass and bell-metal industry are the descendants of those artizans and workers. About two hundred years ago more than a thousand families of Kansari lived around Nawabganj. Their number has now come down to three hundred only. Thus the glorious days of brass and bell-metal are almost over. In recent years, brass and bell-metal utensils, both used as well as the newly produced have been smuggled to India. The producers are thus deprived of getting enough raw materials. Consequently they are giving up their profession. Some skilled labourers have already migrated from Chapai-Nawabganj to other places in search of alternative jobs. Many of them are now engaged in agriculture. Some of them are, for want of capital, involved in repair work. In fact the industry is now in a decaying condition.

* Professor, Department of Economics, Rajshahi University

2. Survey Findings

In this study, we report the findings of a survey of the brass and bell-metal industry. The survey was conducted by us in two phases as a part of a Research Project sponsored by the Social Science Research Council of Bangladesh. In Phase I, we collected primary information depending upon a pilot survey, and in Phase II a sample survey was conducted depending upon a questionnaire method for detailed investigation. The factory-owners, the artizans, the mahajans as well as the dealers of the bell-metal products were interviewed for the purpose of the present study.[1]

The factories belonging to the industry may be divided into various categories according to the different types of utensils made by them such as plates, glasses, bowls, pitchers and spoons. Most of these factories belong to and are run by the individual entrepreneurs. There is, however, another category of factories that are run by the artizans under the auspices of the mahajans. The mahajans themselves do not directly go for production. They are well-to-do people and have enough knowledge in this line of production. They procure raw materials including breakings and supply them to the artizans and take delivery of goods from them as per their own specifications. The artizans only get a making charge from the mahajans at the prevailing rates. The mahajans directly market their products (brass and bell goods) and earn the entire profit. They are, therefore, just like an intermediary class in this business.

The industry as a whole is a very old one. Out of the thirty units of different categories under investigation, most of them were established in or before 1950. Only 2 glass and 2 bowl factories run by the independent artizans and 3 general manufacturing units run by the mahajans were set up during the 1950s. Most of the factories of the above categories are of single ownership. Only 50% of glass and 33% of bowl producing units are run as joint ventures. Our study shows that the industry has no formal recognition and as such it does not belong to any registered society. None of the entrepreneurs of the firms under investigation have any formal education. Most of them are even illiterate. The workshops are run for only one shift daily and for 3 to 6 months in a year. It is also evident from the study that all of the entrepreneurs manufacture brass and bell-metal goods as their main occupation. Only

---

1. The author is indebted to the SSRC for their sponsorship of the project. He also expresses his gratitude to two of his colleages, Mr. Md. Rafiqul Islam and Mr. Md. Abu Baker Siddique of the Department of Economics, Rajshahi University, for their assistance and cooperation as members of the research team in the collection of data.

very few of the bell, bowl and pitcher manufacturers have agriculture as the socondary occupation. The annual average income from the main occupation (i.e.) brass and bell-metal is Taka 14,252 in the case of the owners of the workshops established before or in 1950s. The average income of the two groups from the subsidiary occupation (i.e. agriculture) is Tk. 1,675 and Tk. 1,850 respectively.

One important feature of this industry is that it does not employ any female labour, although both family and hired labour is engaged. Number of hired labourers is more than that of the family labourers in almost all the categories of manufacturing units under investigation. Table-1 shows the overall picture of the employment situation of the firms. It can be seen from the Table that the average number of labourers in each category of the manufacturing units excepting mahajans category declined between the initial and the current period. For the industry as a whole the average number of workers per manufacturing unit fell from 3.54 to 2.64 between the two periods. The cause of the decrease in the number of workers may be explained by their migration from the manufacture of brass goods to agriculture and other occupations because of the reasons mentioned before.

All the categories of firms consume raw materials and fuel available from the local market. Although some raw materials (e.g. copper, zinc, rankta) used to have been formerly imported from foreign countries by the importers of Dhaka, these were generally available to the factory owners of Nawabganj through the mahajans and other businessmen of the locality. Only a very negligible quantity of the above raw materials was imported direct by the manufacturers themselves. Moreover, since the inception of Bangladesh, the import of such raw materials has almost stopped. Thus at present the factory-owners have to depend solely on the raw materials in the form of breakings available from the local market. As already mentioned, available evidence shows that a huge quantity of the breakings of brass and bell-metal goods of different kinds is being smuggled out of the country. Thus the manufacturers have to face the problem of shortage of raw materials for the production of such goods.

Table-1
Trends in the Employment of Labour in Different Categories of Brass and Bell-Metal Industory (Number of Workers)

Category of Firms	Year of Establish-ment	Employment in Initial Period	Employment in Current Period	Current as % of Initial Period
Plate	Before 1950	24 (4.8)	14 (2.8)	58.30
Glass	Before 1950	11 (3.6)	7 (2.3)	64.00
"	1950-55	7 (3.6)	5 (2.5)	71.00
Bowl	Before 1950	14 (4.6)	8 (2.6)	57.00
"	1950-55	8 (4.0)	6 (3.0)	75.00
Pitcher	Before 1950	19 (3.8)	13 (2.6)	68.00
Spoon	Before 1950	18 (3.6)	13 (2.6)	72.00
Mahajans	Before 1950	4 (2)	5 (2.5)	125.00
"	1950-55	6 (2)	9 (2.9)	150.00
Average for all categories	—	3.54	2.64	—

Source : Survey data.
Note : Figures in the parantheses indicate average number of workers per firm in the respective category of firms.

The fixed assets of the industry consist of land, buildings and machinery. Almost all the workshops are situated on the premises of the homestead of the artizans. As most of the owners of the workshops live in thatched houses, their workshops are also made of straws and bamboos. Some of the mahajans have buildings which are used either as workshops by hired artizans or as shops by themselves for the business of the brass and bell products. Generally, ovens, hammers

ironstands and forceps (pincers) are used by the artizans as machinery.

Table-2
Average Value of Fixed Capital and Annual Average Consumption of Raw Materials and Fuel.

(Figures are in Taka)

Categories of factories	Year of establishment	Fixed Capital	Raw Materials and Fuel Consumption
Plate	before 1950	7,860	2,176
Glass	Before 1950	6,300	1,400
"	1950-55	12,500	3,000
Bowl	Before 1950	7,400	2,333
"	1950-55	9,000	4,525
Pitcher	Before 1950	6,356	2,660
Spoon	Before 1950	7,420	2,800
Mahajan	Before 1950	75,000	1,25,400
"	1950-55	98,000	1,66,267

Source : Survey data.

The life of all these machinery except oven varies from 20 to 35 years. As the ovens are made of earth, their life span is comparatively short and have to be replaced by the new ones every 3 to 4 years. It is also evident from our investigation that the machinery used in this industry is all indegenous.

Table-2 shows the average value of fixed capital and the annual average consumption of raw materials and fuels per firm in each category of firms. It is evident from the table that the average value of fixed capital is the highest in the case of factories run by the mahajans. Also, since the mahajans have larger funds, they use much larger quantities of raw materials. In other words, the mahajans can be seen to run their business on a much larger scale compared to the artizan-entrepreneurs.

Table-3 shows the annual average production of various types of utensils in quantity terms. It is evident from the table that the production of brass and bell goods have declined to a considerable extent, i.e. by 50% to 60%, over the years. This is because of the non-availability of raw materials such as zinc, brass, bell-metal, breakings of bell and brass goods, and the migration of the artizans from their main occupation as Kansari to other occupations.

Table-3
Annual Average Quantity of Production of Bell and Brass Goods

(in Maunds)

Category of Industry	Period of Establishment	Production in Initial Period	Production in Current Period
Plate	Before 1950	67	23
Glass	Before 1950	53	16
"	1950-55	32	18
Bowl	Before 1950	68	21
"	1950-55	53	25
Pitcher	Before 1950	68	21
Spoon	Before 1950	49	20
Mahajan	Before 1950	85	48
"	1950-55	92	55
Average of all categories		64	25

Source : Survey data.

Two types of costs — direct and indirect are included in the analysis of costs and profits of the brass and bell-metal industry. Direct costs include those in respect of raw materials, purchased machine parts and labour. Indirect costs, on the other hand, consist of factory overheads including fuel, electricity, water, rent, depreciation charges, repairing expenses and taxes if any.

Table-4 shows the costs and sales proceeds and thereby the gross profit in value terms of the different categories of firms in the industry. It is clear from the table that although sufficient raw materials are not available and cost of production is high enough, gross profit is also high. This profit varies from, 40 to 112 percent of the total cost except in the case of mahajans where it is about 30%. Thus we can easily come to the conclusion that the industry is still a profitable concern and not a losing one.

3. Problems of the Industry and policy package

The sky-high price of raw materials is the main problem faced by the industry at present. There is a chronic crisis of raw materials, specially since the black-marketeers smuggle the breakings of brass and

bell-metal goods to the neighbouring country. During the Ayub regime, a liberal policy was pursued for this industry and sufficient quantitles of raw materials were imported. Subsequently, and specially after the inception of Bangladesh, the import of raw materials for the industry was stopped. Now only breakings are used as raw materials. This source too, is going to be exhausted.

Table-4
Annual Average Costs, Sales Proceeds & Profit

(Figures are in Taka)

Category of Industry	Perid of Establish-ment	Numb-ers of Firms	Total Costs	Total Sales Proceeds	Gross Profit	Gross profit as % of total cost
Plate	Before 1950	5	9,252	19,600	10,348	112
Glass	Before 1950	3	6,800	14,000	72,000	105
"	1950-55	2	11,408	16,000	4,593	40
Bowl	Before 1950	3	12,583	20,400	7,817	62
"	1950-55	2	16,018	25,000	8,975	56
Pitcher	Before 1950	5	8,692	15,000	6,308	73
Spoon	Before 1950	5	9,205	17,200	7,991	87
Mahajan	Before 1950	2	1,89,150	2,42,500	53,350	28
"	1950-55	3	1,95,700	2,55,000	59,300	30

Source : Survey data.

The factory-owners are deficient of capital to purchase machinery and raw materials. They often take loan from the mahajans, but the rate of interest is so high that it does not give them any net return. They do not get any financial assistance either from the government or from any other financial organization; nor have they been able to form any cooperative credit society of their own which could provide cheap loan. The problem of fuel for this industry is also acute. Bangladesh badly lacks in the supply of coal, the high price of which is a serious problem.

The product of this industry is also facing competition with the goods made of steel, aluminium, tin etc. which are produced in the modern manufacturing industry at a lower cost and as such can be sold at a more competitive price. Furthermore, unlike the manufacturers in the modern

sector, the producers of the brass and bell-metal goods are not in a position to incur any expense on advertizements and publicity for the expansion of market for thier goods.

In the light of the findings of this study, we may suggest the following policy package :

a) Availability of raw materials at a reasonable price should be ensured and as such import policy in this regard should be made more liberal. In the case of the import of raw materials such as brass, zinc, rankta, etc., by the owners and artizans of this industry, preferential tariff should be introduced in order to reduce cost of production and hence increase profitability and level of investment.

b) The industry has to be formally recognized and the artizans should be provided with necessary credit facilities at a lower rate of interest. While the BSCIC should take a lead in this regard, the commercial banks and other specialized financial institutions also can play a vital role for the purpose by opening up of a "separate window" as proposed in the Industrial Policy of 1986.

c) Necessary arrangements should be made for supplying the artizans with modern tools, machinery and technical know-how so that the quality of the product may be improved and the scale of production expanded to cater to the need of the domestic market and to increase export to the foreign market.

d) With a view to popularising the use of modern technology among the kansaries, technical training together with general education should be imparted to the artizans and workers.

e) Pending the availability of cheaper power, specially through the extension of gas pipe line from the eastern region to the North-Western region of the country, subsidy should be given to the price of coal and other necessary services used by this industry. If necessary, a concessional electric power tariff may also be introduced for the first few years of the operation of the factories.

f) Finally, the formation of cooperative societies will go a long way to provide the artizans with credit facilities at a cheaper rate of interest. The society will mobilize the small savings of the members and thus help capital formation which in turn will revitalize the industry.

Fragile Profile of Energy Balance in the Western Zone of Bangladesh

M. SOLAIMAN MANDAL *

The energy requirement of a country depends mainly on its climate and its state of economic development as reflected in the size of its per capita GNP, the level of structural changes and technological progress in the economy and also in the extent of urbanization attained.

Bangladesh belongs to the subtropical region where substantial amount of energy is obtained, free of any cost,from the sun and utilized in drying and processing various crops like rice, jute and pulses and in making construction materials (brick, tiles, etc.) and household articles (earthen utensils, toys and protective rings for dugwells). But this source of energy cannot be availed of during the monsoon. Large-scale harnessing of solar energy for generation of electricity is still a remote possiblity in this country.

As the Western Zone of the country is relatively free from the ravages of floods, prospects of agricultural development through widespread use of irrigation technologies can greatly be widened provided that adequate energy can be supplied relatively cheaply. Unfortunately for the Western Zone, however, its own sources of commercial energy from coal, oil and gas are either unknown or untapped; and its prospect for generation of hydro-electricity is very much limited. To add to this ill-fortune, traditional sources of energy from firewood and cowdung are also severely restricted, as only about 9 per cent of the North-Western region of Bangladesh is presently under forest and as the cattle population of the region is too small to yield sufficient cowdung for meeting the twin requirements of fuel and manure. Inadeqate supply of electricity generated from hydro and thermal sources and still more inadequate supply of commercial energy from coal and gas have been taking a heavy toll of the tree and plant population in the North-Western region. The extent of reliance upon traditional sources of domestic and commercial

* Professor, Department of Economics, Rajshahi University.

energy has already been so large in this region as to threaten the region with the onset and acceleration of a process of desertification. Under the circumstances, the socio-economic development of the Western Zone of Bangladesh along with the maintenance of its overall ecological balance hinges heavily on ensuring an adequate supply of commercial energy in this region.

Present Scenario of Energy Balance in the Western Zone

At present Bangladesh generates commercial energy from hydro and thermal sources. Thermal energy is obtained from generators driven by (a) steam turbines and (b) some form of internal combustion devices. Coal, furnance oil and natural gas can be used to operate steam turbines. But as coal is a costly imported item of fuel it is no longer used to drive such turbines, leaving only furnace oil and natural gas to fuel the existing steam turbine-based power stations of Bangladesh. Internal combustion mechanisms normally use shell gas, naptha or diesel as fuel A part of the thermal electricity produced in Bangladesh comes from diesel generators [1].

During the war of liberation, power installations suffered extensive damage. As a result, the peak production at the worst phase dropped from the pre-liberation (1970) level of 225 MW to only 30 MW. By the end of 1972-73, the peak production was restored to 222 MW. Several projects initiated in the preliberation period were completed during the first Five Year and the Two-Year Plan periods. Important among them are : (1) Khulna 60 MW power station, (2) Ghorasal 110 MW power station, (3) Ishurdi-Saidpur transmission line and (4) Ashuganj-Jamalpur transmission line. New projects initiated and compieted during these periods include Bheramara 60 MW Gas Turbine, and Khulna 56 MW barge-mounted power station [2;chp X]. As a result, the installed capacity for generating hydro-electricity increased from 80 MW in 1974-75 to 130 MW in 1983-84; the installed capacity for generating thermal electricity increased from 587 MW in 1974-75 to 991 MW in 1983-84. Thus Bangladesh could manage to increase its total installed capacity for generating electricity from hydro and thermal sources from 667 MW in 1974-75 to 1121 MW in 1983-84 [1].

The zone-wise distribution of the installed capacity presents a dismal picture for the Western Zone vis-a-vis the Eastern Zone. The total electricity generation capacity of the Eastern Zone increased from 1022 million KWH in 1974-75 to 3398 million KWH in 1983-84. During this period, the same capacity of the Western Zone increased from 300 million KWH to only 569 million KWH [1]. Thus the decade between 1973-74 and 1983-84 witnessed more than threefold increase in electricity generating capacity in the Eastern Zone as against less than

twofold increase in the Western Zone. What is much more conspicuous is the fact that the installed capacity of the Western Zone has been concentrated in its Southern region. Consequently, the Northern region (Rajshaji Division) has to remain heavily dependent on the Eastern Zone as well as on the South-Western region of Bangladesh. The Northern region can meet a very small fraction of its electricity requirement out of its own generation capacity located at Saidpur (10.5 MW), Thakurgaon (4 MW), Bogra (5 MW), Rajshahi (2.2 MW) and Sirajganj (2.4 MW). Thus the installed electricity generation capacity of Rajshahi Division is only about 0.71 per cent of that of the Eastern Zone and only about 4.24 per cent of that of the Western Zone.

The inter-zonal disparity in installed capacity is, no doubt, due primarily to the comparative cost advantage of the Eastern Zone over the Western Zone emanating mostly from favourable resource endowments. The flat topography of the latter could not offer anything comparable to the Karnafuli basin as a site for a hydro-electric project. As regards thermal power, again it is the Eastern Zone that enjoys a decisive cost-advantage because of proximity to the gas fields of Sylhet and Comilla.

The following questions can now be raised urgently: Given the meagre quantity of electrical energy that the North-Western region can generate, how can this region think of maintaining its energy balance ? It goes without saying that this question can be understood and answered only with reference to energy balance in Bangladesh as a whole.

The present energy situation in Bangladesh is far from being satisfactory. The per capita consumption of commercial energy in this country was only about 41 kg of oil equivalent by the end of the Second Plan period— only about 15 per cent of the average of the low-income economies [2;chp. XI].

The authors of the Third Five Year Plan of Bangladesh attributes the situation to "highly capital-intensive character of both primary and secondary development projects, dependence on foreign technology and poor resource management" [2;251]. The most important primary energy source of the country at this moment is natural gas, with reserves estimated at 11 trillion cft. While it is being distributed at a nominal cost (thereby encouraging wasteful consumption) in areas of the Eastern Zone, the Western Zone is still now deprived of this versatile fuel. Liquefied Petroleum Gas (LPG) supplied to a limited number of consumers of the Western Zone is costly and irregular in supply, and as such as limited potential of becoming a substitute of electricity or other traditional fuels.

The completion and commission of the East-West Interconnector across the river Jamuna in December 1982 was looked upon as an important step towards transmission of gas-based electricity from the Eastern to the Western Zone of the country. But frequent incidences of power failure and load-shedding in the Western Zone and reports of the alleged transmission of electricity from the energy starving Western Zone to the relatively affluent Eastern Zone amply testify to the fragile character of energy balance in Bangladesh. The energy imbalance was allowed to develop, despite rather a healthy growth of energy resources during the First Five Year and the Two-Year Plan periods, due primarily to the fact that the growth of energy demand at 11 per cent annum far exceeded the extension of capacity at 6 per cent per annum. Again, despite completion of five generating plants with a total capcaity of 330 MW during the Second Plan period (1980-85), the generating capacity still lagged far behind the growth of demand [2;253]. The growth of demand was due largely to the introduction of energy-intensive technologies in food and agricultural production, in storage and processing of agricultural products, in cottage and small industries in rural areas, and in transport and communications sector. It is also due to such ambitious programmes as Upazila electrification and rural electrification.

The limited base of commercial energy resources, concentration of the currently available energy resources in the remote Eastern Zone of Bangladesh, technological and economic constraints to transission of natural gas throughout the length and breadth of this reverine country and pariticularly to the zone across the river Jamuna and, above all, the high prices of modern commercial energy account for grossly disproportional dependence of the economy on traditional energy sources upto the extent of 70 to 80 per cent which is definitely a sufficient indication of the traditional character of thd economy. Data on zone-wise consumption of traditional fuels and modern energy are not available. But the data on the maximum demand for electricity are available and these indicate an increase of the maximum demand of the Eastern Zone from 192 MW in 1974-75 to 549 in 1983-84 as against the increase of the Western Zone's demand from 64 MW to 212 MW during this period. It can easily be understood, therefore, that the Western Zone in 1984-85 is almost at the same level of electricity-based technology as the Eastern Zone had been in 1974-75. As gas-based technology is virtually a privilege of the Eastern Zone, the Westrn Zone will continue to trail behind the former with respect to diversification and modernization of its productive sectors. Pending the construction of the proposed multipurpose Jamuna bridge, and increased supply of commercial energy to the Western Zone (within the techno-economic constraint to

exploitation of its known energy resources) has been contemplated in terms of substitution of natural gas for imported liquid fuel in the Eastern Zone along with generating gas-based electricity in the Eastern Zone and transmitting it to the Western Zone via the East-West Interconnector. But the government policy has so far been concerned with maintaining a kind of energy balance in which management of demand seems to have gained an upper hand over management of supply. Enhancement of rates of tariff has been chosen as the principal instrument for containing the demand for commercial energy, particularly the demand for electricity. The avarage rate of tariff for electricity was raised from Tk. 0.66 per KWH to Tk. 1.44 per KWH, registering an increase of 118 per cent over the Second Plan period against a cumulative inflation rate of 75 per cent. On the other hand, substitution of natural gas for imported fuel reduced per KWH cost of generating electricity from Tk. 0.56 in 1982 to Tk. 0.50 in 1985 [2;255]. The reduced cost is said to be due also to large-scale generation of electricity and the extension of the electricity market to the Western Zone. Nonetheless, higher rates of tariff for industrial and commercial uses as well as for large-scale domestic consumption of electricity are still applied allegedly to generate additional financial resources and to compensate for high percentages of distribution loss. Notwithstanding a number of costly measures, technical and administrative, initiated during the Second Plan, the system loss of electricity could be reduced only marginally from 40 per cent in 1979-80 to 37.5 per cent in 1984-85 [2].

While reviewing the energy policy of the Government of Bangladesh one has to unvail the unpleasant truth that the policy has always been in a state of confusion and contradiction. On the one hand, natural gas which is a non-renewable resource has long been allowed to be consumed wastfully in the Eastern Zone at a nominal price. On the other hand, progressive rates of tariff for electrictity have ruthlessly been applied to create external diseconomies for the public and private sector enterprises as well as to give rise to diseconomies of large-scale domestic, industrial and commercial consumption. The energy policy must be considered as part of an overall development strategy aimed at alleviating poverty and satisfying the basic needs of the people. What is needed is the formulation of a kind of energy policy which will encourage technical innovations in different sectors of the economy. It should be conceded, however, that an abundant supply of commercial energy at reasonable prices can do so only when the development policy package itself is conducive to such innovations.

The development plans of Bangladesh placed due emphasis on (1) removal of imbalance between generation and distribution facilities, (2) removal of regional imbalance in power distribution facilities,

(3) integration of power transmission and distribution systems into grids, (4) undertaking effective rural electricification programme, and (5) improvement in the quality of service. But physical attainments have always lagged behind the plan targets in almost all subsectors excepting the so-called rural electrification programme. As already pointed out, shortage and poor management of resources, capital-intensive technology and dependence on foreign assistance have been identified as the main constraints to the growth of energy sector.

A close examination of the causes of the energy imbalance in Bangladesh will, however, reveal that none of the constraints was really unsurmountable provided that the political leadership had been prepared to give this sector the (social) priority it deserves. It is true that the energy sector is relatively capital intensive. But it is equally true that vast resources have been allocated to marginally productive uses such as the recent proliferation of Upazila administration. It goes without saying that administrative infrastructure and superstructure is much more capital-intensive than even the typically capital-intensive energy sector. Again, the argument that energy development involves foreign technology and foreign resources is a hackneyed one, because it is true of many sectors of our economy. Energy is basic to satisfaction of basic needs of our society and it must be made available to the people at the least possible cost. How and when Bangladesh chooses to do it is the most important question.

Profile of Energy Balance in the Western Zone Towards the End of this Century

Any discussion on energy balance in Bangladesh or in any of its zones is invariably related to estimation of demand for and supply of commercial energy as well as traditional fuels. It is hardly possible to make any accurate estimate of the demand for energy over the decade 1990-2000 A.D. This is because there are too many unknowns in the equation of demand for commercial energy or traditional fuels both at the macro and micro-economic levels. The macro-economic demand at constant prices of commercial energy may crudely be estimeted on the basis of projections in respect of the rate of population growth and per capita energy consumption. It may also be calculated as a function of the GDP growth rate and the incremental energy coefficient of GDP. Lack of reliable data on the relevant variables renders it difficult to make any such projections of demand. One can, however, make some intelligent guess about the nature and the magnitude of the energy balance or imbalance which may very well become an important economic factor in Bangladesh by the turn of the century.

Our guess may start with the projection of population of Bangladesh over the period 1985-2000. The most optimistic projection puts the population of Bangladesh at 131 million, while the least optimistic projection sets it at 142 million in 2000 A.D. [1]. Thus the population of Bangladesh in 2000 A.D. will roughly be 50 cent higher than its population in 1984. As regards the per capita consumption of commercial energy, it increased from 24 kg of oil equivalent in 1972 to 32.8 kg in 1980 and to 41.3 kg in 1985. The per capita consumption is expected to rise to 58.3 kg of oil equivalent in 1990. This estimate is based upon the growth of per capita consumption of commercial energy at the rate of 8.7 per cent per annum during the Second Plan Period. With introduction of energy-intensive technologies in agriculture, industry, trade and commerce, gradual substitution of commercial energy for traditional fuel and electrification of upazilas and villages, the demand for commercial energy (particularly the demand for electricity) is expected to register some steep rise. Accordingly, the per capita consumption may shoot up to 70 kg of oil equivalent in 1995 and to 80 kg in 2000 A.D. Thus the per capita consumption of energy in 2000 will at least be 50 per cent higher than the consumption in 1990. With population and per capita consumption of energy each becoming roughly 50 per cent higher than what will be in 1990, Bangladesh will really be faced with an exploding demand for commercial energy towards the turn of the century.

The situation in the Western Zone of Bangladesh is somewhat more unpredictable. Historically, much of the industrial development in Bangladesh has occurred in the Dhaka-Narayanganj metropolitan area with some further concentration around the principal port of Chittagong and, on a smaller scale, around Khulna and Jessore in the Western Zone. A few argo-based and footloose industries have been set up in the North-West and the North-East regions of Bangladesh. Government policy to attain regionally balanced industrial development, through establishment of industrial estates in every district, is most unlikely to succeed. This is because agglomeration economies obtainable in the large and industrial cities of Bangladesh have uptil now been far stronger than the economic incentives created by the government in the industrial estates. Viewed from this angle, the industrial demand for commercial energy is likely to increase much less repidly in the Western than in the Eastern Zone. But the same statement may not hold true for domestic, commercial and agricultural uses of such energy. On the contrary, the demand for traditional fuels and commercial energy is sure to grow apace on account of application of energy-intensive technologies to agricultural production and cottage and small scale industries and also due to hastening of the process of urbanization under the agglomerating

influence of district and upazila administration. However, the most important source of the enlarged demand for commercial energy and traditional fuels can be traced to the population growth at a rate somewhat higher than the national average simply because of the fact that the demographic transition to the stage of a relatively low net reproduction rate is likely to take place at least a decade later in the Western Zone vis-a-vis the Eastern Zone. The impact of the population growth on the demand for traditional fuels will be far more adverse in the Western than in the Eastern Zone where easy access to natural gas willl ease the pressure of demand for fossil fuels.

Let us now turn to the important question as to how the Government of Bangladesh proposed to tackle the situation of exploding energy demand in years to come. It may be pointed out at the very start of answering the question that the Government does not have any long term energy policy capable of providing an easy solution to the energy problem. The main thrust of the Government's energy policy has been an accelerated use of natural gas which, at the current rate of growth of consumption estimated at 13.8 per cent per annum during the Third Plan period, will be available for fresh commitment only upto the turn of the present century. Therefore, alternative sources of energy have to be explored to augment the energy resource base including nuclear energy and perhaps space energy. Exploration of gas reserves through geological survey and remote-sensing should receive the highest priority.

The tricky problem of maintaining the energy balance in the Western Zone of Bangladesh has been thought to be solved in terms of enhanced exploration; involvement of the private sector, particularly multinational oil companies; transfer of gas to the Western Zone, increased supply of LNG and LPG to the Western Zone through the addition of a second East-West Interconnector by 1990, raising the voltage level of the backbone transmission system to 230 KV for efficient operation and bulk power transmission; reinforcement of the grid network to ensure adequate transmission capability; completion of on going projects of generation, transmission and distribution; and improvement of system reliability. Despite all these measures, however, shortage of power will remain a chronic problem for the Western Zone, unless and until the proposed Rooppur Nuclear Power Station is brought to commission.

REFERENCES

1. Bangladesh Bureau of Statistics: Statistical Year Book of Bangladesh, 1983-84, Government of Bangladesh, Dhaka, 1984.
2. Planning Commission: The Third Five year Plan, Government of Bangladesh, Dhaka, 1985.

Desertification, Declining Underground Water Level and Crop Production Strategy for Barendra Region of Bangladesh

ATAUL HUQ *
ALI ASHRAF **

Introduction

Water is the most critical input for farming particularly in the dry region. The barind tract of North Western region (NWR) experiences the lowest rainfalls wihtin the relatively most dry area representing the entire division of Rajshahi [1]. The low rainfalls over the years coupled with the peculiar ecological features such as rapid deforestation, soil conditions, humidity and temperatures, has contributed to the onset of a desertification process of NWR since the early 70's. This is further exacerbated by the continous drying up of major potential sources of recharge to the ground water system (such as various water bodies including rivers and canals) during the dry months resulting from the withdarwals of waters at Farakka by India [2]. This acts as a major constriant in the crop production strategy of the region in particular and the country as a whole. Keeping this in view, this paper examines the factors responsible for the gradual desertification process, its short and longrun implications for the growth of crop production, and the strategies to be adopted to combat this problem.

Factors Contributing to Desertification Process

The total land area under forests for the country as a whole stands at only around 15% which is much below the area warranted for ecological balance. This proportion is the lowest for the North Western Region which is evident from the smallest contribution of the forestry sector to the GNP in this region. The shares of the five regions, namely, north western, south western, north eastern, south eastern and the hilly

* Professor, Department of Economics, Chittagong University
** Lecturer, Chittagong University College

regions, in the total forest resources of the country are respectively 0.7%, 27.1%, 8.2%, 9.9% and 54.1%. The loss of area under forests at a rapid rate is particularly alarming for the barendra region which is already vulnerable to the desertification process. With the loss of forests, their beneficial effects in stabilising soils and slowing water run-off are also lost. The felling of trees also destroy the ecological balance with the most deliterious impact on temparature, humidity and rainfall. Below we mention some of the major factors contributing to the deforestation process.

(a) Construction activities

The district of Rajshahi have had the worst communication system until very recently. However, the road communication system developed and the construction sector got some momentum during the last decade. In the absence of easy availability of any alternative fuels like gas and coal, the big trees became the easy prey of all fortune seekers associated with the construction activities.

(b) Domestic use of trees as fuel

After Liberation, the use of gas for domestic purposes increased quite considerably in the south eastern and north eastern regions of the country. Because of the long distance and the difficulties involved in the supply of gas and coal in the north western region, big trees and small plants are still being used as one of the major sources of fuel for cooking and related activities.

(c) Industrial use of trees as raw materials

This can be regarded as one of the most important causes contributing to the deforestation process of this region. The match factories which started production since the 50's were largely responsible for the destruction of big as well good varieties of trees.

The combined effect of the aforesaid factors became more disastrous when the Farakka Dam was commissioned in 1974. As a result of the Farakka, the potential sources of recharge to the ground water system remain dry during the period stretching from January to May thus contributing to the desertification process.

Effect of Desertification on Crop Production

As has been explained, the declining of under ground water levels has serious implications for enhancing crop production in the regions thus affected . That the whole strategy of increased food production through irrigation during the dry months is threatened becomes obvious from the following findings of a survey carried out in six upazilas in Rajshahi district during the 1986 Boro season.

The findings of Table 1 suggest the alarming effect of declining underground water levels on Boro cultivation. Out of 178 STWs surveyed in six barendra upazilas, aroud one third apparently suffer from the shortage of irrigation water. The distance at which water drops from the mouth of the pipe is indicative of lifiting either adequate or inadequate volume of water. Assuming 18 inches as a normal distance for this, only in two out of six barend upazilas the average distance reached 75% of the normal; in the other upazilas, this distance was a level of 75% of the normal volume of water only about half the normal (see colum 5, Table 1). Only about half of all the STWs in the survey upazilas were lifting normal volume of water (see column 4).

Table-1
Performance of STWs in lifting water in six Upazilas of Rajshahi District

Name of Upazila	No. of STWs commi-ssion-ed	No. of STWs opera-ted	No. of STWs survey-ed	No. of STWs not lifting normal volume of water	Average distance (in inches) at which water drops from pipe's mouth
	1	2	3	4	5
Godagari	335	430	40	26 (65)	6.9
Tanore	368	128	28	6 (21.4)	14
Nawabganj	329	244	24	6 (25)	9.2
Gomostap-ur	368	367	25	5 (20)	13.4
Mohadevp-ur	502	165	40	5 (12.5)	9.2
Patnitala	298	130	21	5 (23.8)	7
Total	2400	1464	178	53	

Notes & Sources : Based on data from a field survey conducted in the Boro season of 1986. The figures in parentheses in column 4 show the percentage of col. 3. The number of STWs in cols. 1&2 is obtained from BADC.

The failure to lift normal volume of water is reflected in the loss in expected yield of winter crops (i.r.,Boro HYV). Our field experience however suggests that all the STWs or all groups of farmers in the six barendra upazilas are not equally affected by the declining of underground water levels. So, for the convenience of comparison, the survey area is further classified into relatively more dry and less dry zones.While the former includes Godagari, Patnitala, Mohadevpur and Nawabganj, the less dry zone includes Tanore, Gomostapup and Shibganj. The STWs are also classified into two groups according to performance- the relatively good ones lifting 75% of normal volume of water and the bad ones lifting less than 75% of water. It appears from Table 2 that the number of respondents reporting loss in expected yield in the more dry zone is twice as much as that in the less dry zone. Again, based on the quality of STWs defined in terms of better location, the farmers of ordinary STWs of the more dry zone are the worst sufferers compared to those of the relatively less dry zone. The matter does not end here. The worst victims are the small farmers who are more affected than the medium and large farmers. The results in Table 3 show that the percentage of victims among the small, medium and large farms are respectively 48%, 36% and 16%. Again, the small farmers using water from the ordinary STWs are the worst sufferers in terms of output loss.

Table-2
Distribution of good and ordinary STWs according to loss in expected output in less dry & more dry zones

(Number of STWs)

Extent of output	Less Dry Zone		More dry Zone		Total	
Loss (in %)	Good STWs	Ordinary STWs	Good STWs	Ordinary STWs	Good STWs	Ordinary STWs
0-25%	5	14	11	34	16	48
25%-50%	1	8	2	12	3	20
50%-75%	1	-	-	-	1	-
75%-100%	1	-	-	-	1	-
Total	8	22	13	46	21	68

Notes & Source : Based on field level data good and ordinary STWs are defined as those lifting more than 75% and less than 75% of normal volume of water respectively.

Table-3

Distribution of good and ordinary STWs according to loss in expected output based on farm size

Extent of output	Small Farm		Medium Farm		Large Farm		Total	
loss (in %)	A	B	A	B	A	B	A	B
0-25%	6	25	8	15	2	8	16	48
25%-50%	1	10	-	6	-	4	1	20
50%-75%	1	-	-	-	-	-	1	-
75%-100%	1	-	-	-	-	-	1	-
Total	9	35	8	21	2	12	19	68

Source : Based on field level data. A and B stand for good and ordinary STWs respectively.

The long run consequences of the declining underground water levels resulting from the desertification process look even more alarming. In fact, if the process continues at the present rate, the whole policy of enhancing production through winter Boro HMV cultivation is likely to be jeopardized withing the next decade or so. This is apparent from the three types of strategies revealed by the owners of STWs of the affected areas (Table 4). The three strategies of reducing the land under STW(2), using engines of STWs for purposes other than irrigation(3) and disposing of the STWs(4), if adopted, are likely to have a most serious affect on the growth of output through Boro HYV cultivation. These three strategies combined account for about 60% of the respondent farmers (Table 4).

Strategies For Combating the Onslaught of Desertification

a. Short-Run Strategy

Given the declining under ground water levels and the high irrigation intensity of Boro HYV cultivation, farmers should be encouraged to go for diversification i.e., by replacing the water thirsty Boro HYV by less thirsty HYV wheat. To make less popular food crops like wheat more attractive, the government's entire policy package should be geared accordingly. Such a policy package may include, for example, creating a buffer stock for wheat and fixing a minimum but realistic procurement price for wheat. Besides wheat, the farmers may be encouraged to

produce some other winter cash crops like Soyabin, mustards, jower, pulses, etc. In realizing this, the government may have to ensure the availability of better quality seeds in the right quantity and at the right time. Access to institutional credits, with appropriate safeguards through a crop insurance scheme to cover all sorts of natural calamities, may also be provided to farmers of all size classes.

Table-4

Distribution of opinion of STW owners according to strategies likely to be adopted in future to confront the problem of declining under ground water levels in Barendra upazilas

Name of Upazila	Strategies likely to be adopted by STW owners 1	2	3	4	5	6	Total
Godagari	-	6	4	1	2	-	13
Nawabganj	4	1	2	-	5	-	12
Gomostapur	5	6	-	-	-	-	11
Tanoro	8	6	4	6	4	2	30
Patnitala	1	6	5	5	4	7	28
Mohadevpur	-	6	1	2	-	1	10
	18 (17)	31 (30)	16 (15)	14 (13.5)	15 (14.4)	10 (9.6)	104 (100)

Notes and Source : Based on field survey data. The figures in parentheses against last row show the percentage of row total. More than one opinion have been recorded from one respondent. The strategies are numbered as follows :

(1) placing engine further below the surface by digging
(2) reducing land under STWs
(3) using engine for alternative purposes (say, husking)
(4) disposing of the STWs
(5) shifting the location of installation
(6) others.

b. Long-Run Strategy

The first and foremost among long run strategies will be to effectively execute the afforestation scheme with the entire responsibilities of maintenance thrusted upon the local administration. As a part of afforestation, legislative laws may be enacted to halt deforestation while ensuring access to energy sources such as gas, electricity and coal. Here lies the importance of the proposed Jamuna Multi-Purpose Bridge. The growth of green vegetation as a part of aforestation scheme depends to a large extent on the availability of surface water in various water bodies

like rivers and canals. In this regard, the right sharing of water at the Farakka is a must for improving water reservoir for irrigation as well as the potential sources of recharge to the ground water system [3;chapter 16]. If the process of desertification continues at the present rate, the DTWs may also confront the same problem of declining underground water levels in the longrun. This calls for a comprehensive approach by taking resort to both short and long term measures encompassing the Farakka issue, the DTWs scheme, the aforestation programme and the construction of the Jamuna Bridge to ensure the supply of gas and coal in north-west Bangladesh.

REFERENCES

1. Bangladesh Bureau of Statistics : Statistical Yearbook of Bangladesh (various issues), Government of Bangladesh, Dhaka.
2. Abbas B.M.A.T. : The Ganges Water Dispute, The University Press Limited, Dhaka, 1984.
3. Asaduzzaman M. : Handbook of Ground Water and Wells, Rural Technology Series, BARC Prokashana, Dhaka, 1985.

Appendix-1

Area-wise distribution of STWs according to the size of land covered and average coverage of land per STW during 1986

(Number of STWs)

Size of land covered (in acre)	Tanore	Patnitala	Gomos-tapur	Godagari	Mohade-vpur	Shibganj	Nawab-ganj	Total
Upto 5	03 (10.72)	26 (76.19)	05 (20)	27 (67.5)	09 (22.5)	07 (25)	06 (25)	73 (35.44)
5.01-8	10 (35.71)	05 (23.81)	05 (20)	06 (25)	12 (30)	10 (35.71)	11 (45.83)	59 (28.64)
8.01-10	08 (28.57)	—	05 (20)	03 (7.5)	17 (42.5)	07 (25)	04 (16.67)	44 (21.36)
10 and above	07 (25)	—	10 (40)	04 (10)	02 (5)	04 (14.29)	03 (12.5)	30 (14.56)
Total	28 (100)	21 (100)	25 (100)	40 (100)	40 (100)	28 (100)	24 (100)	206 (100)
Average amount of land covered,	9.1	3.8	9.9	4.8	7.4	7.4	6.0	7

Note & Source : Based on field level data. The figures in parentheses show % of row total.

Regional Differences in Factor Substitution in Bangladesh Agriculture : An Econometric Study

TARIQ S. ISLAM *
M. ISMAIL HOSSAIN *
AHSANUL HABIB *

1. Introduction

The publication, in 1961, of the paper "Capital-Labor Substitution and Economic Efficiency" by Arrow, Chenery, Minhas and Solow (ACMS) [2] ushered in a new demension in measurement of substitution between the factors-capital and labour. The Leontief Walras Harrod Domar specification of zero elasticity of substitution and the Cobb-Douglas specification of unitary elasticity of substitution could now be empirically tested.

A flurry of empirical works followed ACMS contribution. Most of these studies were on the manufacturing sector of the developed countries. Few studies were conducted on the developing countries, and fewer still on the agricultural sector. This paper attempts an econometric investigation into this somewhat sparsely researched area using data on the agricultural sector of the Bangladesh economy.

More than fifteen years have elapsed since the emergence of Bangladesh as an independent nation. There are now just about enough observations for conducting an econometric study using time series data. In this paper, we present our estimates of elasticity of substitution using the CES production function given by ACMS. Besides providing estimates for Bangladesh as a whole, the estimates for the four districts of Chittagong, Dhaka, Khulna and Rajshahi are also presented hoping that this will enable us to discern differences, if any, in the extent of factor substitution in different regions of Bangladesh.

---

* Associate Professors, Department of Economics, Rajshahi University.

This paper is divided into five sections. In Section 2, the theoretical model is described, Section 3 contains an annotated description of the data used, and the estimates are presented in Section 4 along with an attempt at identifying their implications. Section 5 concludes the study with a brief overview of the main results and indicates some directions for possible future research.

2. The Model

The ACMS model [2] used for our study is given by

$$\log (V/L) = a + b \log (w) + e \qquad ...(1)$$

where V-is the value added, L-labour input, W-the money wage rate, B- the elasticity of substitution coefficient, and E-the error term. The rationale for treating b above as the elasticity of substitution (ES) is the following :

If the production function is given by $V = F(K,L)$ and is assumed to be homogeneous of degree one, then $V/L = F(K/L,1)$; and if we put $V/L = y$ and $K/L = x$ we cand say

$$y = f(x) \qquad ...(2)$$

In these terms, the marginal products of labour and capital are $f(x)-xf'(x)$ and $f'(x)$ respectively. Now let w be the wage rate with output as the numeraire. If the labour and product markets are competitive then

$$w = f(x)-xf'(x) \qquad ...(3)$$

which can be inverted to give a functional relationship between x and w, and from there, a monotonic increasing relation between y and w.

If s stands for the marginal rate of substitution between K and L, then the elasticity of substitution is simply defined as the elasticity of K/L with respect to s along an isoquant. For constant returns to scale it turns out [1;43] to be

$$b = \frac{f'(x)\,(f(x)-xf'(x))}{xf\,(x)f'(x)} \qquad ...(4)$$

Now moving back to (3) above we consider the relationship between y and w as determined explicitly by equation (3). Differentiation with respect to w we have

$$1 = f'(x)\frac{dx}{dy}.\frac{dy}{dw} - xf''(x)\frac{dx}{dy}.\frac{dy}{dw} - f'(x)\frac{dx}{dy}.\frac{dy}{dw} \qquad ...(5)$$

and since

$$\frac{w}{y}.\frac{dy}{dw} = -\frac{f'(x)(f(x)-xf'(x))}{xf(x)f''(x)} \qquad ...(6)$$

the elasticity of y with respect to w is from equation (3)

$$\frac{w}{y}\cdot\frac{dy}{dw} = -\frac{f'(x)(f(x)-xf'(x))}{xf(x)f''(x)} \qquad ...(7)$$

which is exactly equal to b as in equation (4) above.

ACMS demonstrated that the relationship given by equation log (V/L) = a + b log(w) implies the following familier constant elasticity of substitution function

$$V = k(mk^{-n}+(1-m)L^{-n})^{-1/n} \qquad ...(8)$$

for which the elasticity of substitution is given by $b = 1/(1+n)$. Admissible values of n run from -1 to infinity which permits b to range between plus infinity and O, and hence encompasses as special cases the Cobb-Douglas (b =1) and the fixed factor Leontief (b = O) production functions.

ACMS have also shown that the relative share of factors is closely linked with the magnitude of elasticity of substitution. They have shown that labour's share is governed by the relation

$$wL/V = (1-m)^{b}(w/k)^{1-b} \qquad ...(9)$$

where (1-m) is the share of labour coefficient, w = wage rate and k is the index of neutral technological progress. The above relationship gives rise to the following three possibilities:

(1) If b =1, we have

$$wL/V = 1-m \qquad ...(10)$$

which is the Cobb-Douglas case. Here, labour's share of value added (wL/V) is independent of both neutral technological progress k and wage rate w.

(2) If b< 1, suppose .5, we have

$$wL/V = (1-m)^{\cdot 5}(w/k)^{1-\cdot 5}$$
$$= (1-m)^{\cdot 5}(w/k)^{\cdot 5} \qquad ...(11)$$

so that if wage rate w increases more rapidly than the neutral technological progress coefficient k, that is if (w/k) rises, the share of labour will also rise.

(3) If b> 1, suppose 1.5, we have

$$wL/V = (1-m)^{1\cdot 5}(w/k)^{1-1\cdot 5}$$
$$= (1-m)^{1\cdot 5}(w/k)^{-\cdot 5}$$
$$= (1-m)^{1\cdot 5}(k/w)^{\cdot 5} \qquad ...(12)$$

which implies the reverse of case (2) since a rise in (w/k) implies a fall in (k/w); so that labour's share would fall over time.

3. The Data

Time-series data for the years 1973 to 1984 are used for this study. Data used are: (1) V, value added, defined as the difference between value of output and value of input (in million Taka); (2) L, agricultural male labour force given by persons employed (in thousands). Labour force data are available only for the census years, hence figures for the intervening years have been generated by interpolation; (3) w, the wage rate, represented by yearly average of daily wage rate (without food) of male labour. All data are obtained from the Statistical Year Book of Bangladesh and Monthly Statistical Bulletin of Bangladesh (various issues).

Table-1

Empirical estimates of the equation log (V/L) = a+ b log (w)

Region	a	b	R_2
Bangladesh	- 0.0176	1.3561** (25.61)	0.9694
Chittagong	- 1.0420	1.7087** (19.92)	0.9198
Dhaka	- 0.7276	1.2845** (15.46)	0.9247
Khulna	- 0.1976	1.0384** (12.43)	0.9239
Rajshahi	- 0.2508	1.0238** (10.66)	0.8994

Notes: ** indicates significant at the 1% level. t-values in parentheses.

4. The Results

The empirical estimates of the CES function as specified in equation (1) are set out in Table 1. It can be seen from the table that the coefficients of log (w), which measure the elasticity of substitution, are all significant at the 1 per cent level. The values of R-square range between 0.899 and 0.924. All considered, the estimates may be accepted as being reasonably reliable.

From an economist's perspective, the estimates appear to have several interesting implications. The estimates are all significantly different from zero, which implies that the Walras-Leontief-Harrod-Domar specification of zero elasticity of subsititution is untable for Bangladesh as a whole and for the four districts spread over four Divisions of Bangladesh.

Our estimates of ES for Dhaka and Chittagong are considerably greater than one which rejects the Cobb-Douglas specification of unit elasticity of substitution. The estimates of ES for Khulna and Rajshahi are, interestingly, not significantly different from one implying that the Cobb-Douglas specification of unit elasticity may be applicable to these two districts of the Western zone of Bangladesh.

The estimates also show that the extent of capital labour substitution has been greater for the two Eastern districts, Dhaka and Chittagong. Although the estimates of ES are symmetric that is, one cannot say whether capital was substituted for labour or the other way round— the direction of such a change in an economy like Bangladesh could be conceived of as substitution of labour by capital. Hence, it follows that the use of capital has grown faster in the Eastern regions of Bangladesh.

The relationship between ES and factor share which was discussed above implies that the share of labour has fallen (in recent years) in the districts of Dhaka and Chittagong whereas it has remained nearly constant in Khulna and Rajshahi. A falling share of labour as has apparently occurred in Eastern Bangladesh indicate growing mechanisation of agricultural operations, whereas for the Western region, a state of stagnancy is indicated. It is not possible to directly ascertain these indications which follow from the estimates of ES as, to our knowldge, there is no time series estimates of the shares of labour and capital.

5. Conclusion

The results which we obtained regarding factor substitution using a formal model appear both statistically significant and economically meaningful. The study indicates divergent extent of factor substitution in Eastern and Western Bangladesh and, in addition, points out a dichotomized situation in which the Eastern region is clearly ahead in the use of capital in agriculture relative to its Western counterpart.

REFERENCES

1. Allen, R.G.D.: Mathematical Analysis for Economists, George Allen & Unwin, London, 1938.

2. Arrow, K.J., Chenery H.B., Minhas B.S. and Solow R.M: Capital-Labor Substitution and Economic Efficiency, Review of Economics and Statistics, 1961.

Industrialisation in North-West Region of Bangladesh : Need and Strategies for Balanced Regional Industrial Development

A.M. MOSHARRAF HOSSAIN *

Bangladesh is no doubt a small country area-wise. Though small, from the standpoint of geographical characteristics, she has at least four distinctive regions— namely, Centre, East, North-West and South— which broadly conform to the areas of existing four administrative divisions. This paper attempts to study the present condition and future possibilities of industrialisation of the North-West region along with suggesting some strategies for achieving balanced regional industrial development in the country.

In her efforts for achieving economic development, Bangladesh has been able to develop her industrial base only to a modest extent. From about 4 per cent of GDP and less than 1 per cent of employment in the early fifties, the share of the manufacturing sector increased to around 10 per cent of GDP and 8 per cent of employment in recent years [1]. This limited amount of industrialisation has however been so located as to have led to a glaring disparity between North-West and other regions.

Extent of Industrial Disparity

The Census of Manufacturing Industries (1976-77) shows that 86 per cent of the total industrial fixed assets are located in Dhaka and Chittagong divisions while only 10 per cent and 3.86 per cent of the capital formation took place in Khulna and Rajshahi divisions respectively. Evidence on industrial disparity among the various regions with respect to employment industrial value added, etc. is also amply provided by other sources of industrial statistics [3].

According to a BSCIC Survey Report, of the total number of 24005 small industries in 1978, 37 per cent are located at Centre, 29.6 percent

* Associate Professor, Department of Economics, Rajshahi University.

in East, 18.1 per cent in South and only 14.4 in North-West region. In terms of total fixed investment, while Centre's share stands at 39.8 per cent, the share of North-West is only 15:2 per cent. Total employment in these industries is 322.3 thousands of which the share of Centre is the highest (37.5 per cent) and that of North-West region is the lowest (15.3 per cent) [4].

The Statistical Year Book of Bangladesh (1982) also shows glaring differences in respect of distribution of industrial value added of both large and small industries. The respective share in this case are 38.2 per cent for the centre, 44.4 per cent for East, 11.9 per cent for South and only 5.5 per cent for North-West. Taking together the total output of both the large and small industries, the share of Centre and East stand out at 37.5 per cent and 45 per cent respectively while South and North-West has only 9.9 per cent and 7.6 per cent respectively. Region-wise disparities can also be found in the contribution to the gross regional product by the industrial sector. While the contribution of industry (both large and small) to gross regional products of Centre and South are 12.2 and 14.6 per cent respectively, the corresponding contributions are 6.7 per cent and only 3.4 per cent for South and North-West. Consequently wide differences exist in region-wise per capita value added from industry.

Why North-West Is Lagging Behind ?

Industries tend always to proceed towards those areas where there exists sort of a localisation of industries. The tendency continue to persist even at the risk of higher cost of land and raw materials. The internal and external economies of these places are so large that they outweigh the higher costs of obtaining certain factors of production. This is what happened in Bangladesh leading to the localisation of industries in some places around Dhaka, Chittagong and Khulna cities. These regions thus turned out to be the industrial areas of Bangladesh having higher per capita income. The peculiar secio-economic and environmental advantages which acted as the initial factors responsible for these regions to leap forward in industrialisation later on became more consolidated and thus intensified the process of unbalance. The North-West region has thus come to be considered as a place not enjoying competitive advantages in the field of industrialization.

Because of the prevalence of such a notion neither the public nor the private sector has in the past systematically explored the possibilities of establishing different industries in this region. This is tentamoun to saying that our industrial efforts in the past was devoid of any idea of regional and special considerations. Thus instead of switching over to the North-West region, the older growth centres were preferred for subsequent industrialisation.

Industrial Prospects

It is very much wrong to say that the North-West region does not possess competitive advantages whatsoever in the filed of industrialisation. The fact is that this region do really possess many of the natural resources. This region has an abundant and cheap supply of most of the agricultural commodities which are the raw materials for industries. The availability of these agricultural resources has led to the establishment of some large-scale raw material-oriented industries in this region, such as those producing sugar, jute, paper and food and allied products. This area is well-endowed with some mineral resources, either in un- or under-utilized form, which can satisfy the input requirements of some industries. Besides, their exists a huge and varied market for mass consumer goods which can lead to the establishment of a large group of market-oriented industries. Demand for fertilizer, machine tools, etc. also calls for the establishment of a number of input-supplying industries here. With the adoption of sufficient fiscal and incentive measures many of the foot-loose industries can also be directed towards this region. Some labour intensive growth industries such as those of mechanical engineering, electrical engineering, metal products, textiles (including silk and hosiery), plastics, etc. have good prospects. Moreover, there is enough scope and necessity for establishing a good number of industries supplying public sector utility and capital goods. Along with these, the operation of various traditional and non-traditional cottage and small industries can further be extended here.

II

In the context of the backwardness of the North-West region, alongside the prospects of its future industrialisation, there is a need for adopting an approach of balanced regional industrial development in the country. By balanced development, we do not of course, mean that each region must attain the same level of development. Rather, opportunities and facilities should be created in such a way that every region can develop to the full extent. It may happen that a particular region is lagging behind economically or it happens to be a backward area. In that case, the principle of balanced regional development suggests that greater efforts for development (in terms of greater investments, special policy measures etc.) are to be made for that region so that it can fully develop its potentials. Thus, by the term balanced regional development we mean a coordinated and harmonious development for all the regions of the country.

Balanced Regional Industrial Development and Our Plans

The importance of undertaking a regional development strategy in our country has not been properly amphasized by the First Five Year Plan of

Bangladesh. It in fact, "did not split up the overall development programme into regional or district components, nor did it work out the implications of the regions" [5;96]. Recognition of the importance of the need to disperse industries is found only in the Second Five Year Plan. With this end in view the Plan proposed the adoption of conscious effort and necessary incentives "for the location of industrial units in new and less developed areas in order to promote balanced and harmonious development of different parts of the country, particularly in the non-metropolitan areas, discouraging further concentration of industries in already developed area as far as possible." [6;XIII-12] But surprisingly enough the Third Five Year Plan of Bangladesh did not explicitly state any strategy with respect to regional industrial development. In one of its industrial objectives it only sought to "create new opportunities, particularly dispersal of small industries and development of rural and cottage industries" [7;X-233]. Recently, the declaration of certain policy measures in the Industrial Policy of 1986 indicate that the Government of Bangladesh is fully aware of the need for balanced regional development. But the adoption of some isolated policy measures without a broad-based strategy package will not be enough to do the needful. The following analysis concentrates on the formulation of some such strategies by which the strategy of balanced regional industrial development can be made effective in this country.

Strategies for Balanced Regional Industrial Development

(1) Regional planning : In the first place in the context of regional approach to industrial development the need for the setting up of a regional planning machinery is an utmost necessity for the North-West region [8]. The regional planning machinery will (a) frame the objectives of development of its region, (b) determine the special dimensions of economic activities, (c) identify the local resources, both human and material, and then (d) formulate appropriate measures for activising these resources for development. Such a regional plan, of course, needs to be coordinated and integrated into the national plan so that lopsided development and strategic shortages and bottlenecks do not arise in a particular region.

(2) Greater public investment : While allocating development expenditure, adequate and special funds should be made available for the depressed North-West region to help undertake different growth activities on a priority basis. The bulk of public investment in this region should go for providing infrastructural facilities so as to facilitate the growth of economic activities. By providing greater incomes to the people, these activities in turn will help increase the size of the market and thereby promote further industrial growth.

(3) Dispersal of industries using local resources : There should be an intergrated programme for dispersal of industries on the basis of availability of local resources. Here in this region, rural and cottage industries may be promoted as part of rural development programme by the maximum use of local natural resources, agricultural produces and human skills. Along with these, larger consumer good and processing industries can also be established here using local resources. Production of various silk goods, mango processing, saree printing are some examples of such kind of industrial ventures. Increased activities for extraction of mineral deposits can also be undertaken.

(4) Greater role of public sector industries : Along with the aforesaid industries, a good number of other industries which may supply inputs (fertilizer, iron, gas etc.) and utility services may be set up by the government in this region. Those industries where capital requirements are large and profits are insecure should also to be established under auspices of the government. "Some government-owned big and large industries particularly which are of foot-loose nature (such as textiles) can be established in such region to attract location of other industries specially those which generally grow up around a big industrial unit and serve the mother unit by providing smaller items, spare parts, etc" [9].

(5) Growing points and Industrial Estates : Another strategy for regional development will be to establish some "growing point" at strategic places of business and commercial interest. The growing points will definitely help cluster industrial activities. Growing Points may also be effected with the establishment of industrial Estates where basic facilities like power, transport, communications, etc. would be provided and loan concessions and subsidies may be offered. These estates, if run properly, will help reduce cost of production (and thus provide competitive strength) and will be very effective in developing new industrial bases and in diffusing industrial development.

(6) Special regional development policies : To achieve a balanced industrial development in the country, adoption of some special development policies may act as a very effective strategy. These policies may be of both positive and negative nature. As regards the negative actions, it may be said that those existing facilities and policies which inflated the regional unbalances should be abandoned. For example, easy credit facilities and issure of licences for new industries in older industrial places may be kept suspended. On the other hand, in backward areas a positive policy package like those of granting tax holidays and tax rebates along with fiscal and credit incentives may be provided for some time. The non-availability of gas in this region makes industries depend entirely on more expensive electricity. So long as the

extension of gas pipeline to this region is not possible, differential rates of electricity may be introduced for this region.

(7) Greater transport network including the Jamuna bridge : This region remains secluded without a broader transport network linking it with the whole of the country. The non-existence of a bridge over the river Jamuna is the main cause of this isolation. There is no denying the fact that the absence of such a bridge is creating serius obstacles to (a) the balanced development of industry, (b) distribution of energy, and (c) the development of the transport and communication system over the whole country. One would only hope that the construction of this bridge, for which efforts have been initiated will not aggravate backward effects leading to serious resource depletion and consequent deterioration in the economic condition of the North-Western people. Instead of proving itself to be an error for North-West region, let the Jamuna bridge become a big asset not only for this region alone but also for the country as a whole.

REFERENCES

1. Khan, A.R. : The Economy of Bangladesh, Macmillan Press, London, 1982.
2. The Committee for Removal of Disparity between Northern and Eastern Regions of Bangladesh; Bulletin No. 1, Government of Bangladesh, Dhaka, 1978.
3. Mujeri, M.K. and Alauddin M. : Regional Distribution of Industrial Development in Bangladesh, Bangladesh Journal of Political Economy. Dhaka, 1984.
4. BSCIC : Survey Report on Small Industries of Bangladesh, Dhaka, 1978.
5. Islam, N. : Development Planning in Bangladesh : A Study in Political Economy, 1977.
6. Planning Commission : The Second Five Year Plan, Government of Bangladesh, Dhaka, 1980.
7. Planning Commission : The Third Five Year Plan, Government of Bangladesh, Dhaka, 1985.
8. Hamid, M.A. : Regional Development Strategy in Bangladesh, Bangladesh Journal of Political Economy, Dhaka, 1984.
9. Hossain, A.M.M. : Industrialisation in Northern Region of Bangladesh : Problems and Policy Proposals, Bangladesh Journal of Political Economy, Dhaka, 1984.

KARL MARX, JOSEPH SCHUMPETER J. M. KEYNES

Karl Marx and His Analysis of Capitalism Some A-Posteriori Reflections

MD. NAZRUL ISLAM *

I. Capitalism : The Basic Marxian Proposition

It is now over one hundred years that the man named Karl Marx had died. This was a century of tumultuous events of far reaching consequences following one after another. On the one hand rapid succession of scientific technological innovations has resulted in colossal improvement in man's productive power. on the other hand, this was the century during which great revolutions shook the world, devastating wars ravaged continents, mighty social upheavels swept across countries. As a cumulative expression of all these, we now find the social make-up of the world greatly changed. No longer have we a single world; rather we now have to reckon with three worlds within one. On the one hand, we have a world of socialist countries; on the other, there is the world of developed capitalist countries. And yet there is a Third World consisting of countries variously labelled as from the optimistic 'developing' to the rather unpleasant'underdeveloped'. In a word, therefore, the world has profoundly changed since the time of Karl Marx's death.

But symbolically it was precisely fact of change that constituted almost the whole point that Marx wanted to establish.

"I refer e.g. to the Blue Book published within the last few weeks: 'Correspondence with Her Majesty's Missions Abroad, regarding Industrial Questions and Trade Unions'. The representatives of the English crown in foreign countries there declare in so many words that in Germany, in France, to be brief, in all the civilized states of the European continent, a radical change in the existing relations between capital and

* Department of Economics, University of Dhaka.

labour is as evident and inevitable as in England. At the same time, on the other side of the Atlantic Ocean, Mr.Wade, Vice-President of the United States, declared in public meetings that, after the abolition of the slavery a radical change of the relations of capital and of property in land is next upon the order of the day. These are signs of the times, not to be hidden by purple mantles or black cassocks. They do not signify that tomorrow a miracle will happen. The show that, within ruling classes themselves, a foreboding is dawning, that the present society is no solid crystal, but an organism capable of change and is constantly changing".-- wrote Marx in his preface to Capital [18,vol.1;21].

In fact it was this profound understanding of society as an organism existing in the constant process of change and mutation which distinguished Marx from all the erstwhile scholars who had tried to understand the functioning of the new economy and it was this which made it possible for Marx to offer the most penetrating analysis of capitalism. The name of Ricardo, whom Marx referred as the 'genius' economist crowing English classical political economy, becomes particularly relevant in this respect. In fact, as is known, Marx seemed to agree with Professor Sieber's reading that "his (Marx's) theory of value, money and capital,....., in its fundamentals is a necessary sequel to the teaching of Smith and Ricardo" [18,vol.1;26]. With Ricardo, as we know, capitalism in the long-run was not baving a very bright future. This was not because he was apprehending the danger of workers rising together to put an end to capitalism. Rather, Ricardo consistently upheld his (labour) theory of value. In doing so he had to inevitably arrive at the conclusion that, leaving aside rent, the share of wages and profits in the value of the commodities (created by labour) are inversely related. One can increase only to the detriment of the other. Thus, the deep seated conflict between the class of wage-labourers and of capitalists was already exposed in the Ricardian system. But this did not pertrub Ricardo. The bourgeoisie was still on the ascendence and working class still only in the stage of formation. Malthus 'Population Theory' was at hand to remain assured that wages can never exceed the level of a bare subsistence minimum. If yet Ricardo's long term scenario for capitalism was gloomy it was due to his discovery of the law of diminishing returns in agriculture. Rate of profit would be falling because increasingly cultivation will have to spread to worser soils making the wage-goods dearer and creating the possibility for the landlords to increase their parasitic claim of rent. He therefore fought against corn laws so as to allow cheap-corn from the fresh lands of the colonies to flow in, thereby preventing wages to rise, or what is the consequence of the same, profits to fall.

But Ricardo could see no further. Instead; in his otherwise remarkably consistent system two fundamental flaws remained. First, Ricardo by-paased the task of explaining, on the basis of labour theory of value what constitutes the most important area of exchange under capitalism, namely the exchange between the capitalists and the wage-labourers. And secondly, Ricardo was struggling to his last day to solve the renowned transformation problem. He was finding himself trapped in a apparent circularity of dependence between the rate of profit and relative prices of the commodities of different lines of production. This was a problem which was impossible to resolve without the concepts of surplus value and rate of surplus value- concepts which were inherently absent with Ricardo who had all along remained confined to the surface-category of profit only.

This was the scientific height reached by classical political economy which Marx could inherit. After Ricardo, with the trade union movement (class struggle) taking "more out-spoken and threatening forms", the disintegration of the Ricardian school was more than inevitable. On the one hand, men like Hodgskin and others could take up a pro-worker stand basing themselves on Richardo's theory of value; on the other hand, sposkesmen like Senior Bastiat and others made no secret of their discarding the Ricardian positions and thereby retreating from the Ricardian achievement in going to the depth of the capitalist economy. Still others like games Stuart Mill continued in their attempt" to reconcile the irreconcilables".

It was in this setting that Marx took up the task of analysing capitalism. The explicit purpose of his investigation into the political economy of capitalism was, in his own language, "to lay bare the economic law of motion of modern (i.e. capitalist----N.I.) society" [18,vol.1;20]. This was the "ultimate aim" of his work (Capital).

From these very opening sentences we can therefore note there characteristic aspects of Marx's view of capitalism and for that matter, any human society in general. First, that it is an organic entity. Second, that it exists in a constant process of change, change resulting into mutation. And thirdly, that this constitutes a natural process, a process independent of individual human will. All these insights with which Marx could approach the task of analysing capitalism were the results of his earlier investigation into the law of motion of human societies in general. By 1845 Marx (in collaboration with F. Engels) has already accomplished what Althusser has proposed to term as an 'epistemological break' [2;32-9 and 3;44-5] and event which Althusser further interpreted as a revolution inscience which had to coincide with the founding of a new science— the science of history, commonly

known as historical materialism. This materialist conception of history to which Marx finally arrived in his 'Theses on Feuerbach' and more fully in their voluminous 'The German Ideology' (in which they said to have settled accounts with their ersthile philosophical conscience) received adequately matured formulation in Marx's famous 1859 preface ot the 'curtain raiser' 'A contribution to the Critique of Political Economy'. There Marx succintly formulated the general law of motion of society i.e. the law of change of production relations with the change in the level of productive forces. It was discovery of these laws which allowed Marx to rise to a higher 'epistemological terrain' from which it was possible for him to see further than was possible for the classical economists. In the language of Althusser it was this 'change of terrain' which allowed Marx to overcome the 'myopia' from which classical economists suffered and to see there where Adam Smith or David Ricardo could not see. Thus to Marx capitalism appeared as yet another historical phase through which human society has to pass in its evolution through successive stages, just as the preceeding feudalism was one.

The evolution of societies through successive stages was to Marx a natural process. It was not a question of personal disliking towards one particular type of society or the other. He, therefore, could display a remarkable dispassionate attitude in appreciating the progressive achievements of capitalism.

"The bourgeoisie, historically, has played a most revolutionary part. The bourgeoisie---has accomplished wonders far surpassing Egyptian pyramids, Roman aqueducts, and Gothic cathedrals..... The bourgeoisie during its rule of scarce on hundred years, has created more massive and more colossal productive forces than have all preceeding generations' together" [22;436-7].[1]

These were the lines that Marx could incorporate in the 'Manifesto of the Communist Party', a document he was writing precisely to conduce to the activity of putting an end to the capitalist mode of production, in other words, to the bourgeois rule. To him the capitalists and the landlords were just personia de stage, as natural product of history as their opposing proletariat was. He had therefore even his regrets offered to them.

"To prevent misunderstanding, a word,—wrote Marx, —I paint the capitalists and the landlord in no sence couleur de rose. But here individuals are dealt with only in so far as they are personifications of

---

1. Quoting this passage Whilliam J. Baumol and Alan S. Blinder, authors of a popular text-book on economics had following to remark, "Except for Marx's use of the word bourgeoisie, the following passage,,, might have been penned by a publicist for the Chamber of commerce" [5;768].

economic categories, embodiments of particular class-relations and class interests. My standpoint from which the evolution of economic formation of society is viewed as a process of natural history can less than any other make the individual responsible for relations whose creature he socially remains, however much he may subjectively raise himself above them" [18, Vol. 1; 20-21].[2]

Starting from such a dispassionate natural history-view-point, Marx was able to discover such laws of motion of the capitalist mode of production as enabled him to show how the very capitalist relations of production, under which the productive forces so far developed, ultimately become a hindrance. They become more and more incompatible with the increasingly pronounced social character of production, which in turn is the very outcome of the development of productive forces. Thus capital itself becomes the barrier of capitalist mode of production. As the antagonistic contradiction between private appropriation and social character of production (which according to Marx is the basic contradiction of capitalist mode of production) exacerbates, it becomes objectively necessary to replace the private, capitalist ownership over means of production by collective, social ownership for further unhindered development of the society. In other words, replacement of capitalism by the socialist mode of production becomes the task of the day. And the working class, because of the objective position it occupies under capitalism, is destined to take the lead in accomplishing this historical task. Capitalism thus ultimately yeilds to the emergence of socialist society and itself remains remembered as the preceeding spectacular phase through which mankind had to pass and during which a qualitatively higher level of productive forces was achieved which could form the objective basis on which the construction of socialist society would proceed.

This however could not happen during Marx's life-time. The first attempt to establish a workers' state in the form of Paris Commune could not withstand the joint France-Prussian onslaught and was defeated. It was at the turn of the century with the victory of October Revolution in Russia in 1917 that political pre-conditions were met for the first time for the emergence of a socialist economy, though in a single country. In the Marxian parlance, this inaugurated the General Crisis of capitalism as a socio-economic formation, meaning thereby that the transition of human

---

2. Touching upon a different point Marx can also be found to state : "Intrinsically, it is not a question of the higher or lower degree of development of the social antagonisms that result from the natural laws of capitalist production. It is a question of these laws themselves, of these tendencies working with iron necessity towards inevitable results" [18, vol.1;19].

societies from the capitalist stage to that of socialism has already begun. The emergence of socialist states in a number of countries of East Europe and Far East in the aftermath of the vioctory of Red Army over German fascism and Japan led to the extension of socialism from one lone country to that of a comunity of countries. This is held to signify the second stage of capitalism's general crisis. With the gaining of strength of the socialist countries and collapse of the colonial system etc., a situation arose in the late fifties when, in Marxist expression, due to a significant shift in the balance of power, imperialism had lost its historical initiative, i.e. imperialism was no longer the sole controller of events. This is said to denote the third stage of the general crisis of capitalism. Since then more than two decades have passed. And now we may have reached yet another threshold point when the question whether socialism will be able to achieve an ultimate victory through economic competition with capitalism within the frame work of peaceful coexistence of opposing social systems or a nuclear holocaust will intervene to put an end to human civilisation altogether seems to be hanging in the balance.

II. Marx's Theory of Periodic Crises of Capitalism

But if Marx did not happen to live to see the beginning of capitalism's 'General Crisis' in the above sense, he nevertheless witnessed much of capitalism's periodic crises. In fact, success in explaining capitalism's periodic crises was and still remains the touch-stone of success of analysing capitalism in general. Ricardo did not have to face this disconcerting task. Capitalism's first crisis of general overpruduction dates back to 1825. In Marx's language "...with the crisis of 1825 it (capitalism) for the first time opens the periodic cycle of its modern life". [18,vol. 1;24]. Before that "modern industry itself was only just emerging from the age of childhood."[3]

Ricardo therefore did not have to face the task of explaining capitalism's periodic crisis, the main features of which are general over-production and unemployment. It was not that over-production did not at all occur during Ricardo's life-time. But these were still not "general crises of the world market, arising out of the production process itself".[4] Ricardo therefore could explain, for example, that the crises which occurred between 1800 and 1815 were caused "by the rise in the

---

3. We can note the analogy to see Marx's conception of capitalist society as an organism which is born, grows up, matures and ultimately paves way for the emergence of a new society.

4. "Ricardo himself did not actually know anything of crises, of the world market, arising out of the production process itself" [19, Part II; 497].

price of corn due to poor harvests, by the devaluation of paper currency, the depreciation of colonial products etc., because in consequence of the continental blockade, the market was forcibly contracted for political and not economic reasons".

He was also to explain the crises after 1815, partly by a bad year and a shortage of corn, and partly by the fall in corn prices, because those causes which according to his own theory had forced up the price of corn during the war when England was cut off from the continent, had ceased to operate, partly by the transition from war to peace which brought about sudden changes in the channels of trade. In short, these were 'accidental' causes of 'accidental' and 'partial' over-production.

But as Marx noted, "Later historical phenomena, especially the almost regular periodicity of crises on the world market, no longer permitted Ricardo's successors to deny the facts or to interpret them as accidental". [19, Part II; 497]. Instead, in a attempt to explain the crises economists at the time invented a distinction between 'over-abundance of capital' and 'over-production'. "Against the latter, they arm themselves with phrases and good reasons used by Ricardo and Adam Smith, while by means of the over-abundance of capital they attempt to explain phenomena that they are otherwise unable to explain" [19, Part II]. But ironically it was Ricardo himself who could see that the statment that no over-production (of commodities) is possible is synonymous with the statement that no plethora or over abundance of capital is possible. Citing extensively from Ricardo's argumentation in this regard.[5] Marx therefore scornfully put the question : "What then would Ricardo have said to the stupidity of his successors, who deny over-production in one form (as a general glut of commodities in the market) and who, not only admit its existence in another form, as over production of capital, plethora of capital, over-abundance of capital, but actually turn it into an essential point in their doctrine ?" [19;498].

In fact, falling into such glaring inconsistencies as that of finding distinction between over-production of commodities and over-production of capital only went to indicate the extremely shallow level of understanding of these, whom Marx termed as the 'epigons of classical political economy'. There was, on the other hand, also an attempt on some others' part to explain away crises only on the basis of credit. But obviously this was again just only another way of

---

5. For example, Ricardo put up the question : "Is the following quite consistent with Mr. Say's principle : 'The more disposable capitals are abundant in proportion to the extent of employment for them, the more will the rate of interest on loans of capital will fall'. If capital to any extent can be employed by a country, how can it be said to be abundant, compared with the extent of employment for it ?" [19; Part II;108]

presupposing over-abundance of capital. In short, in face of the obvious fact of periodic crises manifesting themselves in general over-reductions, economists, avowedly successors of the classical school, found themselves quite in a disarray.

The root of the problem was the inability of all these economists to recognise the possiblity of over-production of commodities inherent with the capitalist commodity production. But in this they were following none other than Ricardo himself. Ricardo, unfortunately, had adopted in this regard the position of Say that 'supply creates its own demand'.[6] But with his characteristic acuteness Ricardo had already detected the inconsistency of Say who was speaking of 'disposable capital (being) abundant in proportion to the extent of employment for them' while at the same time swearing by his law of markets. As for Ricardo's accepting Say's notorious formulae, Marx had only rebuke for him. Citing Ricardo reterating the statements of Say on this point, Marx pungently commented, "This is the childish babble of a Say, but it is not worthy of Ricardo" [19, Part II;502]. Marx's contempt for the 'vulgur political economy' of Say was particular. In another instance where Ricardo was reproducing Say's dogma about the identity between demand and supply, Marx remarked, "Since Ricardo cites Say, we shall criticise Say's theories later, when we deal with this hubug himself" [19, Part II;494].

To Marx, However, the periodic crises were the concentrated expression of all the contradictions and antagonisms of the capitalist mode of production. "In the crises of the world market, the contradictions and antagonisma of bourgeois production are strikingly revealed", wrote Marx [19, Part II; 500]. Or, for another instance; "The world trade crises must be regarded as the real concentration and forecible adjustment of all the contradictions of bourgeois economy" [19;509]. He further felt that. "The individual factors which are condensed in these crises, must therefore emerge and must be described in each sphere of the bourgeois economy and the further we advance in our examination of the latter, the more aspects of the conflict must be traced on the one hand, and on the other hand it must be shown that its more abstract forms are recurring and are contained in the more concrete forms"[19;509-10][7]

---

6. Maurce Dobb however pointed out that this viewpoint can be traced back to James Mill. But Say being the most unreserved spokesman of this view, in the history of Economics it has gone as Say's Law and Ricardo also always referred to Say's statements in this regard [8;40-41].

7. Marx can be found repeating the same theme in yet another place: "The contradictions inherent in the movement of the capitalist society impress themselves upon the practical bourgeois most strikingly in the changes of the periodic cycle through which modern industry runs and whose crowning point is the universal crisis" [18, vol. 1; 29].

In contrast to his predecessors, Marx deciphered the abstract possibility of crisis at the very outset of his analysis of capitalism. As is known, Marx started analysing capitalism with the analysis of the 'Value' form of commodities which according to him is the economic cell-form of the capitalist society.[8] In the very first Part of Capital Vol. 1, Marx noted : "Nothing can be more childish than the dogma, that because every sale is a purchase, and every purchase a sale, therefore the circulation of commodities necessarily implies an equilibrium of sales and purchases. If this means that the number of actual sales is equal to the number of purchases, it is more tautology. But its real purport is to prove that every seller brings his buyer to market with him. Nothing of the kind. the sale and the purchase constitute one identical act, an exchange between a commodity-owner and an owner of money, between two persons as opposed to each other as the two poles of a magnet. They form two distinct act, of polar and opposite characters, when performed by one single person,.... Since the first metamorphosis of a commodity is at once a sale and a purchase,it is also an independent process in itselt. The purchaser has the commodity, the seller has the money, i.e., commodity ready to go into circulation at any time. No one can sell unless some one else purchases. But no one is forthwith bound to purchase, because he has just sold.[9] Circulation bursts through all restrictions as to time, place and individuals, imposed by direct barter. If the interval in time between two copmlementary phases of the complete metamorphosis of a commodity become too great, if the split between the sale and the purchase become too pronounced, the intimate connection between, their oneness, asserts itself by producing— a crisis" [18, vol 1;114-5].

---

8. Celebrated is Marx's following expression in this regard : "The value-form whose fully developed shape is the money-form is very elementary and simple. Nevertheless, the human mind has for more than 2000 years sought in vain to get to the bottom of it, whilst on the other hand, to the successful analysis of much composite and complex forms, there has been at least approximation. Why ? Because the body as a whole, is more easy of study that are the cells of that body But in the bourgeois society the commodity form of the product of labour, or the value-form of the commodity--is the economic cell-form. To the supperfical observer, the analysis of these forms seems to turn upon minutiae. It is fact deal with minutiae, but they are of the same order as those dealt with in microscopic anatomy". [18, vol. 1;19].

9. "During a crisis, a man may be very please, if he has sold his commodities without imediately thinking of a purchase". [19, Part II; 503].

Marx therefore deduced the possibility of crisis from the very fact of splitting up of the two metamorphoses of commodity circulation with the emergence of a general equivalent (money), which is but an inevitable consequence of the development of commodity production. Thus when J.B. Say and his followers were finding identity between supply and demand they were doing this by forgetting very elementary truths about capitalism that it is a system of commodity production which leads ot the bifurcation of the commodity world into commdities on the one hand and money on the other, and that money can assume the role of store of value. They were taking exchange of commodities as more barter of products, of simple usevalues. And Marx Commented that "This is a return not only to the time before capitalist production but even to the time before there was simple commodity production [19,Part II;501].[10]

To be accurate, it should be mentioned here that even at the level of analysis of commodity and money, Marx attempted to distinguish two forms of crisis. In his opinion," crisis in the first form is the metamorphosis of the commodity itself, the falling as under of purchase and sale." And "the crisis in its second form is the function of money as a means of payment, in which money has two different functions and figures in two different phases, divided from each other in time. Both these forms are as yet quite abstract, although the second is more concrete than the first" [19, Part II;510]. To this he further added that, "The form mentined first is possible without the latter-that is to say, crises are possible without credit, without money functioning as a means of payment. But the second form is not possible without the first— that is without the separation between purchase and sale" [19, vol.1;514]. In other words, Marx proves that it is erroneous to try to explain away crises simple by indicating to the (newly emerged at that time) phenomenon of credit.

But obviously an abstract possibility of crisis is not yet a crisis, or the inevitability of it. And Marx was quite aware of it. Just after deducing the 'possibility' he was therefore quick to add that, "These modes (i.e. modes of motion or development of the contradictions immanent in a commodity in the antithetical phases of metamorphosis of a commodity) therefore imply the possibliity, and no more than the possibility, of crises.

---

10. It is interesting to note in this regard Marx's following casual remark : "In no science is such a big fuss made with common place truisms as in Political Economy. For instance J.B. Say sets himself up as a judge of crises, because, forsooth, he knowes that a commodity is a product" [18, vol.1; 146].

The conversion of this mere possibility into a reality is the result of a long series of relations.....[18,vol.1;115].[11] It is the analysis of these relations which remained the other half of the task. "The general, abstract possibility of crises denotes no more than the most abstract from of crisis, without a content, without a compelling motivating factor. The factors which turn this possibility of crisis into (an actual) crisis are not contained in the form itself; it only implies that the framework for a crisis exists" [19, Part II;509]. This compelling motivating factor which turns the possibility of crisis into a crisis has to be found out if the theory of capitalist crises is to attain completeness.

As a first step to it Marx shows that under capitalism what happens is an interwining and coalescence of the processes of reproduction or circulation of different capitals. The first metamorphosis of one capital must corres pond to the second metamorphosis of the other. Transformation of one capital from the form of commodity into the form of money, must correspond to the transformation of the other capital from the form of money into the form of commodity. Thus in the reproduction process of capital, the abstract forms of crisis of simple commodity production are not simply repeated, "Rather only here they receive a content, a basis on which to manifest themselves" [19, Part II;510].

The interwining and coalescence of the processes of reproduction and circulation of different capitals is on the one hand necessary (necessitated by the division of labour) but on the other hand it remains purely accidental. Capital thus 'provides a much more concrete basis for turning the possibility of crisis into reality' and 'the definition of the content of crisis (thus) becomes already fuller' [19, Part II; 511].

Yet the 'further development of potential crisis (remains) to be traced' [19;512]. and Marx senses that, '....this cannot be shown dealing with the production process itself, for the latter is not concerned with the relisation, either of the reproduced value or of surplus value..... [19, Part II; 513]. In other words, crisis of over-production, appears in the first

---

11. In fact Marx even rebuked those economists who attempted to present the possibility of crisis as reasons of their actual occurence. "Incidentally those economists are no better,— wrote Marx, —who (like John Stuart Mill) want to explain crises by these simple possibilities of crisis contained in the metamorphosis of commodities such as the separation between purchase and sale. These factors which explain the possibility of crises, by no means explain their actual occurrence. They do not explain the possibility of crises, by no means explain their actual occurrence. They do not explain why the phases of the process come into such conflict that their inner unity can only assert itself through a crisis, through a violent process. This separation appears in the crisis, it is the elementary form of crisis. To explain the crisis on the basis of this, its elementary form, is to say to explain crisis by the crisis" [19, Part II;503].

place, as a crisis of realisation. Marx very vididly illustrates (his example of calico) how "For a crisis (and therefore, also for over production) to be general, it sufficess to affect the principal commercial goods" [19, Part II;505]. (In passing we may note here that subsequently we would enconunter the prective of referring to particular periodic crises not only by the years in which they occurred but also by the name of the industries, from which these initially 'picked up', although we would not be knowing to whom to properly ascribe the credit of first indicating to these realities.

Marx however, realised that this was "....a two-edged argument. If it is easily understood how over-production of some leading articles of consumption must bring in its wake the phenomenon of a more or less general over-production, it is by no means clear how over-production of these articles can arise."

"...Whence does it come in the former?" [19, Part II; 524]. was the question.

Marx was very emphatic to distinguish between over-production of products and over-production of commodities or between over-production in the absolute sense and over-production relative to, what we now call, the effective demand. "What after all has over-production to do with absolute needs?" asked Marx. "It is only concerned with demand that is backed by the ability to pay. It is not a question of absolute over-production—over-production as such in relation to the absolute need or the desire to possess commodities. In this sense there is neither partial nor general over-production." [19, Part II;506]. A few pages further Marx once again takes up the issue. "The word over-production in itself leads to error," he notes. "There can be... absolutely no talk of an over-production, in the sense that the amount of products is excessive in relation to the need for them. On the contrary, Marx continues, —it must be said that, on the basis of capitalist production, there is constant under-production in this sense..... over production of products and over-production of commodities are two entirely different things" [19, Part II; 528]

Thus over production talked about is not over-production in the absolute sense, not in relation to men's absolute needs and necessities. These are over-productions only in a realitive sense, in relation to the 'demand backed by the ability to pay'. And under capitalism this demand fails to keep pace with the production possibilities because with this mode of production there is an inherent contradiction between production and consumption.

"Over-production is specifically conditioned by the general law of the production of capital: to produce to the limit set by the productive

forces, that is to say, to exploit the maximum amount of labour with the given amount of capital, without any consideration for the actual limits of the market or the needs backed by the ability to pay; and this is carried out through continuous expansion of reproduction and accumulation, and therefore constant reconversion of revenue into capital, while on the other hand, the mass of producers remain tied to the average level of needs and must remain tied to it according to the nature of capitalist production" [19, Part II; 534-5].

'The whole aim of capitalist production is appropriation production is appropriation of the greatest possible amount of surplus labour' Operation of the law of surplus value makes capitalists to try to keep wages as minimum as possible. This was and remains one of the main ways by which capitalists try not only to prevent the profit rates from falling but actually to increase the profit margins. But however 'roundabout' (Bohm Bawerk) the production process may happen to be or whatever may be the extent to which 'capital-deepening process' (Wicksell) has proceeded, all production is ultimately linked with the production of Department-II, or the production of consumer goods. Thus the boundless striving of the capitalists to extract as much surplus value as possible by extending production to the furthest limit cannot but ultimately come to conflict with the narrow bounds of consumption which it has itself created by limiting wages to a minimum possible level and often by pushing then down below the value of labour power. Capitalism has no escape from this inherent to it contradiction and herein we find that 'compelling motivating force' which makes crises an ivevitability, the force that turns the possibility of crisis into a cirsis.[12]

---

12. While emphasising Marx's reference to the contradiction between production and consumption under capitalism as one of the factors leading to crises, we should however note that Marxian conception in this regard differed fundamentally from the naive under-consumptionist views like that of Malthus or Sismondi. Malthus 'apprehension about possible shortfalll in consumption demand owed more to his pre-occupation to safeguard landlords' interests than any clearly propounded economic logic; and Keynes, when he commented that economics had done better if followed Malthus line of thought than Ricardo's, he was in fact ignoring much and was actully making only a jest. On the other hand, while Sismondi and others were maintaining that it was in principle impossible to realise all the capitalist produce within capitalism and therefore the presence of a 'third' sector (adjunct) was inevitably necessary, Marx termed such a view erroneous. He, on the contrary, very elaborately showed how not only simple but also extended reproduction was technically quite possible within the limts of capitalism, [18, vol.II]. Understanding of the reasons of crises therefore required, Marx indicated, a far more profound understanding of capitalism, its nature and properties.

But capitalism is beset not with the contradiction between production and consumption only. Inherent with it is the other contradiction---that between 'organisation of production in individual enterprises on the one hand and anarchy of production in society on the other'. Capitalism is not a system of social production in which society "as if according to a plan distributes its means of production and productive forces in the degree and measure which is required for the fulfilment of various social needs, so that each sphere of production receives the quota of social captial required to satisfy the corresponding need" (19;528). Hence the various proportions between the different departments and branches of production that are necessary for the social reproduction process to go unhindered (which Marx meticulously worked out in his schemes of re-production in Capital, Vol. II) are under capitalism attained only accidentally. With increasing social character of production units and increased intensity of interwinement and coalescence of the circuits of different capitals are the two indices and the growth of the whole edifice of credit and stock market structure allowing almost perfect inter-industry and inter-location mobility of capital on the other, the possible amplitudes of fluctuation and the rapidity with which cumulative processes can work themselves out can easily be understood. Crises would then appear to be an almost any day event. Is there then any objective basis for some regularity in the occurrence of crises?

In this respect we find that Marx could hint upon an actual material basis for the periodicity of the crises. Here is what he wrote in this regard:

"As the magnitude of the value and the durability of the applied fixed capital develop with the development of capitalist mode of production, the lifetime of industry and of industrial capital lengthens in each particular field of investment to a period of many years, say of ten years on an average. Whereas the development of fixed capital extends the length of this life on the one hand it is shortened on the other by the continuous revolution in the means of production which likewise incessantly gain momentum with the development of capitalist mode of production. This involves a change in the means of production and the necessity of their constant replacement, on account of moral depreciation, long before they expire physically. One may assume that in the essential branches of modern industry this life cycle now averages 10 years. However, we are not concerned here with the exact figure. This much is evident: the cycle of interconnected turnovers embracing a number of years, in which capital is held fast by its fixed constituent part, furnishes a materails basis for the periodic crises. During this cycle business undergoes successive periods of depression, medium activity, precipitancy, crisis. True, periods in which capital is invested differ

greatly and far from coincide in time. But a crisis always forms the starting piint of large new investments. Therefore, from the point of view of society as a whole, more or less, a new material basis for the next turnover cycle" [18, vol.II;188-9].

Stopping short of any further elaboration, we can then see that Marx had a full developed theory of capitalism's periodic crises. This was not something separate from Marx's analysis of capitalism in general.On the contrary, his theory of the periodic crises, as we could see from the narration above, was the logical outcome and in fact the crowning point of his analysis of capitalism. If we are allowed to repeat, to Marx, the periodic crises were 'the real concentration.....of all contradictions of bourgeois economy'; all the 'individual factors' of capitalism that he analysed 'are condensed in these crises.'[13] According to him these, periodic crises were the concrete manifestation of the fact that capitalism is facing a barrier, a barrier to the further free development of the productive forces.[14] In a letter to Engels, Marx even hoped to produce a mathematised version of his theory of capitalism's periodic crises.

But if the successors of classical economics were nevertheless trying to explain (however unsuccessfully it may be) crises by resorting to the fact of over-abundance of capital, neo-classical economics would soon prefer to virtually reject the possibility of unemployment and crises. While throwing overboard the classical theory of value and distribution, neo-classicals however clung to one particular of its tenets more fiercely than even the classicals themselves---that of alleged identity between

---

13. In fact in a remarkable passage at the very outset of the sections devoted to the analysis of crises, Marx could summarise all these different factors and contradictions leading to crises in a single sentence : "...the whole process of accumulation in the first place resolves itself into production on an expanding scale which....forms an inherent basis for the phenomena which appear during crises. The criterion of this expansion of production is capital itself, the existing level of the conditions of production and the unlimited desire of the capitalists to enrich themselves and to enlarge their capital, but by no means consumption which from the outset is inhibited, since the majority of the population, the working people, can only expand their consumption within very narrow limits, whereas the demand for labour, although it grows absolutely, decreases relatively to the same extent as capitalism develops. Moreover, all equalisations are accidental and although the proportion of capital employed in individual spheres is equalied by a continuous process, the continuity of this process itself eqully pressposes the constant disproportion which it has continuously, often violently (i.e. crises) to even out" [19, Part II;492].

14. "...the bourgeois mode of production contains within itself a barrier to the free devellopment of the productive forces, a barrier which comes to the surface in crises and in particular, in over-production--the basic phenomenon in crisis" [19, Part II;528]

supply and demand, or the Say's 'Law of Market' (a fact which provoked Keynes to adopt his 'soleeist' position of bracketing Smith-Ricardo with Marshal and Pigou together and label them all as classical economists). Thus supply would be creating its own demand allowing any quantity of goods (commodities) produced to be marketed without any problem of realisation. Employment hence would always proceed until marginal product equalled to wages leaving no scope for involuntary unemployment at the euqilibrium wage-rates. Interest rates would be equiting savings with borrowings and the quantity of supply of money would be determining the price level. So ingrained was the faith in the elegance of this static equilibrium that documents like 'Treasury View' could be put forward when Great Depression was already in half way with its toll and when nothing was more true than Marx's following classic description :

"On the one hand there is super abundance of all the means of reproduction and a super abundance of all kinds of unsold commodities on the market. On the other hand bankrupt capitalists and destitude, starving workers" [19, Part II; 523].

Keynes was then to appear as the saviour of econmics from a total debacle. He found Marx very tedious to read and therefore could claim original the rediscovery of a contradiction between production and consumption under capitalism. With him however this would not appear as a concrete manifestation of the contradiction between productive forces and production relations under capitalism. Instead, a class antagoinsm of capitalism would take the form of an abstract phychological law. According to hum the law of 'Propensity to Consume' is such that people tend to consume less and less of their incremental income. But when all the 'psychological' digression is complete, the point at issue boils down to the problem of insufficiency of 'demand backed by the ability to pay' which Keynes preferred to term as 'effective demand'. But there was trouble with the other component of 'effective demand' i.e. with 'investment' as well. On the one hand, there was the problem of 'marginal efficiency of capital'; on the other this was reinforced by the problem that future was uncertain— a situation which led expectations only to further boost up expectations, while any symptomatic departure from them led to the sudden recoiling back with violent intensity. The laisez faire mechanism was therefore found to be essentially incapable of guaranteeing stable full employment equilibrium. Instead, forces internal to the system operate to subject the capitalist economy to alarming fluctuations. Keynes therefore proposed to discard laissez faire and to regulate capitalism least the violent crises terminate the very continuance of the system.

It thus appears that alomost whole of the Marxian theory of periodic crises of capitalism was resurrected in Keynes. In his train of thought Keynes went so far as to propose 'socialisation of investment', if necessary for maintaing adequate levels of investment and effective demand. This was the point simultaneously of strength and weakness in Keynes 'conception. Of strength because this indicated the acuteness of Keynes' understanding of the necessity of social control arising out of the social character of production already achieved under capitalism. On the other hand, socialisation of investment under capitalism being a sheer impossibility, this betrayed Keynes' failure to understand some of the basic properties of capitalism as a mode of production.

Keynes other 'stabilisers' however became popular and part of the official credo. (In one sense though Keynes was only offering theoretical substantiation of the practical measures that were already there in President Roosevelt's New Deal Undertaken in an effort to overcome the depression.) In the situation of post war boom many started to believe that, thanks to Keynes' 'miraculous' discoveries, capitalism's problem of periodic crises are once for all done with. The crisis of 1957-58 had however already shaken that belief. If, nevertheless, throughout the sixties the milder crises could be attributed to inefficiencies in making use of the Keynesian 'stabilisers', then since the crisis of 1974-75, the whole validity of the Keynesian analysis has been brought to question. The presistent situation of 'stagflation' is not amenable to the original Keynesian frame-work of remedy. Even a cursory review of the different shades of contemporary economics shows that it is impossible to explain the present day economic situation in the developed capitalist countries without taking note of the significant structural changes that have occurred in these economies over the past few decades.[15] Keynesian psychological laws prove very fragile in face of these hard rock realities.

Thus if on the one hand, rediscovery of some of the 'truths' about capitalism (when these 'truths' were already existing in reality in their most violent forms) allowed Keynes to provide a framework for the neoclassical economics to think of crises and involuntary unemployment, then his inability to reckon with their socio-economic content, to reach to their class roots, handicapped his framework from the very out set. With time it was only to become more apparent. Now, in the eighties it is more than obvious that it is the enhanced power of the monopolies to not only withstand but actually increase their profit margins even in a

15. For a commendable discussion of these, see [10;1-28 and 70-122].

situation of depression that is the key to the explanation of the startling phenomenon of stagflation. Thus it is not to psychology of some particular strand, but to the class and production relations we have to revert back in seeking answers to the present day business cycle problems.[16] And it is production relations and class relations in which Marx moored his theory of capitalism's periodic crises,— crises which were, according to him, the most concrete revelation of the fact that productive forces are indeed in a conflict with the production relations, a conflict which according to him will find its ultimate resolution in the negation of capitalist relation of production and establishment of a new type of ownership and thus making capitalism'a passing historical phase'.

III. Colonial Capitalism— The Other Dimension of Capitalism's Crisis

But, if the periodic crises are one dimension of the historical limitations of capitalism, then there is a outher dimension of the same— and it is the latter which is more revelant for us, the people of Bangladesh.

Ever since Marx put forward the materialist interpretation of history and identified several, what he called 'progressive epochs in economic history', there have been different lines of further elaborating and specifying it. One of these have been the 'schematic' or 'parallelistic' way of understanding. According to this interpretation human societies all over the world have been travelling through these phases (epochs) almost in a similar manner, i.e., in the same sequence and with almost the same chronology (or simultaneity). Thus there have been serious works which attempted to decipher in India slavery almost of the same type as in Antiquity and of the same time-span. According to this interpretation it would then emerge that peoples of various parts of the world are moving in a parallel fashion and thus are passing through the successive economic epochs owing to dynamics contained entirely in them.

16. It is quite instructive to note that W.J. Baumol, Alan S Blinder reviewing Marx's theory of capitalism's periodic crises, remarked that, "...in areas such as business cycle analysis almost all modern thinking stems from his, either directly or indirectly" [5;780]. More elaborately, according to them, "In fact, the Marxian models covered such a wide range of cyclical relationships that there is hardly a modern theory of the business cycle that cannot find some antecedent in Marx's writings. And for this reason Marx must be considered the father of all modern cycle analyses"[5;779]. In passing it may be mentioned that Baumol tried to identify several, what he calls, models of business cycles (crises) that can be found in Marx. In fact in these Marx was only hinting upon some of the initial. Jerks from which a crisis may pick up and this does not go to imply any fundamental duplicity of Marx's theory of periodic crises.

Different peoples would then be wholly self-contained units with all the dynamics of their own and hence moving parallely in the same fashion as others in other parts of the world.

Such a viewpont suffers from two types of difficulties. The first is the reality itself. Looking at the contemporary world for example, along with the co-existence of socialism and capitalism, we find not only traces of feudal institutions in some countries but even societies of neolithic, or even of the palaeolithic type existing in some corners of the world. How can a parallelistic way of movement can account for such simultaneous existence of so many different types of societies (epochs) ? Yet such a panorama of diverse societies is true not for the contemporary world only, at some earlier points of time also we find the simultaneous existence of societies of different epochs.

The second difficulty faced by the parallelistic interpretation constitutes in the following. How do we define 'people' ? In other word, what are the boundaries of the entity, 'people' ? This is a problem which is sometimes also expressed as the problem of the 'relevenat unit of analysis',, Is England of the early New Age a separate such unit/entity/people, or it formed only a part of the 'West European whole', from which it cannot be separated if we want to understand the forces that changed the society of that country at that time ? Similarly, can Bengal of the Middle Ages be separated from the rest of India if we want to understand the social dynamics of that time ? Thus, the very problem of demarcating 'peoples' seems to stand in the way of deciphering a 'parallel' movement with peoples all over the world.

Intrinsically a response to the same complexity of the problem of social evolution, another line of argumentation with Marx's statements as the point of departure has been along the Althusser-Balibar and Hindess-Hirst line. (It must be mentioned here that there have been significant contributions from other scholars as well to the stock of these discussions. But the above mentioned names would probably suffice to designate the line of thought referred to.) The main characteristic of this trend has been the rejection of what they term 'empiricism'. Althusser emphasised the distinction between the 'real object' and the 'object of thought' and the function of 'theoretical practice' as 'appropriation of the real object and presenting it as a 'thought concrete'. Apparently there was nothing wrong in it, because these are Marxian utterance about the methodology of political economy which may also be treated to hold for theoretical activity in general. But in doing so Althusser severed in an important way the connection/relation between the aforementioned 'real-concrete' and 'thought concrete'. In the ultimate analysis 'thought-concrete' has to correspond with 'real-concrete' and it is in this

correspondence that the correctness of the 'appropriation' lies. And the criterion of correctness of appropriation or truth of theory is once again 'practice'.

But Althusser arrived at the dictum: 'Marx's theory is not true because it could be successfully put to practice. It could be successfully put to practice because it is true'. He thus assigned a special status to theorecial practice. The legitimacy of any concept is to be determined entirely by its logical coherence in relation to other concepts of the problematic concerned. These concepts are necessary to produce knowledge about any concrete situation or 'conjuncture'. This is because, according to Althusser, Marxian contradictions are fundamentally different from the Hegelian contradictions in the fact that while the latter, are 'essentialist', contradictions in the Marxian sense are always' over-determined'. This was Althusser's theorisation of Lenin's repeated emphasis that 'concrete analysis of the concrete situation-this is what constitutes the soul of Marxism. Rejection of essentialist interpretation of Marx's contradiction (straight away inversion of Hegel), or emphasisation of 'over-determination' of Marxian contradiction was associated with Althusser's rejection of teleology. This was despite Althusser's assertion of a 'structural causality' (as different from 'expressive causality' of the Hegelian system) to be found in a 'practical state' in Marx and the principle of 'determination in the last instance by the economy' to be operative in it.

In fact these were the methodological foundations which ultimately led to (or which Althusser found out for) his 'rejection of empiricism' with respect to theoretical practice. The demand of correspondence and assertion of this correspondence through (other than theoretical) practice was now very weak and remote. The criterion of validity of concepts was now different. It was to be entirely resolved in the realm of thought. Thus an artificial distance has been created between the 'real object' and the 'object of thought' and hence a misrepresentation of the function of 'appropriation of real by thought and its representation as a thought concrete'.

It is through this unwarranted gap, in this unwarranted space, that much theoretical activity flourished. Drawing inspiration from Althusser, Etienne Balibar thus found out "the possibility of an a priori science of the modes of production, a science of possible modes of production, whose realisation or non-realisation in real concrete history would depend on the result of a throw of the dice or on the action of an optimum principle" [3;226]. And Balibar actually proceeded to construct one such theory "based on a variation of the connections between a small number of elements which are always the

same" [3;224]. His was therefore a combinatory approach. Different modes of production appears as different combination of the same elements. And Balibar disginshished two types of modes of production: transitional and non-transitional. The latter are those whose conditions of existence are reproduced along with the reproduction of the economy while the transitional ones are those where such auto-reproduction of the conditions of existence are not occurring. Balibar however could not carry his project further. He could not elaborate the concepts of different concrete modes of production. Moreover within his framework it was difficult to see how a non-transitional mode of production would ever be transformed into a transitional one. Balibar himself acknowledged these difficulties in his 'Self-criticism'.

But Barry Hindess and Paul Hirst would then take up the task. They discarded Balibar's idea of arriving at the concepts of different modes of production from just variation of connections between the same elements. Instead they set out to test the legitimacy of the notion of "various pre-capitalist modes of production briefly indicated in the works of Marx and Engels". They adopted a definition of mode of production as "an articulated combination of relations and forces of production structured by the dominance of the relations of production" [13;9] and attempted to apply this definition for their above mentioned purpose, The mode of proof turned out to be the possibility or impossibility of deducing corresponding forces of production from the relations of production specified. If the deduction is possible then the concept of the pertinent mode of production is declared justified; if not, then the concept of that mode of production is termed as invalid. Thus every thing happens in the realm of 'theory' and proceeds in just the opposite derection than was suggested by Marx ! History, or the actual course of events has nothing to do with the 'work in theory' of Hindess and Hirst. In fact, their so called 'rejection of empiricism' went to such an extent that towards the close of their book they are found to make such arrogant statements as "we reject the notion of history as a coherent and worthwhile subject of study" [13;321] or "Marxism, as a theoretical and political practice, gain nothing from its association with historical writing and historical research. The study of history is not only scientifically also politically valueless" [13;312]. Two years later Hindess and Hirst would however be proposing to discard the very concept of mode of production and to operate with the concept of social formation only. According to their new realisation then, "the effect of concentration on the conceptualisation of the modes of production is the restriction of analysis to an extremely limited range of economic class relations and the consequent neglect of the problems of conceptualising more complex forms of class relations. We argue that it is necessary to develop concepts

of economic class relations and their conditions if existence in definite social formations". Their "present text (therefore) rejects the pertinence of the concept of mode of production" [14;2]. What ultimately happens therfore is an idealist flight from the initial elevation of the criterion of truth that Althusser proposed. The 'rejection of empiricism' ultimately becomes very akin to an agnostic position and becomes prone to all the consequences that agnosticism suffers from. Yet it was Marx who found his fundamental distinction from Feuerbach in the thesis that, "The question whether objective truth can be attributed to human thinking is not a question of theory but it is a practical question. In practice man must prove the truth, that is the reality and power, the this-sidedness of his thinking. The dispute over the reality or non-reality of thinking which is isolated from practice is a purely scholastic question" [21,vol.1;13].

Meanwhile it were the historians, who through their scrupulous research and painstaking invstigations were offering some very useful insights in understanding the materialist interpretaion of history and solving many of the riddles of the theory of history. Thus D.D. Kosambi, for example, basing on his brilliant studies on Indian history, put forward the following observation. Citing Marx's 1859 classic formulation of the basic proposition of historical materialism, Kosambi added :

"When one applies these inspiring words to the Indian problem, it must be kept in mind that Marx speakes of all mankind where we deal only with a fraction . . . For short periods in restricted localities, a dead end, retogression, or evolution by atrophy are possible which cannot stop the progress of mankind as a whole . . . Marxism is far from economic determinism . . . It will be shown that India had never a classical slave economy in the same sense as Greece or Rome . . . [16;9-10].

In other words, Kosambi indicates that the process of evolution of human societies has to be seen in the context of 'all mankind' or 'mankind as a whole'. In other words, emergence and passing through the 'progressive economic epochs' that Marx enumerates in his 1859 preface has to be seen in the context of the world as a whole, in a global framework. (And while 'for short periods' 'in restricted localities' dead ends or atrophies may occur, mankind as a whole nevertheless progresses through successive social phases.)

Gordon Childe on the other hand in his classic works on pre-history (Man Makes Himself, What Happened in History?) investigated into the process of emergence of neolithic societies from the midst of a palacolithic canvas and subsequently of Bronz Age Civilizations on the basis of the develop productive forces achieved under neolicthic culture.

(In his latter work Childe traced the process upto the emergence of Iron-Age economies of the Antiquity as well). In these works we see that Childe all along deciphers the fact of interaction among peoples playing a pivotal role in propelling the process of social progress. It is through this interaction and intermingling among peoples that technological discoveries are diffused. And not only scientific technological innovations but also the superstructural elements are spread in this way. Childe shows that as a result of such interaction the experience and knowledge gathered by different peoples of different parts are pooled together in some particular places due to the specific circumstances favouring them and this ultimately leads to the emergence of a higher type of economy and society in those places. In other words, different elements of productive forces and ideology that are necessary for the make up of a new society are attained gradually within the erstwhile societies. When they are pooled together, a synthesis occur resulting into a qualitative change, giving rise to a new type of society. Childe used the term 'focii' to denote such favoruable points where these initial formations take place. Once the new, more developed type of society has already emerged, then through the process of interaction and diffusion the transition of the rest of the mankind to the new type of society proceeds. Childe even distinguished between 'primary' and 'secondary' 'focii' in elaboration of the diffusion process.[17]

Thus once again, what is suggested is that it is the global frame-work against which the process of social evolution through successive stages has to be traced, Thus, although the new economies first emerge at the 'focii' these are not the out-come of the focii-regions only. These are the outcomes of the world development as a whole. These are not phenomena of local nature, these are world phenomena finding their expression in particular localities. (For further elaboration of the theme, See [11].

Though some have tried to dubb this as a 'Diffusion Theory' and play down the significance of the findings, its basic proposition that the evolution of societies through successive phases has to be examined in a world frame-work is nevertheless correct. If we look for Marx in this context minutely, we shall see that Marx did not imply any strict

---

17. Thus palaeolithic achievements were pooled together in Near East which gave rise to the neolithic economy. Similarly the great reparian Bronze Age civilizations emerged when all the spectacular achievements and possibilities of neolithic culture were pooled together in these places. Again different discoveries, innovations and possibilities that accumulated in different Bronze-Age centres could combine together in the Mediterranean coast to give rise to the Iron Age civilization of the Antiquity.

parallelism in the process of social evolution that he tried to outline. That he did not, can be seen, for example, from his naming one of the 'progressive epochs' of his 1859 list as 'Asiatic'. Debate about the existence or non-existence of such a mode and hence the validity of its concept is well-known. But obviously here we are not concerned with that debate. What we want to note is Marx's usage of a name 'Asiatic'. Thus, Marx was naming a particular mode of production by the name of a geographical region (a continent). With a strict parallelistic approach; this would be quite illogical. Because then the said Asiatic mode of production would be equally applicable for Europe and other regions in the same manner as for Asia and there would be no point in naming it by the name of one particular geographical region. The same could be said about Marx's usage of 'Antiquity' to designate another mode of production if it went to mean the geographical region concerned and not the particular time period.

On the other hand, we find Marx quite aware of the significance of interaction among peoples in the social evolution process. For one example, this was quite eloquently revealed in Marx's drafts to reply to the Russian revolutionary, V. I. Zasulich who asked for Marx's opinion regarding the question whether or not the Russian village communes were 'capable of gradually discarding their primitive features and developing directly as an element of collective production of a national scale' i.e. of the future socialist economy). It is known that Marx replied in the affirmative and here were his reasons for such an opinion :

"It is precisely the fact that it (the commune) exists at the same time as capitalist production which enables it to take advantage of all the positive achievement of the latter without passing through all its dreadful vicissitudes. Russia does not live in isolation from the modern world" [21,vol.3;153].

"If the spokesmen for the 'new pillars of society' were to deny the theoretical possibility of the evolution of the modern village commune, one would ask them whether Russia was compelled like the West to pass through the long incubation period of developing machine production in order to obtain machines, steamboats, railways etc. One would also ask them how the Russians have managed to introduce in a flash the whole mechanism of exchange (banks, joint-stock companies, etc.) which took centuries to grow up in the West" [21,vol.3;157] and finally,

"the simultaneous existence of Western Production, which dominates the world market, enables Russia to incorporate into the commune all the positive achievements which have been attained by the capitalist system, without passing through its Caudine Forks"[21,vol.3;157].

Thus, even if we do not have to be thorough diffusionists, we find enough indications in Marx that the process of social evolution through successive phases has really to be examined in a global framework, and interaction among peoples is an inherent element of this process. (Those bands of people who remained effectively separated from the rest of the mankind for a long time, were therefore found to be living in an atrophy, for example the aborigines of America, Australia etc. not experiencing the evolutionary phases which mankind as a whole has passed through [II].[18]

The world framework becomes particularly obvious in examining the emergence of capitalism. The Dobb-Sweezy debate in this regard is quite well-known. While Sweezy emphasised the role of 'long distance trade' as a force for dissolution of feudalism and rise of capitalism in Western Europe, Maurice Dobb underscored the importance of 'internal dynamics' of the feudal societies of the area. Definitely both the factors played their respective roles in the said outcome. While on the one hand, 'distance trade' could also result in the sweep of a 'second serfdom' in Eastern Europe; on the other hand, it can not be denied that "the modern history of capital dates back from the creation in the 16th century of a world-embracing commerce and a world embracing market" [18, vol.1;145]. Thus creation of a 'world-embracing commerce', 'world embracing market' was therefore the starting point, a pre-condition for the emergence of capitalism.[19] Indeed sixteenth century was the century of great geographical discoveries when the world suddenly 'expanded' and the virgin continents of America, old civilizations of India and China and the 'exotic' continent of Africa were all brought together in the whirlpool of world commerce, resulting into what Marx termed "the revolution of the world market"[18,vol.1;670]. Of course, this aspect of

---

18. Obviously the forms of interaction and their relative importance have also undergone a process of change with time. Wholesale migration of 'nations' for settling elsewhere as a form of interaction is now obviously of much less importance than it was in pre-feudal, or even pre-capitalist times. Yet on the other hand, the intensity of interaction today is of inconceivably greater degree than of feudal times. That different peoples of different parts of the world are inter-related is so much a glaring reality today that it needs no explanation. On the other hand, the degree of the intensity of interaction and of soil-bounded character of production has found its reflection in the degree of universality of different modes of production. As the degree of intensity of interaction has increased and soil-boundedness of production has decreased, so has increased the degree of universality of successive modes of production. This is very well illustrated by the experience of history.

19. Marx adds the word 'modern' in order to demarcate from what he termed the sporadic beginnings of capitalist production of earlier times. "The capitalist era (starts)from the sixteenth century (though) we come accross the first beginnings of capitalist production as early as the fourteenth or fifteenth century, sporadically in certain towns of the Mediterranean" [18,vol.1;739].

the 'primitive accumulation' was just as far from anything idyllic as was its other aspect, that of expropiation of the peasants of their lands and creation of 'free labourers in the double sense', which formed the other pre-condition for the beginning of capitalism.[20]

"The discovery of gold and silver in America, the extirpation, enslavement and entombment in mines of the aboriginal population, the beginning of conquest and looting of the East Indies, the turning of Africa into a warren for the commercial hunting of black-skins, signalised the rosy dawn of the era of capitalist production. These idyllic proceedings are the chief momenta of primitive accumulation"-- wrote Marx [18,vol.1;703]. To this he further added, "On their heels treads the commercial wars of the European nations, with the globe for a theatre. It begins with the revolt of the Netherlands from Spain, assumes giant dimensions in England's Anti-Jacobin War, and is still going on in the opium war against China, etc." [18,vol.1;703].

Thus the emergence of capitalism takes place 'with the globe for a theatre', with "entanglement of all peoples in the net of the world market, and with this, the international character of capitalistic regime" [18, vol.1:744-5]. The whole purport of the Dobb-Sweezy debate then gets changed. The forces (long distance trade etc.) which seemed to be 'external' to Dobb (and were emphasised to be so by Sweezy) becomes quite 'internal' if globe is to be taken as the theatre. Imposition of colonial rule over a vast part of the world, over great populous civilizations of the East was therefore the just reverse pole of the rise of capitalism in West Europe. "The colonial system ripened, like a hot-house, trade and navigation. The colonies secured a market for the budding manufactures, and, through the monopoly of the market, an increased accumulation. The treasures captured outside Europe by undisguised looting, enslavement, and murder, floated back to the mother-country and were there turned into capital" [18,vol. 1;705].[21]

---

20. This is what Marx wrote about the latter : "The spoilation of the Church's property, the fraudulent alienation of the State domains, the robbery of the common lands, the usurption of feudal and clan property, and its transformation into modern private property under circumstances of reckless terrorism, were just so many idyllic methods of primitive accumulation. They conquered the field for capitalistic agriculture, made the soil part and parcel of capital, and created for the town industries the necessary supply of a 'free' and outlawed proletariat' [18,vol.1;685].

21. To this Marx further added that, "Holland, which first fully developed the colonial system, in 1648 stood already in the acme of its commercial greatness. In the period of manufacture properly so called, it is . . . the commercial supremacy that gives industrial predominance. Hence the preponderant role that the colonial system plays at that time. It was 'the strange God' who perched himself on the altar cheek by jowl with the old Gods of Europe, and one fine day with a shove and a kick chucked them all of a heap" [18,vol.1;705-6].

Thus not only that the emergence of capitalism was a development of the world-theatre, it also, from the very outset, emerged as a world system. The rise of capitalism in Western Europe was associated with the imposition of a colonial system. These were the two poles of the same process, one inseparable from the other. Greater part of the humanity; abidement had to play the role of subjugated colonies, which were looted, plundered, revaged and ultimately deformed so as to pave way for the rise of capitalism. The changes of feudal societies of Europe had to crorrespond with a change of the feudal societies of Asia as well. The social formations that resulted in these colonies in the process of the specific role they had to play in the genesis of capitalism, we propose here to be termed as colonial capitalism. Industrial Capitalism of West Europe had to have a counterpart in the colonial capitalism of these subjugated peoples. Only these two dialectical poles together give the world-system of capitalism.

Now amongst the colonies again the Indian sub-continent was destined to play a very special role. The continents of America emerged in the map only as a result of the Europeans thrust to reach no other 'land of fabulous wealth' than India. The historical 'Triangular Trade' was nothing but a prelude to the subsequent extraction of Indian wealth gratis. And ultimately it was on the heaps of million of Indian's skeletons who had to die in famines, in privation, on the pile of cut off hands of the thousands of weavery of India who had not only to leave their profession but to be crippled for ever that ultimately the glorious Industrial Revolution of England could breakout. Marx could vividly portray the complentarity of these two processes.

"It was the British intruder who broke up the Indian hand-loom and destroyed the spinning wheel. England began with depriving the Indian cottons from the European market; it then introduced twist into Hindostan and in the end inundated the very mother country of cotton with cottons. From 1818 to 1836 the export of twist from Great Britain to India rose in the proportion of 1 to 5200. In 1824 the export of British muslins to India hardly amounted to 1,000,000 yards, while in 1837 it surpassed 64,000,000 yards. But at the same time the population of Dhaka decreased from 150,000 inhabitants to 20,000" [21,vol I;490-1].

That the rise of Britain with its Industrial Revolution of late eighteenth century on the one hand and desintegration and decay of Indian economy on the other (and within India of Bengal in particular, because Bengal was not only the richest province of Mughal India, but also it was here that commercial and political colonisation of India by the Britishers began and it was Bengal which had to pay the highest toll for the

efflorescence, first of commercial and then of industrial capitalism of England) - were two complementary processes, or put differently.two poles of the same intergral process, has been amply documented and substantiated by many notable scholars of India, as also of England, and there is hardly any need of further elaboration of this point here.

The above is, however, not to say that the imprint of the colonial rule on the social formation of these countries has not been emphasised earlier. Notable contribution in this regard has been of Hamza Alavi. He, in his works, has more than many, very scrupulously traced the link between the destitution and impoveristment of India (and Bengal in particular) with that of the occurrence of Industrial Revolution of England. Alavi's more significant contribution has been in his acute understanding of the character of changes brought about by the British rulers in the Indian socio-economic texture. For one example, he could very convincingly show that the land tenure systems (e.g. the permanent Settlement in Bengal) introduced by the Britishers were (contrary to the general belief that these were imposition of feudalism proper, in a non-proper feudal India) actually the introduction for the first time of bourgeoisie relationship on land in India an event which had to simultaneously go with the introduction of British (i.e.bourgeois) legal and judiciary system, i.e. a different 'system of application of force'. But despite these commendable contributions, Alavi falls into an error when he tries to coin a term 'colonial mode of production'. There is nothing which can be called as 'colonial mode of production' if this has to be politico-economically correct. Colonies are specific not to capitalism only. For the civilization of Antiquity to flourish, it also had to have colonies and provinces from which were 'extracted' not only taxes and tributes but also the main productive force, slaves. But obviously the social formation of the colonies of Roman Empire were quite different from those of the British Empire two thousand years later. On the other hand, in the accepted meaning of the terms, while a mode is a mode, a formation may designate a hierarchical articulation of more than one mode. Now the diformed capitalism, the traces of feudal institutions etc., cannot be one mode, they are rather all the features of the formation - the colonial capitalist formation. Thirdly, an important constituent element of Alavi's concept of 'colonial mode of production' is an indissoluble unity of three classes - the indigenous (local) bourgeoisie, indigenous landlords and the 'metropolitan' bourgeoisie, i.e., the bourgioisie of the 'mother' country, in other words, the colonial rulers. It hardly needs to be proved that talk of such indissoluble unity is not only theoretically and empirically unsound, but also politically misleading.

Another expression that is also some times found in the literature is 'dependent capitalism'. But this is applied only to indicate to some of the

results of some extra-ordinary efforts undertaken by 'metrepolitan' capitalism to transform the colonial , capitalist formations in some countries and is hence not of equal status , as that of colonial capitalism.

Finally, one has to take note of another prevalent term, 'peripheral' capitalism as distinct from the 'metropolitan' capitalism. As is obvious, the 'centre-periphery' relationship expounded variously by Gunder Frank and Samir Amin comes quite close to reflect the actual process of the emergence and development of world capitalist system. But despite the merit in this regard, the 'centre-periphery' expression suffers from the serious deficiency that it cannot exihibit the casual relationships contained in the phenomena that it wants to represent. Not only that, the very substance of the process remains disguised. It is not clear why a periphery may not be more 'developed' than the 'centre', just as 'up-towns' may be the 'residence' of more affluence than the 'down-towns'. But what is more important is that the 'centre-periphery' framework has received some connotations (particularly in the hands of Samir Amin, who was thus led to be in full enthusiasm with the way of constructing 'socialism' that was practised by the Pol Pot regime in Kampuchea) which necessiates rather serious taking to stock of the discussions done so far under this head.

Lastly one important question that remains to be answered is that what happens to the colonial capitalist societies after the colonial rule is over. To be brief the answer is: they remain to be formations in colonial capitalism now evolving through the ' post colonial' (politically) stage. The societies of colonial capitalism remain now intergrated to the world capitalist system just as it was two or three hundred years ago, colonial rule now being substituted by neo-colonial integration. Of course in its 'post colonial' stage of evolution, the colonial capitalist formations presents as much diversity as it did during the initial time when the 'colonial-system' arose; but their underlying character as formations in colonial capitalism nevertheless runs across countries and across continents.

Thus the hunger, poverty, destitution, that from which all so acutely suffer the people of the 'South', of the countries of the Third World are not the results of underdevelopment of capitalism; rather, they are the tragic consequences of over development of capitalism, a capitalism that took for them the shape of colonial capitalism. It is for this reason that we find that it is in many countries of the Third World that socialist governments are emerging. This is a fact which to many seems to be an aberration of the law of social evolution, nevertheless has a historical logic behind it, otherwise we would not have found the phenomenon in practice.

Thus the famines, the 'unmanagable' problem of 'overpopulation', the privation and degradation of human life, all that we find in our country are manifestations of the other dimension of the crisis of capitalism as a world system and it is this which is particularly relevant for the people of, Bangladesh— the classic case of colonial capitatism.[22]

22. Just as England is the classic case of Industrial Capitalism — the capitalism of the other pole.

REFERENCES

1. Alavi Hamza : The Colonial Transformation in India, The Journal of Social Studies, No. 7 & 8, Dhaka, 1980.
2. Althusser, Louis : For Marx, Penguin University Books, Middlesex, England, 1969.
3. Althusser, Louis, Balibar Etienne : Reading Capital, New Library Books, London, 1975.
4. Amin, Samir : Accumulation on a World Scale : A Critique of the Theory of Underdevelopment, Monthly Review Press, N. Y. 1974.
5. Baumol, W.J, Blinder A.S. : Economics, Principles and Policy, Harco Brace Jovanovich Inc, Second ed., 1982.
6. Childe, Gordon : Man Makes Himself, New American Library, N.Y.,1961.
7. Childe, Gordon : What Happend in History, Penguin Books, Harmondsworth, 1960.
8. Dobb, Maurice : Political Economy and Capitalism, Some Essays in Economic Tradition, George Routledg & Sons Ltd., London, 1937.
9. Frank, Andre Gunder: Capitalism and Underdevelopment in Latin America, Monthly Review Press, N.Y., 1967.
10. Frank A.G.: The New Economic Crisis in the West, The Journal of Social Studies, Nos. 12 & 13, Dhaka, 1981
11. Halim, Abdul: Ancient Indian History in a New Light, Dhaka, 1979.
12. Hilton, Rodney (editor): Transition from Feudalism to Capitalism, New Library Books, London,1969.
13. Hindess B., Hirst P: Pre-capitalist Modes of Production, RKP, London, 1975.
14. Hindess B, Hirst P: Modes of Production and Social Formation, An Auto-Critique of Pre-Capitalist Modes of Production.
15. Keynes J.M.: The General Theory of Employment, Interest and Money, Macmillan, London, 1939.
16. Kosambi, D.D.: An Introduction to the Study of Indian History, Popular Book Dept., Bombay, 1956.
17. Kosambi, D.D.: The Culture and Civilization of Ancient India in Historical Outline, Routledge and Kegan Paul, London, 1965.
18. Marx K.: Capital, Vol. I,II,III, Progress Publishers, Moscow.
19. Marx K.: Theories of Surplus Value, Part I,II,III, Progress Publishers, Moscow, 1968.
20. Marx K.: A Contribution to the Critique of Political Economy, Progress Publishers, Moscow, 1970.
21. Marx K. Engel F.: Selected Works, Vol. 1,2,3, Progress Publishers, Moscow, 1973.
22. Marx K.,Engels F.: Collected Works, Vol. 6, Progress Publishers, Moscow, 1980.

The Transition from Capitalism to Socialism : The Schumpeterian Version

ABU AHMED ABDULLAH *

1. Introduction

"Can capitalism survive? No, I do not think it can". Thus, arrestingly, begins Part II of Joseph A. Schumpeter's Capitalism, Socialism, and Democracy. He also predicted that the most likely successor to capitalism is socialism. As he himself says, "My final conclusion therefore does not differ, however much my argument may, from that of most socialist writers and in particular from that of all Marxists [14;61].

The purpose of this essay is to examine Schumpeter's arguments, and in particular to try and assess whether they represent an advance over Marxist thought on the same subject. I shall depend entirely on the exposition in the book cited above.

The presentation in this essay will be structured round the following themes: (1) Schumpeter's notion of capitalism, (2) his analysis of its "breakdown", (3) his motion of socialism, and (4) his views on the relationship of democracy to capitalism and socialism.

II. Schumpeter's capitalism

There is little doubt that by "capitalism" Schumpeter meant the same empirical phenomenon as Marx did and most Marxists do[1]. Marx and Schumpeter would have agreed on which countries over which periods of time to call capitalist. However, they would have differed on what constituted its essential defining characteristics. For Marxists capitalism is defined as generalised commodity production with labour power (but not labourers) a commodity like any other. Alternatively but equivalently, it may be defined as the mode of production whose

---

* Research Director, Bangladesh Institute of Development Studies.

1 There are influential exceptions, notably Andre Gunder Frank and Emmanuel Wallerstein.

characteristic mode of surplus appropriation is as surplus-value. In class terms, capitalism is the mode of production where the main class struggle (the "principal contradiction") is between capitalists, who own the means of production, and labourers, who own nothing but their own labour power.

Schumpeter does not directly take up the first two definitions of capitalism, but he does discuss the definition in terms of classes, only to give it short shrift. His self-satisfied pronouncements on this make interesting reading, if only as an illustration of the superficiality of his understanding:

". . . Marx wished to define capitalism by the same trait that also defines his class division. A little reflection will convince the reader that this is not a necessary or natural thing to do. In fact it was a bold stroke of analytic strategy which linked the fate of the class phenomenon with the fate of capitalism in such a way that socialism, which in reality has nothing to do with the presence or absence of classes, became, by definition, the only possible kind of classless society, excepting primitive groups. This ingenious tautology could not equally well have been secured by any definition of classes and of capitalism other than those chosen by Marx...." [14;19].

Perhaps all that Schumpeter is trying to say is that classes will not necessarily vanish with capitalism, that socialism will also have a class structure. This is of course partly a question of definition. Does it make sense to talk of socialism if classes persist in the Marxist sense, i.e. if there is a separation of the direct producers from the means of production and surplus appropriation by the owners of these means of production ? I will take up this question when I discuss Schumpeter's ideas on socialism.

Elsewhere Schumpeter defines capitalism with upcompromising empiricism, in terms of three features: "private ownership of the physical means of production; private profits and private responsibility for losses; and the creation of means of payment- bank notes and deposits - by private banks" [3;20]. One wonders how this definition would help us differentiate capitalism from, say, slavery in the ante-bellum south, unless "physical means of production" is meant clearly to exclude human beings. Or perhaps to Schumpeter the ante-bellum South would have qualified as capitalist, even though it was hardly noted for its perennial gale of creative destruction.

Let us pass on from Schumpeter's definition of capitalism to his vision of it.

First of all, then, capitalism is essentially dynamic: "Capitalist reality is first and last a process of change" [14;77]. And this change emanates from entrepreneurial activity:

"The fundamental impulse that sets and keeps the capitalist engine in motion comes from the new consumer goods, the new methods of production or transportation, the new markets, the new forms of industrial organization that capitalist enterprise creater" [14;83].

Secondly, competition and the process of creative destruction inevitably leads to the dominance of fewer and larger enterprises, i.e. to increasing monopolisation. But, contrary to what textbook analysis teaches, this improves the performance of the capitalist engine.

Thirdly, capitalisim more than any other system clearly, unambiguously, and reasonably promptly rewards supernormal ability. And in various snide asides he attributes the hostility to capitalism and the attractions of socialism to "the auto-therapeutic attitude of the unsuccessful many".

Fourthly, capitalism universalises rationality, and progressively restricts the spheres of life where irrationality or "magic", can have free play.[2]

On the first point there is, at least, on the surface, a great similarity with the Marxist vision of capitalism, a similarity that Schumpeter drives home with quotations from the Communist Manifesto. There is, however,a significant difference. For Schumpeter there is no structural reason, inherent in the laws of motion of the capitalist mode of production, why this dynamism should ever be exhausted. Or, in Marxist terms, if capitalism is bound to be replaced by socialism, this is not because the relations of production will become fetters on the forces of production, but more because the superstructure will come increasingly in conflict with the base.

---

2 Schumpeter's definition of "magic" exhibits clearly the primitive epistemology to which he was a prisoner: "By/ magic/ I designate the use of a set of beliefs which are not indeed completely divorced from experience — no magic device can survive an unbroken sequence of failures — but which insert, into the sequence of observed phenomena, entities or influences derived from non-empirical sources" [14;121]. And in a revealing footnote he adds: "A friendly critic . . . expostulated with me on the ground that . . . in that case I should have to call the physicist's "force" a magic device. That is precisely what I do mean, unless it is agreed that the term Force is merely a name for a constant times the second time derivative of displacement".

This, of course, is operationalism as preached by the physicist Bridgman. For refutations of operationalism, see [12; chp. II and 13;440]. Also Feynman: "Many physicists think that measurement is the only definition of anything . . . we believe that there is something to measure before we build the speedometer. Only then can we say, for example . . The speedometer isn't working right . . . This would be a meaningless statement if velocity had no meaning independently of the speedometer" [4;8].

Now here I must admit that I find the Marxist analysis less than convincing. It is really not clear why, for example, there should be any "contradiction" between "socialised" production and private appropriation. The multinationals, after all, seem to have found a workable formula to reconcile the two. It is true that capitalism is perhaps more dependent than ever before on active state intervention on its behalf, in terms of appropriate monetary and fiscal policies, in terms of public sector operation of certain vital activities, e.g. the space programme, and in terms of diplomatic and military interventions as and when required. But this shows capitalism's power and versatility rather than any fatal weakness. And even if it could be demonstrated with mathematical exactitude that technical change, the expansion of the forces of production, would be much faster if capitalism were to be replaced by socialism, does this in itself establish that the replacement is inevitable, or even highly likely ?

It is interesting to note in this connection that four scholars operating roughly within the Marxist tradition justify their optimism about the advent of world socialism by invoking, not Marx, but Schumpeter :

"Amin, Arrighi and Wallerstein are long-run optimists, seeing the demise of world capitalism as virtually certain . . . They believe this to be so because they believe, as did Schumpeter, that it is capitalism's successes that will breed its failure . . . Although/Frank/does not believe capitalism to be eternal, he cannot yet foresee when the demise of world capitalism will occur . . . They vary in their degree of certainty about what will replace it. None believe a socialist world order is inevitable . . ."[1;243]

Ernest Mandel starts his discussion of "the crisis of capitalist relations of production"[7;ch.18] with the statement : "Late capitalism is the epoch in history . . . in which the contradiction between the growth of forces of production and the survival of the capitalist relations of production assumes an explosive form" [7;562]. He makes the point that certain major technical advances, notably general automation in large scale industry, cannot be absorbed within capitalist relations of production [7;570]. Granted that this is a clear example of "fettering", one may still ask whether this is the kind of contradiction that is bound to lead to crisis. Nor is it clear that a socialist regime would necessarily choosi to implement all feasible technical advances.

On the second point, about increasing concentration of capital, Schumpeter and Marx are in substantial agreement. But again, they differ in their diagnosis of the consequences of this process.[3] For Schumpeter,

---

3 I use the word "concentration" here to mean both "concentration" and "centralisation" in Marx's sense. For the distinction see [8;627].

concentration, or "monopolisation", is not only an inevitable consequence of the process of capitalist development, but also an essential prerequisite for the full realisation of capitalism's dynamic potential :

"What we have got to accept is that/the large-scale establishment or unit of control/has come to be the most powerful engine of that progress and in particular of the long-run expansion of total output . . . In this respect, perfect competition is not only impossible but inferior . . ."[14;106]

Marx's views on concentration are somewhat confusing. There are passages that appear to extol the process in almost Schumpeterian terms :

"The masses of capital fused together overnight by centralisation reproduce and multiply as the others do, only more rapidly, thereby becoming new and powerful levers in social accumulation. Therefore, when we speak of the progress of social accumulation we tacitly include—today—the effects of centralisation"[8;628].

And earlier he speaks of the role of centralisation in" a wider development of their material motive force" [8;627], and points out that "the world would still be without railways if it had to wait until accumulation had got a few individual capitals far enough . . ." [8;628].

At the same time, he can also pronounce:

"The monopoly of capital becomes a fetter upon the mode of production . . . Centralisation of the means of production and socialisation of labour at last reach a point where they become incompatible with their capitalist integument" [8;763].

I must confess to finding this cryptic and unsatisfactory. In what way exactly does monopoly become a fetter ? One is tempted to say that here Schumpeter was right and Marx wrong.

However, before giving in to that temptation, we should note that Schumpeter appears quite unaware of any problems that may arise from inadequate effective demand. Baran and Sweezy argue persuasively that under monopoly capitalism, there is a tendency for surplus (or aggregate profits) to rise faster than total output, causing a persistent "realization crisis" [2]. One of the manifestations of this crisis is the overexpansion of productive capacity:

". . . the actual investment of an amount of surplus which rises relatively to income must mean that the economy's capacity to produce grows more rapidly than its output . . . Sooner or later, excess capacity grows so large that it discourages further investment" [2;82].

It is therefore possible to argue that the basic contradiction of monopoly capitalism is between its awesome productive power and its inability to promote a distribution of income that ensures the demand for its output. Schumpeter only sees the productive power. Marx did not postulate a tendency for surplus to rise, nor did he relate monopoly explicitly to the problem of effective demand. But at least he does provide the ingredients from which such an analysis can be initiated, as noted by Chakravarty [3;26].

We need not spend much time on the third point. Schumpeter's adulation of the entrepreneur seems to be derived less from an observation of the realities of capitalism than from a perusal of Horatis Algern-type stories. This is not to deny that to build up industrial empires does take some outstanding abilities. But ability or not, the men who started with ten dollars are in a minority. The most supernormal brain would have great difficulty rising from the ranks of the working classes to entrepreneurial eminence. And to say in 1942 that the Marxist theory of classes "misses the salient point (my emphasis) about social classes— the incessant rise and fall of individual families into and out of the upper strata" [14;18] is simply pathetic.

The last point, about the rationality supposedly sustained by capitalism, could also be controverted. One only has to look at the Moonies, the Jesus Freaks, the assorted gurus who are migrating West, Charlie Mansion, random and senseless violence, child abuse, and other symptoms of anomie, to have grave doubts on this score. However, I think the main point that needs to be made is this: a system where unemployment and inflation become things one cannot control, where market prices are like natural forces which can make or unmake lives, cannot be a proper breeding-ground for rationality.

Before closing this section, we should take a closer look at Schumpeter's hero, the entrepreneur, and the nature and function of the entrepreneurial activity.

The entrepreneur, for Schumpeter is essentially the innovator— in the realm of capitalist production, to be sure:

". . . the function of entrepreneurs is to reform or revolutionise the pattern of production by exploiting an invention or, more generally, an untried technological possibility for producing a new commodity or an old one in a new way, by opening up a new source of supply of materials or a new outlet for products, by reorganizing an industry and so on . . . This kind of activity is primarily responsible for the recurrent "prosperities" that revolutionize the economic organism and the recurrent "recessions" that are due to the disequilibrating impact of the new products or methods. . . To act with confidence beyond the range of

familiar beacons and to overcome that resistance requires aptitudes that are present in only a small fraction of the population and that define the entrepreneurial type as well as the entrepreneurial function". [14;132].

The entrepreneurs do not, in Schumpeter's formulation, form a class by themselves. They form, as it were, the dynamic vanguard of the bourgeoisie. They are the path-breakers, the revolutionaries, and it is their activity that makes profits, as opposed to mere wages of management, possible. "Economically and socialogically, directly and indirectly the bourgeoisie therefore, depends on the entrepreneur and, as a class, lives and will die with him..." [14;134]. It is this entrepreneurial function, rather than mere ownership of the means of production, that gives the bourgeoisie as a whole prestige and power.

Now as a description of the process of capitalism during a certain phase (probably a briefer phase than Schumpeter thought) this may be accurate enough. Clearly not all capitalists are equally able and equally innovative. It is also plausible that many if not most innovations were, during that phase, initiated by relative newcomers into the ranks of the capitalist class. But some of the uses to which Schumpeter put this, at bottom fairly trivial, insight are definitely suspect.

First, he tried to counterpose this "theory" to the theory of "primitive accumulation" as an explanation of the origin of capitalism:

"/Marx/ contemptuously rejects the bourgeois nursery tale (Kinderfibel) that some people rather than others became, and are still becoming every day, capitalists by superior intelligence and energy in working and saving. . . Nobody who looks at historical and contemporaneous fact with anything like an unbiased mind can fail to observe that this children's tale, while far from telling the whole truth, yet tells a good deal of it. Supernormal intelligence and energy account for industrial success and in particular for the founding of indurstial positions in nine cases out of ten" [14;16].

The starry-eyed image of the industrial entrepreneur is in fact not borne out by a look at "historical and contemporaneous facts with anything like an unbiased eye". C. Wright Mills has established that of a sample of eminent businessmen born between 1570 and 1839, 63.7% were from the upper and upper middle classes, and 40% were sons of businessmen [11;120-4]. To sustain the Schumpeterian thesis, one would have to believe that the upper classes have a corner on brains. And Meyers has documented the degree to which chicanery and fraud were involved in the founding of the great American fortunes.

However, this is a relatively minor point. More important is the fact that Schumpeter is here guilty of a really astonishing failure to understand the theory of primitive capitalist accumulation. The question Marx was addressing himself to was not whether under capitalism it is the "supernormal brains" who succeed and innovate. The question is: how did a system of production arise where setting up a capitalist enterprise is a feasible and profitable option, and innovation is rewarded ? It is a question of the transition from feudalism to capitalism and not of the abilities and disposition that make one a successful capitalist.[4] And infact "force-robbery-subjugation of the masses", at which Schumpeter pokes such professorial fun, were usual accompaniments to the three processes that facilitated this transition: the accumulation of critical levels of wealth in certain hands (this was perhaps the process least dependent on force or robbery), the creation of a doubly free labour force, which involved large-scale expropriation of the peasantry, and the creation of dependable and expanding markets.

A second major function of the theory of entrepreneurship is to explain (and justify) the social dominance of the bourgeoisie (Schumpeter never conceded their political dominance, though admitting that as long as they discharged their social role, they received adequate government support). Mere ownership of the means of production Schumpeter considered inadequate either to define a class or to explain its preeminence:

"... business achievement is obviously not everywhere the only avenue to social eminence and only where it is can ownership of means of production casually determine a group's position in the social structure. Even then, however, it is as reasonable to make that ownership the defining element as it would to define a soldier as a man who happens to possess a gun" [14;18].

There are obvious confusions here. In societies where business achievement is not the chief avenue to social eminence, clearly the ownership of "non-business" forms of property (e.g. land in feudal society) will be critical. Besides, it is not a question of "social eminence" for an individual— that can be achieved, even in the most thorough-going capitalist order, through success in the arts or the sciences but of class dominance. But the basic point, I think, is a valid one, and it is quite in the spirit of Marxist analysis. The capitalist is not a

---

4 "The point is that before the Industrial Revolution, or in countries not yet transformed by it, Henry Ford would not have been an economic pioneer, but a crank, inviting bankruptcy" [6;41].

capitalist merely because he happens to own some means of production. He is a capitalist because he functions as one, i. e., lays out his money capital to purchase labour and the means of labour, and organises the labour process. If Marx does not put the function of innovation at centre stage it is because to him innovations, part of the search for relative surplus value, flow from the structural compulsions of the system and need no separate psycho-social explanation.

A third, and perhaps the most critical, use of this theory is in predicting the demise of capitalism. This is better taken up in the next section.

III. Decline and Fall

We have seen already that Schumpeter did not believe that there were any built-in constraints in capitalism's capacity for sustained growth. It may be added that he did not believe in the class struggle either. He puts the point, indeed, with uncharacteristic intemperateness:

"To any mind not warped by the habit of fingering the Marxian rosary it should be obvious that their relation is, in normal times. primarily one of cooperation...." [14;19].

What reasons does he put forward then for believing that capitalism is doomed? These may be listed, partly following his own section headings, as follows:

1. The obsoleseence of the entrepreneurial function.

Schumpeter sees innovation, the fundamental entrepreneurial function, becoming itself progressively routinised:

"Technological progress is increasingly becoming the business of teams of trained specialists who turn out what is required and make it work in predictable ways. . . The romance of earlier commercial adventure is rapidly wearing away, because so many more things can be strictly calcuated that had of old to be visualized in a flash of genius" [14;132].

As a result, the role and the social position of the entrepreneur is undermined:

"His role, though less glamorous than that of medieval warlords, great or small, also is or was just another form of individual leadership acting by virtue of personal force and personal responsiblity for success. His position, like that of warrior classes, is threatened as soon as this function in the social process loses its importance. . ." [14;133].

And again:

"The perfectly bureaucratized giant industrial unit not only ousts the small or medium-sized firm and "expropriates" its owners, but in the end

it also ousts the entrepreneur and expropriates the bourgeoisie as a class which in the process stands to lose not only its income but also what is more important, its function" [14;134].

Apart from the stress on the function of innovation, all this is of course very reminiscent of classical Marxist analyses. This is how Engels puts the matter:

"All the social functions of the capitalist are now performed by salaried employees. The capitalist has no further social function than that of pocketing dividends, tearing off coupons, and gambling on the Stock Exchange... At first the capitalist mode of production forces out the workers. Now it forces out the capitalists..." [10;427-8].

For Marxists, this development brings socialism closer by graphically demonstrating the pointlessness of private property in the means of production. For Schumpeter the primary proximate impact is on the relevance and prestige of the entrepreneurial function. Probably the two viewpoints come to the same thing. Both accept the implicit premise that a ruling class must discharge, and must be perceived to be discharging, an essential economic function, otherwise it is doomed. I cannot enter here into the question of whether this premise is valid, but it is pertinent to keep in mind that the ideological hegemony of the ruling class (which of course is not unassailable) can insert, for a shorter or longer period, a gap between actually discharging a function and appearing to do so.

2. The destruction of the protecting strata.

The argument here is that the bourgeoisie, by temperament and by the nature of their calling, are incapable of ruling. They therefore, need another class to rule for them. In England it was the feudal aristocracy who rendered the bourgeoisie this service. But capitalism, in the process of succeeding, abolishes these allies and is defenceless:

Within a protecting framework not made of bourgeois material, the bourgeoisie may be successful, not only in the political defensive but also in the offensive, especially as an opposition. . . But without protection by some non-bourgeois group, the bourgeoisie is politically helpless and unable not only to lead its nation but even to take care of its particular class interest" [14;138].

An absurd position, into which Schumpeter traps himself by his inability to see leadership in any but personalised, charismatic terms. Who, one may ask, provided this "protection" to the bourgeoisie of the United States ?

There is this kernel of not very profound truth in this idea, that capitalists actively involved in their business will not have the time or the

generalised competence to run the government. This may indeed have been one reason why the English capitalist class in the beginning needed the aristocracy. But the problem becomes unimportant precisely with the further development of capitalism, because an intermediate class develops, whether offsprings of the capitalist class itself, or of some previously dominant class, or even the result of upward mobility from the petty-bourgeois, who can take on this task.

3. The destruction of the institutional framework of capitalist society.

Here Schumpeter points to the psychologically and politically debilitating effects of the passing of small enterprises and the growth of stock ownership as the dominant form of property. The first, according to him eliminates a class who would vote for capitalist interests at the polls, and also have a direct and personal influence on the political behaviour of the foreman class. The second development emasculates the concept of property and makes it something no longer worth fighting for:

"Dematerialized, defunctionalized and absentee ownership does not impress and call forth moral allegiance as the vital form of property did. Eventually there will be nobody left who really cares to stand for it—nobody within and nobody without the precinet of the big concerns" [14;142].

The people of Vietnam, Chile, Nicaragua, Grenada and a host of other countries can testify that capitalism has by no means lost its will to fight for itself.

There is not very much more. Intellectuals come in for a drubbing as professional trouble-makers subverting trade union movements to their own ends, the supposed passing of the bourgeois family is claimed to strike at the root of the drive to accumulate, and ultimately, it seems, it is men's irrationality (which has not been completely eliminated by capitalism after all) which sustains an ever-increasing hostility towards capitalism. All this undeserved hostility unarms the bourgeoisie, who lose the will to fight, and are evicted.

It will remain an intriguing question in the sociology (or perhaps pathology) of knowledge as to why Schumpeter felt impelled to resort to such desperate expedients to establish an eventuality he did not even desire.

IV. Schumpeter's Socialsim

Schumpeter's definition of socialism is along strictly economic lines:

"By socialism we shall designate and institutional pattern in which the control over means of production and over production itself is vested with a central authority— or, as we may say, in which, as a matter of principle, the economic affairs of society belong to the public and not to the private sphere" [14;167].

Curiously, he appears to believe that this exclusive focus on the economic is in agreement with "all the others that I have ever come across" [14;169]. He must either never have come across, or completely failed to understand, any definitions in the Marxist tradition. For all Marxist definitions without exception stress that state ownership and control are not sufficient to define socialism. The state must itself have been taken over by the proletariat, or since the proletariat in taking power abolishes itself and all classes, by society as a whole.

I am not suggesting that the Marxist formulation is without difficulties. Certainly Marxists have been far too prone to use terms like "free association of producers" or "dictatorship of the proletariat" uncritically, without considering the problems of collective action. Schumpeter's definition certainly has the merit of being relatively unambiguous. But at least the difference should have been noted and its implications explored.

One implication of Schumpeter's definition, which will be vehemently criticised by Marxists, may be noted here. For Schumpeter, socialism would make no particular difference to the life of the working class:

"...there is the world of the laborer and of the clerk. No reform of souls, no painful adaptation, would be required of them. Their work would remain substantially what it is and it would, with an important qualification to be added later[5], turn out similar attitudes and habits. From his work the laborer or clerk would return to a home and to pursuits which socialist fancy may denote as it pleases— he may, for instance, play proletarian football whereas now he is playing bourgeois football— but which would still be the same kind of home and the same kind of pursuits" [14;203].

The proletariat play no role in decision-making, then ? Schumpeter's most heavy handed sarcasm is reserved for such fantasies:

"The case has, like so many others, been all but spoiled by foolish idealizations— the absurd picture of workers who are supposed to arrive by means of intelligent discussion (when resting from pleasant games) at decisions which they then arise to carry out in joyful exultation" [14;211].

---

5 This probably refers to "a healthier attitude towards his duties" [14;211].

Clearly Schumpeter's socialism is something that most Marxists would repudiate. Critics of Soviet society have called it bureaucratic centralism. Indeed Schumpeter is quite explicit that the only kind of socialism he can envisage is a "huge and all-embracing bureaucratic apparatus" [14;206].

To whom then, if anyone, will the bureaucrats be accountable ? Given the exclusively economistic definition of socialism, it is not surprising to learn that the answer is indeterminate:

"In fact according to our definition as well as to most others, a society may be fully and truly socialist and yet be led by an absolute ruler or be organized in the most democratic of all possible ways; it may be aristocratic or proletarian; it may be a theocracy and hierarchic or atheist or indifferent as to religion" [14;170].[6]

This much is therefore, clear, that Schumpeter's socialism is very different from socialism as Marxists understand it. On this ground along one may say that his claim that "my final conclusion therefore, does not differ. . . from that of all Marxists" [14;61] is ridiculous.

But is Schumpeter right after all ? Is an all-embracing bureaucracy and a working population completely alienated from decision-making (except possibly through the polls) the only plausible form of socialism ? Is there any meaningful sense in which the "whole people", or even the proletriat as a whole, can take decisions on what to produce ?

I do not even know how to start trying to answer this question except by an assertion of faith. There are two issues of control and accountability involved here: a national leadership that is responsive to the "whole people" and a "technostructure" amenable to control by the national leadership (for the technostructure and its suposedly ineluctable autonomy, [5,chp.VI-IX]. And it can hardly be denied that dictatorship of the proletariat has all to often turned into a dictatorship over the proletariat. Therefore, I think in all honesty one has no choice at the moment but to keep the question open.

V. The Transition According to Schumpeter

The transition to socialism occurs, according to Schumpeter, when capitalism, in spite of, or in his formulation because of, its successes, has made itself redundant as an institutional arrangement. Socialism as he

---

6 Compare Engels: "But of late, since Bismarck went in for state ownership of industrial establishments, a kind of spurious socialism has arisen, degenerating, now and again, into something of flunkeyism, that without more ado declares all state ownership, even of the Bismarckian sort, to be socialistic" [10;427].

sees itis simply monopoly capitalism pushed to its logical limit— which agree pretty much with Engels' vision, not of socialism, but of the stage before it [10;427].

Socialism therefore, comes only when all the conditions, technological as well as socio-psychological, have been created within monoply capitalism:

"Most of the arguments of part I may be summed up in the Marxian proposition that the economic process tends to socialize itself— and also the human soul. By this we mean that the technological, organizational, commercial, administrative and psychological prerequisites of socialism tend to be fulfilled more and more" [14;219].

It is clear therefore, that for Schumpeter socialism (as he defines it) is on the agenda only for an advanced capitalist country. It is true that he distinguishes between "a state of maturity" and "a state of immaturity" for socialisation, but even his state of immaturity involves a reasonable degree of development— the examples of "immaturity" he gives are the USA in 1932, and Germany in 1918-19 [14;223-4]. In conditions more backward than this, "the attempt at conquering power could not be more than a ridiculous Putsch". [14;223].

Schumpeter believes that this is in keeping with Marx's own views. Inspite of some frantic attempts to invoke the authority of Marx behind the Russian or Chinese revolutions. I think here Schumpeter was right. The few late fragments on Russia really will not bear the burden that some people have tried to put on it. For Marx and Engels, as for Schumpeter, socialism will come only when production has already been socialised by the development of capitalism.

Under these conditions, it seems obvious to Schumpeter that the transition of socialism would most likely take place gradually, peacefully, through constitutional amendments, enactments etc. Revolution cannot be completely ruled out, but is extremely unlikely, since hardly anyone will want to resist that badly. There would really be no strong capitalist class, just a large number of small shareholders.

How realistic is this picture of a peaceful transition ? In a sense one can agrue that since that is involved here is not really a transition to socialism at all, but a "growing over" into full-blown state capitalism, the scenario is not an implausible one. At that stage of development, state capitalism might be good for capitalists, and might be perceived to be so. On the other hand, the picture of the parcellated and powerless capitalist class is surely overdrawn. Since Schumpeter wrote, the whole analysis has become even more shaky due to the emergence of the multinational corporations, whose implications for the prospects of socialism in one country (specially the major host country) remain unclear.

The major question raised by this analysis is of course about the nature of the socialist regimes that have come up in backward regions of the world. This is a question to which a satisfactory answer is not to be found either in Schumpeter or in Marx. But this much can be said, that the Marxist tradition in its subsequent development (Lenin, Trotsky, Mao, and contemporary neo-Marxism) has made some progress in understanding this phenomenon. There is no way the Schumpeterian analysis can be similarly extended. There is indeed legitimate scope for debate as to whether these subsequent extensions of Marxist theory truly represent "creative development" or involve to a significant degree a jettisoning of major components of that theory. I am personally inclined to say that Marx's basic insight was correct, and that socialism in the true sense of the term can only come, and will come, in the advanced capitalist countries. This is not, however, to deny the very real achievements of the Russian, Chinese and other revolutions that have taken place in this century.

VI. Socialism and Democracy

Schumpeter's definition of democracy, like his definition of socialism, is uncompromisingly pragmatic and operational:

". . . the democratic method is that institutional arrangement for arriving at political decisions in which individuals acquire the power to decide by means of a competitive struggle for the people's vote" [14;269].

This definition enables Schumpeter to get away from the problems of trying to define "the will of the people" or "common good". As he quite rightly prints out, "to different individuals and groups the common good is bound to mean different things" [14;251].

Schumpeter does not explicitly address the question as to why the perception of the "common good" of the majority might not be an adequate basis for defining and justifying democracy. But the whole tenor of his agrument is that people in general are neither qualified for nor greatly interested in participating in political decision-making, so that while they may be allowed to vote for their leaders, they must not actually have too much influence on what the leaders do. For example:

"Normally, the great political questions take their place in the psychic economy of the typical citizen with those leisure-time interests that have not attained the rank of hobbies, and with the subjects of irresponsible conversations" [14;261].

Schumpeter recognizes that this is, at least partly, because the individual citizen is politically powerless:

"In fact, for the private citizen musing over national affairs, there is no scope for such a will and no task at which it could develop. He is a member of an unworkable committee, the committee of the whole nation, and this is why he expends less disciplined effort on mastering a political problem than he expends on a game of bridge" [14;261].

And Schumpeter draws a telling analogy between commercial advertising and the manufacture of the "popular will" by politicians [14;263].

Furthermore, the extent of the franchise does not concern Schumpeter. If a society decides to restrict the franchise to some groups and disinfranchise others, whatever the criteria used, it does not thereby become by definition undemocratic [14;244]. It is not clear whether Schumpeter would consider equally immaterial restrictions on the right to seek office— though he does at point define democracy as "free competition for a free vote" [14;271].

In fact one suspects that Schumpeter did not really believe what he was saying. For it the franchise can be arbitrarily restricted without violating the spirit of democracy, in what sense is the vote "free"? And besides, why would it then be true that:

". . . democratic government will work to full advantage only if all the interests that matter are practically unanimous not only in their allegiance to the country but also in their allegiance to the structural principles of the existing society" [14;296].

Of course, the answer could be in the phrase "all the interests that matter". If only the junkers can run for office and vote, then only the junkers have to be practically unanimous.

Armed with this idiosyncratic definition of democracy, Schumpeter proceeds to investigate the possibility of a democratic socialist order. He sees dangers in the expansion of the political sphere to encompass the economy, since according to him one of the conditions for democracy to work is "that the effective range of political decision should not be extended too far" [14;291]. This is essentially the question of the degree of autonomy that the "technostructure" must possess, to which reference was made earlier. On the other hand, he thinks that at least in the case of "mature socialization", socialism would have the great advantage of removing fundamental disagreements about the nature of society, and hence improve the chances of democracy functioning well.

It is difficult to pass judgement on this rather protean presentation. If one ignores his position on the limitation of the franchise, there is a great to be said in favour of his definition of democracy. It is unambiguous and

verifiable. It is not clear, as Schumpeter admist, that democracy so defined is a desirable arrangement, though I would argue that it is. The questions he raises, which, as I said earlier, are questions about the accountability and control of the national leadership as well as the technostructure are of fundamental imporant for elaborating the Marxist, as opposed to the Schumpeterian, notion of socialism, and Marxists cannot ignore these questions, though they may safely igonore Schumpeter's answers,

VII. Conclusion

Schumpeter's analysis of the transition from capitalism to socialism is fatally flawed. He fails to establish that capitalism is doomed, and he misunderstands socialism. His empiricist epistomology and his inability to perceive things in structural rather than personal and psychological terms condemns him to theoretical shallowness and dilettantism. The only area where he may be said to have contributed something of value to the understanding of the transition is in his discussion of democracy, and even this mainly because he raises questions (questions which, however, he doss not see as such) to which Marxists have so far given insufficient attention.

REFERENCES

1. Amin. S.et. al. : Dynamics of Global Crisis Monthly Review Press, New York and London, 1982.
2. Baran P.A. and Sweezy P.M. : Monopoly Capital : An Essay on the American Economic and Social Order, Monthly Review Press, New York and London, 1966.
3. Chakravarty S : Alternative Approaches to a Theory of Economic Growth : Marx, Marshall and Schumpeter, Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta, 1982.
4. Feynman R.P., Leighton R.B. and Sands M : The Feynman Lectures on Physics, Vol. 1, Reading Mass, Addison-Wesley, 1963.
5. Galbraith J.K : The New Industrial State, Hamish Hamilton, London, 1967.
6. Hobsbawm E.J. : Industry and Empire : The Pelecan Economic History of Britain, Volume 3, Penguin Books, Hammonds Worth, 1968.
7. Mondel E. : Late Capitalism, New Left Books, London, 1978.
8. Marx K : Capital Vol. 1, Foreign Languages Publishing House, Moscow, 1961.
9. Marx, K : Capital Vol. III, Foreign Languages Publishing House, Moscow, 1962.
10. Marx, K : and Engels, F : Selected Works, International Publishers, New York, 1969.
11. Mills C.W. : The American Business Elite : A Collective Portrait, in Power, Politics, and People , The Collected Essays of C. Wright Mills (Irving Louis Horowitz, editor) Oxford University Press, New York and London, 1967.
12. Popper K.R. : Conjectures and Refutations, Routledge and Kegan Paul, London, 1965.
13. Popper K.R. : The Logic of Scientific Discovery, London, Hutchinson, 1980.
14. Schumpeter J.A. : Capitalism, Socialism and Democracy.

শতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলীঃ লর্ড জন মেনার্ড কেইন্স

মোজাফফর আহমদ *

জীবন

জন মেনার্ড কেইন্স সম্ভবতঃ বিংশ শতকের সবচেয়ে প্রভাবশালী অর্থনীতিবিদ, সে প্রভাব কেবলমাত্র শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের অংগনে সীমাবদ্ধ ছিল না বরং সে প্রভাব তার দেশে এবং বিদেশেও রাষ্ট্র পরিচালনায় অর্থনীতি নির্দ্ধারনে বিস্তৃত ছিল । অর্থনীতির ইতিহাসে লর্ড কেইন্স তাই একটি অবিসম্মরণীয় ব্যক্তিত্ব, অনন্য সাধারণ প্রতিভা । রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক নীতিমালা নির্দ্ধারণেই তার প্রতিভার স্ফুরণ ঘটেছিল একথা ঠিক নয় যদিও ইউরোপ তথা বিশ্বের অর্থনৈতিক সমস্যাসংকুল মুহূর্তে তার বিশ্লেষণ ও মতবাদ অনেক ক্ষেত্রেই সংকট উত্তরণে সহায়ক হয়েছে । তার সাহস, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, উপস্থিত বুদ্ধি এবং মানবিক গুনাবলী পারিবারিক, নাগরিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে তাকে সুনামের অধিকারী করেছে ।

জন মেনার্ড কেইন্সের জন্ম হয়েছিল ১৮৮৩ সালের ৫ই জুন । তার বাবা জন নেভিল কেইন্স নিজেই স্বনামখ্যাত ছিলেন । লজিকে তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন এবং পলিটিক্যাল ইকনমির তত্বগত দিক নিয়ে তাঁর সুলিখিত পুস্তকও রয়েছে । তিনি বহু বছর ধরে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রির কাজ করেছেন । মেনার্ডের মা কেম্ব্রিজ শহরের মেয়র ছিলেন । অর্থাৎ মেনার্ড কেম্ব্রিজের বিদ্যোৎসাহী বুদ্ধিজীবি আবহাওয়ায় আশৈশব লালিত হয়েছেন । তিনি ইটনে পড়েছেন এবং সে স্কুলকে আন্তরিকভাবে ভালবেসেছেন, পরবর্তী জীবনে যখন তিনি সে স্কুল প্রশাসনের দায়িত্ব পালনের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন সেজন্য তিনি অত্যন্ত গর্বিত বোধ করেছেন । তিনি Heloise এবং Abelard সম্পর্কে নিবন্ধ লিখে কিংস কলেজে গণিত ও ক্লাসিকস পড়তে স্কলারশীপ পান । তিনি কেম্ব্রিজ ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন, বার্কের রাজনৈতিক মতবাদের উপর নিবন্ধ লিখে পুরস্কার পেয়েছিলেন এবং অবশেষে গণিতে দ্বাদশ র‍্যাংলার হয়েছিলেন । যদিও তিনি অন্য ট্রাইপস পরীক্ষায় বসেন নি, তবুও তিনি দর্শন ও অর্থনীতি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে অধ্যয়ন করেছিলেন । সিজউইক, হোয়াইটহেড, ডবলু, ই জনসন, জি,ই, মুর এবং আলফ্রেড মার্শালের মত বিশ্বনন্দিত ব্যক্তিত্বের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন এবং তাদের মতবাদ ও চরিত্র দিয়ে প্রভাবিত হয়েছেন ।

---

* অধ্যাপক, ব্যবসায় প্রশাসন ইনষ্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯০৬ সালে তিনি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান পেয়ে উত্তীর্ণ হন । সে পরীক্ষায় তিনি অন্য বিষয়ের তুলনায় অর্থনীতিতে অনেক কম নম্বর পেয়েছিলেন । এ ব্যাপারে তার একটা ক্ষোভও ছিল । শোনা যায় তিনি বলেছিলেন যে, সম্ভবতঃ পরীক্ষকেরা তাঁর চাইতেও কম অর্থনীতি জানতেন বা বুঝতেন । সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় পাস করে তিনি ইণ্ডিয়া অফিসে চাকুরীরত হন । সেখানে জন মরলে তার আকর্ষণ ছিল, তবে তাঁর চাইতে আকর্ষণীয় ছিল ভারতীয় মুদ্রাব্যবস্থা যেটি স্বর্ণমানের যুগে প্রাণবন্ত আলোচনার বিষয় হয়ে দাড়িয়েছিল । সেখানে দু'বছর কাজ করেছেন এবং সে সময় তিনি তার গবেষণাকর্ম করেছেন Probability সম্পর্কে, তার এই গবেষণার ফলশ্রুতিতে তিনি কিংস কলেজের ফেলো হলেন এবং কেম্ব্রিজে ফিরে গেলেন । মেনার্ড কেম্ব্রিজে মুদ্রা সংক্রান্ত বিষয়ে পড়াতে শুরু করেন । ১৯১৩-১৪ সালে যখন ভারতীয় মুদ্রা ও অর্থ ব্যবস্থা সম্পর্কে রাজকীয় কমিশনের সৃষ্টি হয় তখন জন মেনার্ড কেইন্স তার কনিষ্ঠতম সদস্য হিসাবে জটিল মুদ্রাতত্ত্বের সাবলীল বিশ্লেষণ করে যুগপৎ শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের উদ্রেক করেন । তিনি ১৯১৫-১৯ সাল পর্যন্ত ট্রেজারীতে কাজ করেন, যুক্তরাষ্ট্রে ফার্ষ্ট লর্ড রিডিং-এর সাথে যান, প্যারীস শান্তি সম্মেলনে ট্রেজারীর প্রধান প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেন; এবং সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক পরিষদে চান্সেলার অব এক্সচেকারের ডেপুটি হিসেবে কাজ করেন । কিন্তু তিনি তা পদত্যাগ করে আবার কিংস কলেজে ফিরে আসেন এবং তার বার্সার হন । কেম্ব্রিজে ফিরে এসেও নীতি-নির্ধারণের যে জ্ঞান তিনি আহরণ করেছিলেন তারই আকর্ষণে তিনি লণ্ডনে বেশ সময় কাটাতেন । তিনি অর্থ ও শিল্প সম্পর্কিত ম্যাকমিলন কমিটির সদস্য ছিলেন এবং তার সমাদৃত রিপোর্টের অনেকখানি রচনাও করেছিলেন ।

১৯৪০ সালে তিনি চান্সেলার অব এক্সচেকারের পরামর্শদাতা পরিষদের সদস্য হিসেবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন । তিনি ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ডের একজন ডিরেক্টরও ছিলেন । ১৯৪২ সালে তাকে লর্ড অব টিলটন খেতাবে ভূষিত করা হলে তিনি পার্লামেন্টের হাউজ অব লর্ডসের আলোচনায় প্রাণবন্ত ও যৌক্তিক মতবাদের উপস্থাপনা করেছেন । ১৯৪৩ সালে তাকে কেম্ব্রিজ (বরোর)-এর হাই ষ্টুয়ার্ড নিয়োগ করা হয় । তিনি ন্যাশনাল গ্যালারী অব আর্টসের ট্রাষ্টি ছিলেন বহুদিন ধরে । এ ছাড়াও সংগীত ও কলা উন্নয়নের জন্য যে কাউন্সিল গঠিত হয়েছিল তিনি ছিলেন তার সভাপতি । তার স্ত্রী লিডিয়া লোপোকোভা এক সময় রুশ রাজকীয় ব্যালের নর্তকী ছিলেন । ১৯২৫ সালে তাদের বিয়ে হয়, লিডিয়া তার জন্য সুস্থ সুন্দর ও যত্নশীল গৃহের রচনা করে তার কাজের যে সহায়তা করেছেন সেটি স্মরণ করেই মিসেস আলফ্রেড মার্শাল এক সময় বলেছিলেন মেনার্ডের জন্য লিডিয়ার সাথে বিবাহই ছিল সর্বোত্তম কর্ম ।

জন মেনার্ড কেইন্স তার বিস্তৃত ও ব্যস্ত জীবনে অর্থনীতি সম্পর্কে মৌলিকতত্ব ও বিশ্লেষণ দিয়ে গেছেন । তার অর্থনীতির একটি আকর্ষণীয় দিক ছিল তত্বের ও বিশ্লেষণের প্রাসংগিকতা । কিন্তু অর্থনীতিতে বিপ্লবাত্মক অবদান ছাড়াও অনেকে তার ইংরেজী লেখাকে উঁচু পর্যায়ের সাহিত্য বলে বর্ণনা করেছেন । । অনেকেই তার ভার্সাই শান্তি আলোচনাকে নিয়ে লেখা Eassys in Biography-কে জ্ঞান ও রসবোধের এক অনন্য উপস্থাপনা বলে মনে করেন ।

তিনি অর্থ ব্যবস্থাপক হিসাবেও খ্যাতি কুড়িয়েছেন । তিনি দীর্ঘদিন কিংস কলেজের বার্সার ছিলেন । ঐ কলেজের অর্থ ব্যবস্থাপনায় তিনি যে দক্ষতা দেখিয়েছেন তার ফলে কিংস কলেজের আর্থিক সম্পদ বহুগুণ বেড়ে যায় । তিনি পত্রিকার সম্পাদক হিসাবেও অসাধারণ সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন । ১৯১১ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত তিনি যুক্তরাজ্য তথা বিশ্বের প্রথম শ্রেণীর অর্থনীতি বিষয়ক পত্রিকা Economic Journal-এর সম্পাদক ছিলেন । তিনি Nation ও New Statesman পত্রিকাতে ও ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ানের জন্য অনবরত লিখেছেন । তিনি নেশন ও পরে নিউ ষ্টেটসম্যান পত্রিকার চেয়ারম্যান ছিলেন; তার সম্পাদকীয় স্বাধীনতা সম্পর্কে গভীর শ্রদ্ধা ছিল এবং সে কারণে পত্রিকা দু'টিকে তার মতামতের বাহন হিসাবে ব্যবহার না করতে সতর্ক ছিলেন । ১৯২১ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত একটি বীমা কোম্পানীর চেয়ারম্যান হিসেবে কাজ করেছেন, এ ছাড়াও চালিয়েছেন একটি বিনিয়োগকারী কোম্পানী । তিনি একটি ব্যালে কোম্পানী সংগঠন করেন এবং কেম্ব্রিজে আর্টস থিয়েটারের উদ্বোধন করে এর প্রাথমিক স্তরে অর্থের যোগান দেন । কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যে অর্থনীতি বিভাগ গড়ে উঠে সে কাজে তার অবদান কম ছিল না । ছাত্রদের নিয়ে প্রাণবন্ত আলোচনায় তার গভীর আগ্রহ ছিল ।

তার মত প্রভাবশালী অর্থনীতিবিদ ইংরেজী ভাষা প্রভাবিত দুনিমায় সম্ভবতঃ এডাম সিম্নথ ছাড়া আর কেউ নেই । প্রাথমিকভাবে তার যে বিষয়ে অনুসন্ধিৎসা ছিল তা হল মুদ্রা ব্যবস্থা (বৈদেশিক মুদ্রাসহ)। এ সময়ে তার সৃজনধর্মী লেখা হল Indian Currency and Finance. কিন্তু ১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধের পরে তিনি অর্থসংকোচন ও ব্যবসায় মন্দা নিয়ে ভাবতে শুরু করেন এবং তার ফলশ্রুতিতে শ্রমবিনিয়োগে ও উৎপাদন কর্মের উপর বিভিন্ন অর্থনৈতিক প্রভাব সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত হয়, এবং তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, উৎপাদন সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করতে একটি কেন্দ্রীয় সংস্থাকে সুদের হার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং সরকারকে কখনও কখনও সচেতনভাবে পুঁজি বিনিয়োগ ও পুঁজি সৃষ্টি করতে হবে । এই সিদ্ধান্তগুলো অর্থনৈতিক পদ্ধতির একটি সামগ্রিক অথচ নাজুক বিশ্লেষণের ফলশ্রুতি । অর্ধশতাব্দি পরেও অর্থনীতিবিদেরা কেইন্সীয় বিশ্লেষণের বিন্যাস ও পদ্ধতির যৌক্তিকতা, পুনঃর্বিবেচনা, সম্প্রসারণ নিয়ে অনেক সময়ই ব্যাপৃত থাকেন ।

অনেকে তার লেখায় অসংলগ্নতার অভিযোগ করেছেন । তার মতবাদের পরিবর্তন হয়েছে এবং তার চিন্তার বিবর্তন ঘটেছে এই অর্থে যে, তিনি তার তত্ত্বের বৃহত্তর সমন্বয় সন্ধান করেছেন । তার পুরোনো ধারনাকে বিশ্লেষণ করেই নতুন ধারণার জন্ম হয়েছে এবং তার তত্ত্বের বিবর্তিত অবস্থার প্রেক্ষিতে অনুসরণযোগ্যতা তিনি বৃদ্ধি করতে প্রয়াসী হয়েছেন । এ যেন সযত্নে লালিত তারুণ্যকে চিরায়ত করবার চেষ্টা ।

তার Treatise on Probability দর্শনের একটি উল্লেখযোগ্য কাজ । যদিও বইটিতে অংকের সংকেত চিহ্ন বহুল ব্যবহৃত হয়েছে তবুও Probability-র অংক নয় বরং তার দার্শনিক ভিত্তিই তাকে আকৃষ্ট করেছে । বইটিতে তার জ্ঞান, পাঠ ও পাণ্ডিত্য পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে ।

কেইন্স ইতিহাসের ধারায় তার প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছিলেন । প্যারীস শান্তি মিশনের আলোচনা থেকে পদত্যাগ করে তিনি শান্তি চুক্তি সম্পর্কে বিশ্ব মতকে প্রভাবিত করেছিলেন, যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে তার মত গ্রহণীয় না হয়েও তার যুক্তি সমাদৃত হয়েছে । ১৯২৫ সালে অনেক দেশ স্বর্ণমানে ফিরে গেলেও এসম্পর্কে কেইন্সের মত ইতিহাস যথার্থ বলে চিহ্নিত করেছে । ১৯২৯ সালে তিনি বেকারত্বকে প্রথম সমস্যা বলে নির্দিষ্ট করে রাজনৈতিক মত সংগঠন করতে সমর্থ হন ।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় মেনার্ড কেইন্স ট্রেজারীর সাথে যুক্ত ছিলেন । ১৯৪৩ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে যুদ্ধাবস্থার পরে পূর্ব যুদ্ধের ভুলভ্রান্তি এড়িয়ে নতুন পৃথিবী সংগঠনের জন্য আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ার বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা চালিয়েছেন । সংগতভাবেই বৃটিশ পরিকল্পনার পরিচিতি তার নামানুসারেই হয়েছিল । ১৯৪৪ সালে ব্রেটন উডস যেখানে একটি আন্তর্জাতিক মুদ্রা ব্যবস্থা সম্পর্কে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হয় সেখানেও কেইন্স সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন । ১৯৪৫ সালে মার্কিন ঋণ চুক্তির ব্যাপারে তিনমাস ধরে দীর্ঘ আলোচনাও তিনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও যুক্তি সহকারে চালিয়েছেন । হাউজ অব লর্ডস-এ এ চুক্তিকে তিনি যুক্তির সাথে সমর্থন করেছেন । আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল ও বিশ্ব ব্যাংকের বোর্ড অব গভর্ণরস-এর মিটিং শেষ করে লণ্ডনে ফেরার দু'সপ্তাহের মধ্যেই ২১শে এপ্রিল ১৯৪৬-এ কেইন্স হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন ।

কেইন্সীয় চিন্তাধারার ঐতিহাসিক পটভূমি

১৯২০ ও ৩০-এর দশকে ইউরোপীয় সমাজে অনেক পরিবর্তন এসেছিল । কেইন্সের দীর্ঘ জীবনে তিনি অনেক পরিবর্তন দেখেছেন । ইটন অফিসার ট্রেনিং দলের সদস্য হিসেবে তিনি মহারাণী ভিক্টোরিয়ার শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে যোগ দেন । আর মৃত্যুর পূর্বে তিনি বিশ্ব ব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল গঠনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন । তার অনেকের মতই আশা ছিল যে, এর ফলে শান্তি এবং সমৃদ্ধির নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে ।

কেইন্সের কেম্ব্রিজ ও তার ব্লুমসবেরী বন্ধুবর্গ ভিক্টোরিয়ান ইংল্যাণ্ডের মধ্যবিত্তের মূল্যবোধকে প্রশ্নের সম্মুখীন করেছিল । প্রথম মহাযুদ্ধের পরে সে নৈতিকতা ও রীতিনীতি সম্পর্কে সপ্রশ্নবোধ প্রায় সর্বজনগ্রাহ্য হয়ে উঠে । Economic Consequence of the Peace বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায়ে কেইন্স মধ্যবিত্তের স্বচ্ছল জীবনের একটি ছবি তুলে ধরেছেন । খুব কম লোকই বুঝতে পেরেছিল যে, প্রথম মহাযুদ্ধ এক অস্বাভাবিক, অস্থিতিশীল, জটিল, অনির্ভরশীল ও ক্ষণিক অবস্থার সৃষ্টি করেছে যা থেকে পিছনে প্রত্যাবর্তন সম্ভব নয় । সমস্ত দেশ সম্পদহীনতায় ভুগছিল, দুর্ভিক্ষাবস্তায় পতিত হয়েছিল, বেকারত্ব বেড়েছিল, শ্রমিকের মনোবল ভেংগে গিয়েছিল । মূল্যস্ফীতি আয়কে নিঃশেষ করে দিয়েছিল এবং সে সাথে ব্যবসায়ী ও পেশাদার শ্রেণীর মূলধন নিঃশেষিত হয়ে পড়েছিল । কেইন্স এ সময় জার্মানীতে মূল্যস্ফীতি প্রত্যক্ষভাবে দেখেছিলেন আর সেখানে এটাও লক্ষ্য করেছিলেন যে মুদ্রার মানের অস্থিতি

জনসাধারণের বিশ্বাসকে বিধ্বস্ত করে দেয় । তার লেখায় কেইন্স বিশ্লেষণ করে তুলে ধরেছেন যে, মূল্যস্ফীতি কি করে অবিবেচকভাবে কিছু লোকের ধন আত্মসাৎ করে আর অন্যদিকে আরেক দলকে অভাবনীয় মুনাফা এনে দেয় ।

১৯১৯ সালে কেইন্স চেয়েছিলেন ইউরোপীয় সমাজের পুনর্গঠনকে সম্ভব করে তুলতে । মাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ানে ইউরোপের পুনর্গঠন সম্পর্কে কেইন্সের নিজের লেখায় তিনি মূল্যস্ফীতি, মুদ্রাসংকোচন ও বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবস্থা সম্পর্কে যে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন সেগুলোই পরবর্তীতে A Tract on Monetary Reform হিসেবে প্রকাশিত হয় । এ প্রবন্ধাবলীতে কেইন্স রক্ষণশীল মতবাদ ব্যক্ত করেছেন এবং মুদ্রার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ চেয়েছেন । এ সময় তিনি ইংল্যাণ্ডকেও ইউরোপের অবিচ্ছেদ্য অংগ বলে ভেবেছেন । কিন্তু ১৯২০ সালে লিবারাল পার্টির শিল্প সম্পর্কে সমীক্ষায় অংশ গ্রহণ করার পর তার এই ইউরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গী হারিয়ে যায় এবং তিনি অনেক বেশী বৃটিশ সচেতনতা প্রকাশ করেন । তাৎক্ষণিক সমস্যা ছিল বেকারত্ব যার সমাধান কেইন্স তার লেখায় খুঁজেছিলেন এবং তারই ফলশ্রুতিতে General Theory লেখা হয়েছে । কেইন্স বেকারত্বের সাথে সম্পদের অসম এবং স্বেচ্ছাচারী বন্টনকেও জাতীয় সমস্যা বলে গণ্য করেছেন ।

১৯২০ সালে কেইন্সের লেখা কিছু প্রবন্ধে তার চিন্তাধারার পরিচয় মেলে । তিনি মনে করতেন আর্থ-সামাজিক সংস্কারের জন্য রাজনৈতিক সম্ভাবনা সে সময়ে বিরাজ করছিল । The End of Laissez Faire প্রবন্ধে তিনি বেন্থামের দর্শন যে ব্যক্তি স্বার্থ জনস্বার্থের পরিপন্থি নয় বরং ও দু'টির একমুখী প্রবণতা রয়েছে তার সমালোচনা করেন । কেইন্স তার প্রবন্ধে লিখেছিলেন লম্বা গলার জিরাফগুলোই উঁচু ডালের কচিপাতা ভোগ করে আর ছোট গলার জন্তুরা ঝরে যাওয়া পায়ে দলা পাতার উপর নির্ভর করে ।

কেইন্স চেয়েছিলেন এমন এক সমাজ যেটি অর্থনীতিগতভাবে দক্ষ এবং সামাজিক অর্থে ন্যায় সম্মত । এদিক থেকে তিনি সরকারীভাবে সে উদ্যোগ গ্রহণের পক্ষপাতি ছিলেন যেগুলো বেসরকারী বা আধাসরকারীভাবে করা হয় না বা করা যায় না । তবে সরকারের জন্য সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সজ্ঞান ব্যবস্থাপনাকে তিনি প্রাথমিক কাজ বলে গণ্য করেছেন । তিনি ব্যবসাকে নিরুৎসাহিত করতে চান নি এবং ব্যবসায়ীর মুনাফাকে ছোট করতে চান নি কিন্তু শ্রমজীবীর জন্য তিনি সরকারী খরচে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, বিনোদন ও পেনশন চেয়েছেন যার মূল অর্থ ব্যবসায়ের উপরে কর থেকে আসবে । এসবের কারণে অনেকে তাকে সমাজতন্ত্রী বলে ভেবেছেন । কিন্তু তিনি নিজেকে বামপন্থী উদারনৈতিক বলে ভাবতেই পছন্দ করতেন ।

১৯৩০-এর দিকে ইউরোপে অর্থনৈতিক কারণে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের উদ্ভব হয় । সে সময় ইউরোপীয় দেশসমূহ অন্তর্মুখী হয়ে পড়েছিল নিজেদের সমস্যা সমাধানের তাগিদে । আর স্বৈরাচারী দেশসমূহ Regimentation-এর আশ্রয় নিয়েছিল । এসময় কেইন্সের চিন্তাধারায় জাতীয় আত্মনির্ভরশীলতার ধারা ছায়াপাত করে । তিনি রাষ্ট্রীয় অর্থ যোগান ও দেশে উৎপাদনের স্বার্থে শুল্ক বসানোর পক্ষে মতামত দেন । কিন্তু ব্যক্তি স্বাধীনতাকে সবচেয়ে মূল্যবান মনে করেছেন এবং এক অর্থে The General Theory এবং How to Pay for the War স্বৈরাচার বিরোধী মনোবৃত্তিরই প্রকাশ।

১৯২০ সালে কেইন্স বিলেতের লিবারাল পার্টির রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন । তিনি তাদের পক্ষে বক্তৃতা করেছেন, Nation পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন এবং নির্বাচনী দলীলে সরকারী ব্যয়ের মাধ্যমে বেকারত্ব লাঘবের ঘোষণা দিয়েছেন । ১৯২৮ সালে এক বক্তৃতায় মূল্যস্তর সম্পর্কে আলোচনায় তিনি মুদ্রা ও ঋণ নীতি সম্পর্কে দেশে যা ঘটছে তার নিরিখে নতুন আলোচনার আহ্বান জানান । এসময় তিনি Treatise on Money নিয়ে কাজ করছিলেন । যদিও তিনি রাজনীতি নিয়ে তখন আলোচনায় মেতে ছিলেন, তবুও সর্বক্ষণ অর্থনীতিই তার লক্ষ্য ছিল ।

তিনি সরকারের বিশেষজ্ঞ অর্থনীতিবিদদের একটা ভূমিকা অনুধাবন করেছিলেন । ১৯২৯ সালে শ্রমিক সরকারের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা পরিষদের অধীনে Economic General Staff সৃষ্টির সুপারিশ করে তিনি বলেছিলেন যে, সরকারী কর্ম সম্পর্কে ধারণার বিবর্তন হওয়া প্রয়োজন এবং সরকারকে অর্থনৈতিক জীবনধারার পথ প্রদর্শক ও সে পথে উত্তরণে সহায়ক হতে হবে । কিন্তু তিনি নিজেকে কখনই পেশাদারী দক্ষতা আর রাজনৈতিক দায়িত্বশীল অবস্থার চাপে পড়তে চাননি । তিনি শিক্ষাঙ্গনে অবস্থিত ক্ষুদ্র পরিসরে অর্থনীতি বিজ্ঞানে আত্ম নিবেদিত হয়ে থাকতে চান নি । তার মানসিকতা ছিল কর্মমুখী এবং বৃহত্তর অর্থে সমাজ সচেতন ব্যক্তি হিসাবে অর্থনীতি ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নীতিমাধ্যম নিয়ে ব্যাপৃত থাকতে চেয়েছেন। এজন্য তার শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল মার্শালের অর্থনীতি পাঠ এবং সমষ্টিগত অর্থনীতির তত্বগত আলোচনা তার পুরোপুরি জানা ছিলনা । তবুও তীক্ষ্ন বুদ্ধি ছাত্র-সহকর্মীর সাথে দীর্ঘ আলোচনা এবং স্বতঃস্ফূর্তজ্ঞান এক্ষেত্রে তার কাজের ভিত্তি রচনা করেছিল । আজীবন বাধা-বন্ধনহীন দার্শনিক আলোচনা, তার সুস্থ স্থিত স্বচ্ছল পারিবারিক জীবনধারা, অনুশীলনমুখী বিদ্যাভ্যাসে ও ক্ষমতাসীন লোকের সাথে জানাশোনা তাকে এক আত্মবিশ্বাসপূর্ণ মানসিকতা দিয়েছিল যেখানে অসম্ভবের সীমানা ছিল অপরিচিত । এবং তার অনন্যসাধারণ ক্রিয়াকর্ম তাকে এমনভাবে বহুল পরিচিত করে রেখেছিল যে তার নীতি নির্দ্ধারণী লেখা ও প্রচারণার দিকে সরকারকে কর্ণপাত করতে হত । সে কারণে ১৯২৯ সালে যখন তিনি সরকারী ব্যয়ের মাধ্যমে বেকারত্ব কমাবার কথা বলেছেন তখন লিবারাল সরকারকে দীর্ঘ শ্বেতপত্র ছাপিয়ে এ প্রস্তাবের সম্ভব্যতা সম্পর্কে সন্দেহ ব্যক্ত করতে হয়েছে ।

মেনার্ড কেইন্সের মানসিকতায় সমাজের ভাগ্যহতদের জন্য একটি তীব্র দায়িত্ববোধের পরিচয় পাওয়া যায় যার মূল হল খৃস্টিয় নৈতিকতা ও বিত্তবানের সমাজ চেতনায় । মেনার্ড কেইন্সের একটি অবিশ্বাস্য ক্ষমতা ছিল, তিনি অল্প সময়ে যে কোন বিষয়ে একটি কর্মপন্থা দাঁড় করাতে পারতেন এবং তিনি বিশ্বাস করতে ও করাতে পারতেন যে ঐ কর্মপন্থা অনুসরণ করলে অনেক আর্থ-সামাজিক সমস্যার তাৎক্ষণিক সহজ সমাধান সম্ভব হবে ।

মেনার্ড কেইন্সের দু'জন শিক্ষক তার সমাজ দর্শনকে প্রভাবিত করেছিলেন । একজন হলেন আলফ্রেড মার্শাল যিনি ছিলেন তার শিক্ষাক্ষেত্রে প্রধান গুরু, আর একজন হলেন মার্শালের প্রধানতম শিষ্য এ,সি, পিগু যিনি মার্শালের সমাজ দর্শনকে প্রকাশ করেছিলেন

তার The Economics of Welfare বইতে । এ দু'জনের দার্শনিক ও মতাদর্শগত প্রভাব কেইন্সের জীবনে সর্বদা বিদ্যামান ছিল । কেইন্সের General Theory-তে যে সামাজিক দর্শন মাঝেমাঝেই ফুটে উঠেছে সেটা প্রধানতঃ মার্শাল-পিগুর সমাজ দর্শন । যদিও প্রথম মহাযুদ্ধের পরে ভিক্টোরীয় সমাজ ব্যবস্থা মুদ্রাব্যবস্থার অস্থিতির মধ্যে ভেংগে পড়ে এবং আয়বৈষম্য বিদূরণের চাইতে বেকারত্ব অধিক গুরুতর সমস্যা হয়ে দেখা দেয় এবং কেইন্স মূলতঃ আয় সৃষ্টি ও শ্রমনিয়োগকে প্রাধান্য দিয়েছেন তবুও তার লেখায় সুষম সমাজ, বিত্তবানের সামাজিক দায়িত্ববোধ যেটা সরকারের দায়িত্ববোধে বিস্তৃত হয়েছে এবং নৈতিকতার ধারণা সর্বত্র বিধৃত ।

মেনার্ড কেইন্স তার লেখায় আলফ্রেড মার্শাল দিয়েই প্রভাবিত হয়েছিলেন । মার্শাল অবশ্য তার লেখা মূলতঃ মাইক্রোইকনমিকস এর ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন এবং সেখানেও তিনি আংশিক ভারসাম্য সম্পর্কেই বিস্তৃত আলোচনা করেছেন । এব্যাপারে মার্শালের কৃতিত্ব অত্যন্ত ব্যাপক, যদিও সেখানে কিছু কিছু ফাঁক থেকে গিয়েছিল যেগুলো পরে পিগু, জোন রবিনশন ও এডওয়ার্ড চেম্বারলিন শুধরাবার চেষ্টা করেছেন । কিন্তু মাইক্রোইকনমিকসের দৃষ্টিকোণ থেকে মার্শালের আংশিক ভারসাম্যের সবচেয়ে বড় বিষয় হল ক্যাপিটাল থিওরির মূল বিষয় নিয়ে আলোচনার অনুপস্থিতি এবং প্রয়োজনীয় সাধারণ ভারসাম্যের বিষয়ে অনুচ্চারণ। তবুও কেইন্স তার আলোচনায় মার্শাল নির্দেশিত বিশ্লেষণ অনুসরণ করেছেন, তার চাহিদা ও সরবরাহের অনুশীলনকে ব্যবহার করেছেন, অবিমিশ্র মূল্য নির্দ্ধারণে প্রতিযোগীতাকে নাতিদ্বিধায় গ্রহণ করেছেন । তেমনিভাবে শ্রমবিনিমোগের সাথে তাদের প্রকৃত প্রান্তিক উৎপাদন কমে যাওয়ার মার্শেলীয়তত্বও তিনি ব্যবহার করেছেন । অর্থাৎ মার্শালের অর্থনীতি থেকে মুক্ত হতে পারেন নি এবং মার্শালের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের কাঠামোকে আংশিক ভারসাম্যের বাইরে সমষ্টিগত ভারসাম্যের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন । অবশ্য মার্শেলীয় অর্থনীতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে পদ্ধতি কেইন্স অবলম্বন করেছেন সেটি হল মজুরীকে তিনি পরিমাপের একক হিসাবে ব্যবহার করেছেন । ফলে মুদ্রার পরিমাপে মূল্য প্রকৃত মূল্যের সমান হয়ে পড়েছে আর সে কারণে মার্শালের মাইক্রোইকনমিকসের অনেকটাই কেইন্সের মাইক্রোকনমিকসে ব্যবহার সম্ভব হয়েছে । ফলে কেইন্সকে অনেক মৌলিক বিষয় উপেক্ষা করতে হয়েছে । মাইক্রোইকনমিকসের একটি অনুমান হল প্রাথমিক স্তরে মুদ্রাঘটিত পরিবর্তনকে উপেক্ষা করে চলা । উনবিংশ শতকের শেষার্দ্ধে বা প্রথম মহাযুদ্ধের আগে এরকম একটা অনুমান অসংগত ছিল না তখন ব্যবসাচক্র ছোট এবং তীব্র ছিল, এটা মূলতঃ ব্যবসা বাণিজ্যকে ব্যাহত করত । এবং শিল্পোৎপাদনকেও শ্রমবিনিয়োগকে তেমন প্রভাবিত করত না । কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের পরে এটা আর সত্য ছিল না ।

মার্শাল মুদ্রা বিষয়ে কোন বই লেখেননি, যদিও তিনি তার Principles of Economic-এর মতই আরেকটি বই লিখবেন বলে পরিকল্পনা করেছিলেন । সেকারণে Quantity Theory of Money-এর একটি কেম্ব্রিজ ভাষ্য রেখে গেছেন যেখানে মুদ্রাকে এক জাতীয় সম্পদ হিসাবে গণ্য করে Marginal Utility তত্ত্ব ব্যবহার করা হয়েছে । কেইন্স পরবর্তী পর্যায়ে Treatise ও General Theory-তে এই বিচিন্তাকে মুদ্রার চাহিদা তত্ত্বের নতনুরূপ দিতে সক্ষম হয়েছেন ।

কেইন্সীয় চিন্তাধারার বিবর্তন

মেনার্ড কেইন্স অংকশাস্ত্রে দক্ষ হয়েও, এমনকি প্রাথমিক জীবনে Probability তত্ত্বের উপর সন্দর্ভ লিখেও গণিত নির্ভর অর্থনীতি বিষয়ে কাজ করেন নি । তার সারা জীবনের কাজ রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক প্রশ্ন নিয়েই ব্যাপৃত । তবুও তিনি রাজনীতি করেন নি, যদিও রাজনীতির অংগনে তিনি অপরিচিত ছিলেন না এবং সকল রাজনীতিকের ক্ষমতার সন্ধান ও অজানা ছিল না । কেইন্স ছিলেন একনিষ্ঠ বুদ্ধিজীবী যিনি মুক্ত বুদ্ধির সাহায্যে সমস্যা বিশ্লেষণ করে তার মতামত ব্যক্ত করতে ভালবাসতেন; কোন দল, ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর প্রতি তার প্রশ্নহীন আনুগত্য ছিল না । অনেকে মনে করতেন যে, এরকম মানসিকতা নিয়ে তিনি হয়তবা সিভিল সার্ভিসে সুনাম করতে পারতেন । কিন্তু রুটিন মাফিক বাধা ধরা কাজে তার ছিল অসহনীয় বিতরাগ, আর দাপ্তরিক অর্থহীন স্তরবিন্যাস ও নিয়মাবলীতে তিনি ছিলেন বিতশ্রদ্ধ । সেকারণেই বুদ্ধির সীমাহীন প্রকাশের সুযোগ যে কর্মে তিনি তার সমস্ত কিছুতেই নিজেকে ব্যাপৃত করেছিলেন— অধ্যাপনা, বিতর্ক, লেখা, সম্পাদনা ও পরামর্শদান ।

মেনার্ড কেইন্স ১৯৩৬ সালে তার General Theory লিখে তার মুখবন্ধে বলেছেন যে, তার চিন্তার স্বাভাবিক বিবর্তনের মাঝে General Theory-র উদ্ভব । স্মতর্ব্য যে, তার প্রথম বই ছিল ভারতীয় মুদ্রা ও অর্থ ব্যবস্থা সম্পর্কে সেখানেও কি General Theory-র বিচিন্তা লক্ষ্য করা যায় ? সে সম্পর্কে আপাততঃ কিছু না বলেও বিনা দ্বিধায় একথা বলা চলে ইংরেজী ভাষায় স্বর্ণমান সম্পর্কে যে সমস্ত লেখা রয়েছে মেনার্ড কেইন্সের প্রথম বইটি তার মধ্যে সবচেয়ে সুলিখিত । শুধু তাই নয় পরবর্তীকালে Treatise on Money-তে যে সমস্ত বিষয় আলোচনা করা হয়েছে তার কিছু কিছু মেনার্ড কেইন্সর প্রথম বইটিতে লক্ষণীয় এবং General Theory-তারই পরবর্তী অনুশীলন । একথা বলা চলে এজন্য যে কেবল মুদ্রা ব্যবস্থার বিষয় নিয়ে স্বল্প পরিচিত পরিসরে মেনার্ড কেইন্স ভারতীয় মুদ্রা ব্যবস্থার আলোচনা করেন নি । তার সজ্ঞানতা ছিল আরও বিস্তৃত । তিনি সমস্যার রূপ, সম্ভাব্যতা ও সম্ভাবনা অনুধাবন করেছেন । তিনি লক্ষ্য করেছেন যে, মুদ্রা ব্যবস্থার প্রভাব কেবল মূল্যস্তরের উপরে পরে তা নয় বরং আমদানী, রপ্তানী, উৎপাদনেও শ্রমনিয়োগের উপর তার প্রভাব ক্রিয়াশীল । লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিকসে ১৯১০-১১ সালে ভারতীয় অর্থ ব্যবস্থার উপরে বক্তৃতা দিতে গিয়ে এ সমস্তই তিনি তুলে ধরেছিলেন । এই অনুধাবনই তিনি প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর বৃটেনের অভিজ্ঞতার আলোকে বিচার করেই তত্বীয় যে উত্তরণ ঘটান তারই শেষ ফলশ্রুতি হল General Theory.

এর মাঝে তিনি অবশ্য The Economic Consequence of Peace (১৯১৯) লিখেছেন । বইটি অসাধারণ সাফল্য অর্জন করে । এই অসাধারণ সাফল্যের মূলে ছিল অসাধারণ ব্যবহারিক জ্ঞান, শানিত যুক্তি, আন্তরিক মানবিক আবেদন, তথ্যের বাস্তব উপস্থাপন এবং সুস্থির বিশ্লেষণ। আর ছিল প্রাঞ্জল ভাষার কারিগরী । এই বই-এর পরেই তিনি লিখেছেন A Revision of the Treaty (১৯২২) । বই দু'টিতে তিনি তাত্বিক উপস্থাপনা পরিহার করেছেন । এসময়ে তার আর্থ-সামাজিক উপলবিদ্ধকে তিনি ব্যক্ত করেছেন এভাবেঃ Laissez Faire ধনতন্ত্রের অসাধারণ যুগের অবসান হয়েছে ১৯১৪

সালের আগষ্ট মাসে। সে সময়ের অবসান হয়েছে যখন ব্যবসায়ী উদ্যোক্তাদের উদ্যোগী কর্মকাণ্ডে একের পর এক সাফল্য অর্জন করেছে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বিনিয়োগের অপরিমেয় সুযোগ, উৎপাদন কৌশল উন্নয়ন এবং অন্যদেশ থেকে আনা সস্তা কাঁচামাল ও খাদ্যের কারণে। সে অবস্থায় বিত্তবানের উদ্ধৃত্ত বিনিয়োগের সমস্যা ছিল না। কিন্তু মেনার্ড কেইন্স লক্ষ্য করলেন যে প্রথম মহাযুদ্ধের পরে সে অবস্থার গুণগত পরিবর্তন হয়েছে।

বিনিয়োগের সুযোগ কমে আসছে এবং বিত্তবানের সঞ্চয় তার সামাজিক উন্নয়নে সহায়ক না হয়ে অবনতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখানেই অর্থনৈতিক স্থবিরতা সম্পর্কে নতুন তত্ব পাওয়া যায় যেটি রিকার্ডোর মতামত থেকে ভিন্ন এবং যেটি পরে General Theory-তে পূর্ণতা লাভ করেছে। অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে প্রতিটি পূর্ণ তত্বের দু'টি দিক থাকে একটি হল সমাজ ও সামাজিক অবস্থার নিরক্ষীত জ্ঞান অর্থাৎ এক সময় কোন বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ আর কোন বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ নয়। অন্যটি হল বিশ্লেষণের শৈলী যার মাধ্যমে তার বোধিকে সংগঠিত করা যায় এবং তত্ব সৃষ্টি হয়। Economic Consequence of Peace-এ তত্ব নেই, আছে সমাজদৃষ্টি। আর General Theory হল সে সমাজদৃষ্টির রূপান্তরিত তাত্ত্বিক রূপ।

যারা অর্থনীতির "বৈজ্ঞানিক" রূপে আকৃষ্ট তাদের কাছে General Theory-র লেখক মেনার্ড কিইন্স অনেক বেশী আকর্ষণীয়। কিন্তু Economic Consequence of Peace থেকে General Theory-র দিকে এই যে অগ্রগমন, যদিও এটা অনেকাংশে সরলরৈখিক, তবু তার উত্তরণ আছে বিভিন্ন পর্যায়ে। তারই একটি পর্যায় হল A Tract on Monetary Reform (১৯২৩)। কেইন্স চেয়েছিলেন বাস্তবতার নিরিখে সম্ভাব্য নীতির নির্দেশনা দিতে। তিনি প্রথমতঃ অভ্যন্তরীণ মূল্যস্তরকে স্থিতিশীল করে অভ্যন্তরীণ ব্যবসা, বাণিজ্য, বিনিয়োগ তথা অর্থনীতিকে স্থিতিশীল করতে চেয়েছিলেন। এবং এরই সাথে বৈদেশিক মুদ্রা মূল্যে অস্থিতির দরুন অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে যে সাময়িক অস্থিরতা দেখা যায় সেটা বিদূরণ করতে চেয়েছিলেন। এই দুই লক্ষ্যে পৌছাবার জন্য তিনি মুদ্রা সৃষ্টিকে (Note Issue) কেন্দ্রিয় ব্যাংকের স্বর্ণ সঞ্চয় থেকে বিযুক্ত করে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিলেন, যদিও স্বর্ণ সঞ্চয়ের প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। লক্ষ্যণীয় যে, মেনার্ড কেইন্সের বিশ্লেষণ ও উপদেশ বৃটিশ অবস্থার বিশেষ প্রেক্ষিতে করা হয়েছিল। এটি তার স্বদেশ প্রেম, রক্ষণশীলতা ও নিঃসঙ্গতা থেকে এসেছিল। এবং সে কারণে তিনি অন্য দেশের দৃষ্টি ভংগি, অবস্থা, স্বার্থ এবং বিশ্বাস অনুধাবনে ব্যর্থ হয়েছেন। এখানে এটাও সমর্তব্য তিনি কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য ছিলেন না, শ্রেণী নির্দিষ্ট মতবাদেও নাম লেখান নি, তিনি ছিলেন মহাযুদ্ধের পূর্বে বৃটিশ মুক্তবুদ্ধির প্রতীক যাদের আদর্শ ছিল লক এবং মিল।

ইংল্যাণ্ড নেপলিয়ানের সাথে যুদ্ধ জয় করে যে অবস্থায় ছিল প্রথম মহাযুদ্ধের পরে সে অবস্থায় ছিল না। তার সম্পদ ক্ষয় হয়েছিল, অনেক সুযোগ নষ্ট হয়েছিল, তার সামাজিক অবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছিল এবং সর্বক্ষেত্রে অনমনীয়তা পরিলক্ষিত হচ্ছিল। তার কর ও মজুরীর হার দ্রুত উন্নয়নের পরিপন্থি হয়ে পড়েছিল, কিন্তু সেগুলো পরিবর্তন রাজনৈতিকভাবে সম্ভব ছিল না। কেইন্স যা সম্ভব নয়, তা নিয়ে ভাবতে অভ্যস্ত ছিলেন

না। তিনি একক সমস্যা সমাধানের দিকে— যেমন কয়লা, বস্ত্র, লোহা, জাহাজ নির্মাণ— মনোযোগ না দিয়ে, সামগ্রিক অর্থনীতিকে নিরিখ করতে চেয়েছেন। যা সম্ভব এবং যা সামগ্রিক অর্থনীতির জন্য কার্যকর— সেই মুদ্রাব্যবস্থাপনা— তার মনযোগ আকর্ষণ করে। তিনি জানতেন বৃটেন যুদ্ধপূর্ব স্বর্ণমানে ফিরে যেতে পারে না। এবং মুদ্রাব্যবস্থাপনা কিছু অসুবিধা ও সমস্যাকে অন্ততঃ সহজতর করে তুলতে পারে। কেইন্স যেহেতু বৃটিশ অবস্থার প্রেক্ষিতে তার নীতিমালা ও বিশ্লেষণের অগ্রগমন ঘটিয়েছেন, সে জন্য এটাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, কেইন্সীয় অর্থনীতি অন্যত্র স্থাপন করতে গেলে পরিবেশের পরিপূর্ণ বিচার বিশ্লেষণ প্রয়োজন। Tract of Mometary Reform-এ নতুন কিছু ছিলনা, ছিল উপস্থাপনার প্রাসংগিকতা এবং অর্থনৈতিক অবস্থার সামগ্রিক সমস্যার সমাধানে মুদ্রা ব্যবস্থাপনার ব্যবহার। আর ছিল মুখবন্ধ ও প্রথম অধ্যায়ে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সম্পর্কে তার উদ্বেগ যা ছিল Economic Consequence of Peace-এ তার উপস্থাপনার চাইতে আরও একটু সুসংবদ্ধ।

কেইন্স বিশ্লেষণের জন্য Quantity Theory of Money-কে মূলসূত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। এখানে অবশ্য বিনিময় সমীকরণ (Equation of Exchange) এবং মুদ্রার সংখ্যা তত্বের মধ্যে পার্থক্য কেইন্স অনুধাবন করতে পারেন নি। যেটি কেইন্স গ্রহণ করতে চেয়েছেন তা হল কেম্ব্রিজ ভাষ্যের বিনিময় সমীকরণ, যেটি identity বা ভারসাম্যের শর্ত হিসেবে যা নির্দেশ করে তার সাথে মুদ্রার সংখ্যাতত্বের প্রতিজ্ঞাগুলোর মিল নেই। সে কারণেই মেনার্ড কেইন্স মুদ্রার ভেলসিটিকে মুদ্রা ব্যবস্থাপনার একটি পরিবর্তনীয় রূপ হিসাবে গণ্য করেছেন। এবং এখানেই General Theory-র Liquidity Preferance তত্বের প্রাথমিক বিকাশ লক্ষ্যণীয়। তার বইটিতে অন্যান্য উল্লেখযোগ্য দিক ও রয়েছে। তিনি বিনিময়ের আগাম বাজার সম্পর্কে অত্যন্ত বিশ্লেষণধর্মী ও মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন। তিনি গ্রেট বৃটেনের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কেও আকর্ষণীয় আলোচনা করেছেন।

কেইন্সের চিন্তাধারার উত্তরণের দ্বিতীয় পর্যায় হল Treatise on Money, এমন উদ্দীপক বই কেইন্স সম্ভবতঃ দ্বিতীয়টি লেখেন নি। এ বইতে তিনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের চিন্তা ধারার প্রাককথনও রেখেছেন ভূয়োদর্শী হিসেবে। দু'খণ্ডে সমাপ্ত এ বইটি কেইন্সের উচ্চাভিলাসী কর্ম এবং এখানেই কেইন্সের প্রকৃত গবেষণার পরিচয় রয়েছে। অনেক অর্থনীতিবিদের মতে কেইন্স যদি মার্শালের মত লেখায় চরমোৎকর্ষ ও পূর্ণতার সন্ধান করতেন তা'হলে এত সম্ভাবনাময় ও অর্থবহ একটি কাজ এত কম সমাদৃত হতো না। তবুও এ বইটি মেনার্ড কেইন্সের চিন্তার উৎসারণ ক্ষেত্রে একটি উজ্জ্বল পথ নির্দেশ।

এ বইতেই মুদ্রা যে অর্থনীতির প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে সে তত্বটিই প্রাথমিকভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এবং অর্থনৈতিক অবস্থার বিশ্লেষণে মুদ্রার এই কেন্দ্রিয় অবস্থান Economic Consequence of Peace থেকেই উপ্ত হয়ে কেইন্সীয় আলোচনায় প্রাধান্য লাভ করেছে। উপরন্তু সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণভাবে পৃথক করে দেখা হয়েছে এবং ব্যক্তিক বা বেসরকারী মুনাফা সমস্ত অস্থিতির প্রতিকার হিসেবে ধরা পড়েছে। যদিও কেইন্স এ বইতে উইকসেলের স্বাভাবিক ও আর্থিক সুদের হারের

তারতম্য নিয়ে কথা বলেছেন, তবুও আর্থিক হার পরবর্তিতে General Theory-তে যে সুদের হারের উল্লেখ করেছেন তার সাথে সমার্থক নয় এবং স্বাভাবিক হার বা মুনাফা সম্পর্কে তিনি যে marginal efficiency of capital-এর আলোচনা করেছেন তার মধ্যেও একার্থক নয় । এ ছাড়াও তিনি প্রত্যাশাজনিত পরিবর্তন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন যেটি পরবর্তীতে ঝুঁকি নেওয়ার প্রবণতায় মুদ্রার চাহিদা সম্পর্কে তার মৌলিক মতবাদের অগ্রচিন্তা মাত্র ।

তবুও Treatise of Money গ্রন্থ হিসাবে অপক্ক ও অসফল । সবাই কেইন্সের প্রচেষ্টাকে অভিনন্দিত করেছেন এবং হানসেন বা হায়েক যারা এর মূল সমীকরণ বা তাত্বিক কাঠামো নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তারাও সশ্রদ্ধভাবেই তাদের আলোচনার উপস্থাপনা করেছেন । তবুও কেইন্স নিজেও বুঝতে পেরেছিলেন যে তার প্রচেষ্টা পূর্ণসমাদর পায়নি এবং তিনি যা বলতে চেয়েছেন তা পাঠকের কাছে পরিস্ফুট করে তুলতে পারেন নি । ঐ বইতে মূল্যসূচক, ব্যাংক রেট, ডিপোজিট তৈরী, স্বর্ণ সঞ্চয় ইত্যাদি সম্পর্কে যে আলোচনা আছে তাতে নতুন তত্ব বা দৃষ্টি ভংগির তেমন পরিস্ফুট কোন পরিচয় নেই । কেইন্স চেয়েছিলেন নীতি নির্দ্ধারণে সহায়ক বিশ্লেষণের নতুন শৈলী সৃষ্টি করতে যেটা তার পূর্বসূরীদের থেকে ভিন্ন। কিন্তু যতবারই তিনি এ চেষ্টা করেছেন ততবারই ঐ শৈলী তাকে কাঙ্খিত ফল দেয়নি ।

এ ব্যর্থতাই তাকে General Theory রচনায় অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে । তিনি তার সমস্ত প্রতিভাকে নিয়োজিত করেন এমন এক শৈলীর উদ্ভাবন করতে যা পূর্বসূরীদের থেকে ভিন্ন অথচ যা থেকে প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ সম্ভব হয়ে উঠবে । এ জন্য তার প্রয়োজন হয়েছিল অর্থনৈতিক ধারণাগুলোকে নতুনভাবে বিচার করা । আর এ কাজে তার সহায়ক হয়েছিলেন একদল গুণগ্রাহী ছাত্র ও সহকর্মী যারা কিংস কলেজে কেইন্সের সানিধ্যে তার মতামত ও বিশ্লেষণ নিয়ে দিনের পর দিন উদ্দীপ্ত আলোচনা করেছেন ।

Economic Consequence of the Peace-এ কেইন্স প্রথম যে অর্থনৈতিক বাস্তবতার কথা বলেছিলেন— যেখানে বিনিয়োগের সুযোগ কমে যায় অথচ সঞ্চয়ের স্বভাব থেকে যায়— সেটাই তিনি General Theory-তে পরিস্ফুট করলেন তিনটি concept-এর মাধ্যমে একটি হল ভোগ সম্পর্কে (consumption function), অন্যটি হল বিনিয়োগ সম্পর্কে (efficiency of capital funcition) এবং তৃতীয়টি হল মুদ্রার চাহিদা সম্পর্কে (liquidity preference function). এগুলোই স্থির মজুরী এবং স্থির মুদ্রা সরবরাহ সহযোগে আয় এবং শ্রমবিনিয়োগ (employment) নির্ধারণ করে; আয়ের সাথে শ্রম নিয়োগের সম্পর্ক একরৈখিক । এত অল্প তত্ব নিয়ে এত বড় সমস্যা সমাধান সম্ভব হল কি করে ?

প্রথমতঃ কেইন্স সমষ্টিকৃত variable নিয়ে আলোচনা করেছেন । শ্রম নিয়োগ ছাড়া অন্য সমস্ত variable-ই অর্থমাত্রায় বিবেচিত । অর্থাৎ কেইন্স মূলতঃ মুদ্রাভিত্তিক বিশ্লেষণকে প্রাধান্য দিয়েছেন, এবং জাতীয় আয় হল তার বিশ্লেষণের মূল কেন্দ্র । এদিক থেকে তার আলোচনার সাথে Quesnay এবং Cantillon-এর সাদৃশ্য লক্ষ্যণীয় ।

দ্বিতীয়তঃ প্রক্রিয়ার বিবর্তনে যে সমস্ত জটিলতা দেখা দেয় কেইন্স তা এড়িয়ে গেছেন । তিনি 'স্থির' অবস্থার চিত্র একেছেন পরিবর্তনের মধ্যে না গিয়ে । যদিও তার লেখায় অনেক পরিবর্তনশীল factors ও Variable -এর পরিচয় মেলে ।

তৃতীয়তঃ কেইন্স তার 'মডেল' স্বল্পকালীন করে রেখেছেন । যদিও তার আলোচনায় দীর্ঘকালীন প্রেক্ষিত কখনও কখনও উপস্থাপিত হয়েছে । আর এই স্বল্পকালীনতার জন্য তার মডেলে উৎপাদন কার্য্য, উৎপাদন প্রক্রিয়া এবং উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির সংখ্যা ও গুণ অপরিবর্তনীয় রাখা হয়েছে । ফলে অনেক সহজীকরণের পথ উন্মুক্ত হয়েছে যা অন্যথায় সম্ভব ছিল না, এরই ফলে শ্রমনিয়োগ আয়ের সাথে আনুপাতিক সম্পর্কে সম্পর্কিত হয়ে পড়েছে । ফলে কেইন্সের মডেল দীর্ঘকালীন প্রেক্ষিতে ব্যবহারযোগ্য হয়ে উঠে নাই । অবশ্য স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে কেইন্স যে সময় General theory লিখছিলেন সেটি মহামন্দার কাল এবং ঐ রকম সময় উৎপাদন প্রক্রিয়া, শৈলী ও যন্ত্রপাতিকে অপরিবর্তনীয় বলে মনে করা যায় এবং ঐ সময় Liquidity preference তার প্রভাব বিস্তার করতে পারে । সে কারণে হিকস কেইন্সার তত্ত্বকে মন্দানির্ভর অর্থনীতি বলেছেন । যদিও কেইন্সীয় তত্ত্ব সম্ভবতঃ অর্থনীতির স্থবিরতা থেকেই অধিকতর সমর্থন লাভ করে ।

চতুর্থতঃ কেইন্স আরও শ্রমনিয়োগের প্রত্যক্ষ নিয়ামকের বাইরে আলোচনা দীর্ঘায়িত করতে চাননি অত্যন্ত সজ্ঞানভাবে । তিনি অবশ্য স্বীকার করেছেন যে এই প্রত্যক্ষ নিয়ামকগুলোরও বিচার বিশ্লেষণ সম্ভব যার ফলে এর পেছনে যে কারণগুলো রয়েছে সেগুলো অনুধাবন করা যায় । তবে কেইন্স এটা করেছিলেন মূলতঃ তার যুক্তিকে তীক্ষ্ণতায় তুলে ধরতে ।

পঞ্চমতঃ কেইন্স তার যুক্তিকে অনেক সময়ই অতিরঞ্জনের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন । এই অতিরঞ্জনের প্রয়োজন হয়েছিল অপ্রয়োজনীয় থেকে তার যুক্তি ধারাকে লক্ষণীয় করে তুলে ধরার জন্য । তা ছাড়া এই অতিরঞ্জনই হয় তো বা এত সহজে কেইন্সের মূল যুক্তির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ সম্ভব করেছে । অবশ্য অতিরঞ্জনের যে দিকটি অনেকেই মাত্রাধিক্য মনে করেন সেটি হল কেইন্সীয় তত্ত্বের General theory নামকরণ।

তা সত্ত্বেও এ কথা বলতেই হবে কেইন্স তার প্রয়োজনে যে সমস্ত ধারণার সমাহার ঘটিয়েছিলেন তার সবটাই তার তত্ত্বের জন্য প্রয়োজনীয় ও যথার্থ । এবং সেখানেই সম্ভবতঃ কেইন্সীয় চিন্তাধারার সামগ্রিক উৎকর্ষ । যুক্তি নির্ভর বই হিসেবে General Theory তাৎক্ষণিক সাফল্য লাভ করে । শুধু তাই নয় অর্থনীতিতে কেইন্সীয় স্কুল বলে এক দল অর্থনীতিবিদের আবির্ভাব ঘটে । যারা এই স্কুলে অন্তর্ভুক্ত নন, তাদের মধ্যেও অনেকেই সহজভাবে অথবা অনুপায় হয়ে বিশ্লেষণের জন্য কেইন্সীয় তত্ত্বের এক বা একাধিক ধারণা গ্রহণ করেছেন । তা ছাড়াও আছে অগণিত সহানুভূতিশীল অর্থনীতি গবেষক ও নীতি প্রণয়কারী যারা কেইন্সীয় তত্ত্ব পরিবর্ধন ও পরিমার্জনা করতে প্রয়াসী হয়েছেন । লর্ড জন মেনার্ড কেইন্সের সাফল্য এখানেই ।

কেইন্সীয় অর্থনীতির কিছু আলোচনা

লর্ড কেইন্স নিঃসন্দেহে এ শতাব্দীর সব চেয়ে খ্যাতিমান ও বিতর্কিত অর্থনীতিবিদ। তিনি এ্যাডাম সিমথ, ডেভিড রিকার্ডো এবং জন স্টুয়ার্ট মিলের মতই ক্ষুদ্র পরিসরে বিশেষজ্ঞ না হয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন বিষয়ে তার প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন এবং বিভিন্ন ব্যাপারে নিজেকে ব্যাপৃত করেছেন। একদিকে যেমনি তার বিশেষ জ্ঞানের অভাব ছিল না, অন্যদিকে তিনি জ্ঞানের পরিধি টেনে নিজেকে ক্ষুদ্র পরিধিতে বিচ্ছিন্ন করতে চাননি। লর্ড কেইন্সকে বুঝতে হলে অন্য অর্থনীতিবিদ ও অন্য অর্থনীতি মতবাদের পরিপ্রেক্ষিতে তার আলোচনা করতে হবে। আধুনিক অর্থনীতি অর্থাৎ শিল্পভিত্তিক ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা ও বিশ্বব্যাপী বাজার-এর গোড়াপত্তন ঘটে সপ্তাদশ শতকে। তার পরবর্তী দেড়শ বছর ধরে ইংল্যাণ্ডেই আধুনিক অর্থনীতির তাত্ত্বিক অগ্রগতি ঘটেছে। এবং সে কারণে রিকার্ডো ও তার সমসাময়িক বৃটিশ রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি পাশ্চাত্যে অবিসংবাদী সম্মান অর্জন করে এবং আধিপত্য বিস্তার করে। উনবিংশ শতকের শেষার্ধে ক্লাসিক্যাল ধারার সমন্বিত পরিচিতি বিনষ্ট হয়। আগে অর্থনীতির একটি ধারার নানা উপধারা সংযোজিত ও সমন্বিত হত, কিন্তু পরে দুটো পৃথক ধারার সৃষ্টি হয় তার একটি হল মার্কসবাদী এবং অন্যটি নিউ-ক্লাসিকাল। যদিও দুটি ধারাই ক্লাসিকাল অর্থনীতির উত্তরসুরী বলে দাবী করতে পারে, তবুও এদুটি ধারার মধ্যে কোন সম্পর্ক ছিলনা বা গড়ে ওঠেনি। তার কারণ অবশ্য দুটি ধারা নিজের প্রয়োজনে ক্লাসিকাল অর্থনীতির বিভিন্ন তত্ত্ব গ্রহন বা বর্জন করেছে, পরিবর্তন বা পরিমার্জনা করেছে। তারাও কারণ হল মার্কসীয় অর্থনীতি উন্মুক্ত ভাবে এবং নিউ ক্লাসিকাল অর্থনীতি প্রচ্ছন্নভাবে দুটি বিরোধী ও বিবাদমান মতাদর্শের ভিত রচনা করেছে এবং আরও রয়েছে অন্য একটি ঐতিহাসিক কারণ, সেটি হল জাতীয়তার কারণে, মার্কসীয় অর্থনৈতিক মতবাদ বহুদিন ইংরেজী ভাষাভাষী বুদ্ধিজীবীদের মাঝে অর্থবহ কোন আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারেনি।

যখন মেনার্ড কেইন্স বিংশ শতকের শুরুতে আলফ্রেড মার্শালের কাছে অর্থনীতির পাঠ নিতে শুরু করেন, তখন নিউ ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতিই ইংরেজী ভাষাভাষী দেশে তার প্রভাব বিস্তৃত করেছে। মার্শাল তার প্রতিভার সাহায্যে গ্রহণযোগ্য সমস্ত তত্ত্বের একটি সার্বিক সমন্বয় সাধন করেছিলেন। এই সমন্বিত অর্থনীতির ধারাকেই কেইন্স গ্রহণ করেছিলেন। মার্শালও তার এই ছাত্রকে প্রতিভাধর উত্তরসুরী হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন বলেই ট্রেজারী থেকে কিংস কলেজে তার প্রত্যাবর্তনকে তিনি সোৎসাহে স্বাগত জানিয়ে নিজের আয় থেকে অতিরিক্ত বার্ষিক ১০০ পাউণ্ডের ব্যবস্থা করেছিলেন। মেনার্ড কেইন্স শিক্ষাগত দিক থেকে নিউ-ক্লাসিকাল অর্থনীতির ধারক ছিলেন।

মেনার্ড কেইন্স এই নিউ-ক্লাসিকাল মতবাদের সংস্কারক মাত্র। আর এ সংস্কারের মূল লক্ষ্য হল অর্থনীতিকে বাস্তবতার মুখোমুখী নিয়ে আসা এবং একে রাষ্ট্রীয় নীতি প্রণয়নে অর্থবহ করে তোলা। এ কারণেই তিনি কখনই নিউ-ক্লাসিকাল অর্থনীতির গণ্ডি বা সীমাবদ্ধতা পার হতে পারেননি। এবং সে সীমাবদ্ধতার মূলে রয়েছে ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত ছাড়াই অর্থনৈতিক জীবন ও প্রবাহকে স্বীকার করে নেয়া। এ কারণেই বলা হয়ে থাকে নিউ ক্লাসিকাল অর্থনীতি সামাজিক ক্রিয়াকর্মের বিশ্বস্ত দিকনির্দেশ দিতে ব্যর্থ হয়।

মেনার্ড কেইন্সের General Theory শুরু হয় গোড়া অর্থনৈতিক মতবাদকে আক্রমণ করে এবং সমস্ত বইটি জুড়ে এ আক্রমণ অব্যাহত থাকে । এ আক্রমণের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল জে, বি, সের বাজারনীতি যার মূল কথা হল উৎপাদনের তুলনায় চাহিদা কখনই কম হতে পারে না । এর প্রতিপক্ষে ক্ষীণ প্রতিবাদ সত্ত্বেও সমস্ত ক্লাসিকাল ও নিউ ক্লাসিকাল অর্থনীতি জুড়েই এই বাজার নীতি প্রত্যক্ষ বা প্রচ্ছন্নভাবে ক্রিয়াশীল । অর্থনীতিবিদদের আলোচনায় এর প্রভাব অর্থনীতিকে প্রায়ঃশই বাস্তবতাবর্জিত করে তুলেছে । মেনার্ড কেইন্স ক্লাসিকাল ও নিউ ক্লাসিকাল অনেক তত্ত্বেরই সমালোচনা করে অগ্রসর হয়েছেন, কিন্তু সমস্ত সমালোচনার কেন্দ্রে ছিল জে, বি, সের বাজারতত্ত্ব । ঐ বাজার তত্ত্ব গ্রহণ করলে কেইন্সের অন্য সমালোচনাও অসার হয়ে পড়ে । একবার এ বাজার তত্ত্ব অগ্রহণীয় বলে সিদ্ধান্ত করে তাকে সমস্ত ক্লাসিকাল ও নিউ ক্লাসিকাল তত্ত্বের আগাগোড়া খুঁজে বেড়াতে হয়েছে সে সমস্ত তত্ত্বের খোঁজে যেগুলো জে,বি, সের বাজার তত্ত্বের উপর নির্ভরশীল আর যেগুলো তেমন নির্ভরশীল নয় । একথাই মেনার্ড কেইন্স তার General Theory -র ভূমিকায় ব্যাক্ত করেছেন এই বলে যে পুরানো ধারণা থেকে যুক্তিই কষ্টকর, নতুন ধারণা তেমন কষ্টকর নয় । মেনার্ড কেইন্সের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি সম্ভবতঃ সমস্ত পাশ্চাত্যের অর্থনীতিকে একটি পীড়াদায়ক সীমাবদ্ধকারী তত্ত্ব থেকে মুক্তি যার ফলে তার পরের অনেক অর্থনীতিবীদ নতুনভাবে অর্থনীতি নিয়ে চিন্তাভাবনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন ।

একদিক থেকে বলা চলে যে কেইন্স গতানুগতিক অর্থনীতির সংকটকালে তার প্রতিভা নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন মহামন্দার সময় যখন এই সংকট অত্যন্ত তীব্রভাবে অনুভূত হয়েছিল । তিনি অত্যন্ত স্পষ্ট করে তুলে ধরেছিলেন যে জে,বি,সের বাজার তত্ত্বের অবশ্যসম্ভাব্যতা গ্রহণ করে মহামন্দার মত বাস্তবতাকে তাত্ত্বিক ভাবে অসম্ভব বিবেচনা করা হয়ে থাকে । এখান থেকেই তার ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার সুতীক্ষ্ম বিশ্লেষণের সূচনা যার ফলে তিনি মন্দা, সম্পদের অপূর্ণ ব্যবহার, বেকারত্ব ইত্যাদির সম্ভাবনার বাস্তবতা তুলে ধরেন । তিনি ব্যক্তিস্বার্থ ও জনস্বার্থের দ্বন্দ্বও এরই সাহায্যে চিত্রিত করেন । উনবিংশ শতকের যে উদারনৈতিক তত্ত্ব যার ফলে বিশ্বাস জন্মেছিল যে ব্যক্তি স্বার্থের optimisation-এর মাঝেই জনস্বার্থ রক্ষিত হয়, সে উদারনৈতিক তত্ত্বকেই মেনার্ড কেইন্স অস্বীকার করলেন । কিন্তু কেইন্স ব্যক্তি ও জনস্বার্থের বৈষম্যকে সরকারের বদান্যতা বা বুদ্ধিমত্তা দিয়ে সারিয়ে নিতে চাইলেন; তিনি ক্ষমতার বিন্যাস, শ্রেণীগত বৈষম্য বা সমাজ ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তোলা থেকে বিরত থাকলেন । অর্থাৎ কেইন্স ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সামগ্রিক বিষয় নিয়ে প্রশ্ন তোলেননি, তিনি ইতিহাসের বিচারে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে দেখেননি, অর্থনৈতিক অবস্থার সাথে রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও প্রযুক্তিগত অবস্থার সম্পর্কিত বিবেচনা করে দেখেননি । অর্থাৎ কেইন্স ধনতন্ত্রের সমস্যাকে অনুধাবন করেছিলেন আংশিকভাবে এবং তার সংস্কার মূলক সমাধানই তিনি আলোচনা করেছেন যেখানে ব্যক্তির সীমাবদ্ধতাকে সমষ্টি উত্তরণ করে সরকারী প্রচেষ্টার মাধ্যমে ।

এখানে স্মরণযোগ্য যে, মার্কস শুরু থেকেই জে,বি,সের বাজার তত্ত্বকে বাতিল বলে চিহ্নিত করেছিলেন এবং মার্কসের অনুসারীরা ১৯০০ সালের আগেই বিতর্কে নেমে

ছিলেন এই নিয়ে যে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা স্থায়ী ও chronic মন্দাবস্থায় পতিত হবে কিনা। কেইন্স উৎপাদন কৌশলে পরিবর্তন এবং সেই কারণে বেকারত্ব উপেক্ষা করেছেন, অন্যদিকে মার্কসীয় আলোচনায় সেটি প্রাধান্য পেয়েছে কারণ মার্কস মনে করতেন যে উৎপাদন কৌশলে পরিবর্তনের মধ্যদিয়েই ধনপতিরা শ্রমিকের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে। মেনার্ড কেইন্স একচেটিয়া ব্যবসা, তার কারণে আয় বন্টনের বৈষম্য এবং উৎপাদনের উপাদান ব্যবহারের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেননি এবং এ কারণেই তিনি বলতে পেরেছিলেন যে এ কথা মনে করবার কোন কারণ নেই যে, বর্তমানে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার উৎপাদনের উপাদানগুলোর অব্যবহার বা অপব্যবহার হচ্ছে যদিও তখন বেকারত্ব প্রকট হয়ে বিরাজমান ছিল। এ কারণেই কেইন্স রাষ্ট্রকে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন সমস্যার সমাধানের সহায়ক হিসেবে যখন ধনতান্ত্রিক বাজার ব্যবস্থা অন্য কোন সমাধান দিতে অপারগ। কিন্তু কেইন্স রাষ্ট্রের শ্রেণী চরিত্র ও সে কারেণ তার ক্ষমতার বৈশিষ্ট্য সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারেননি। অবশ্য এ কথার অর্থ এই নয় যে কেইন্সের বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত অথবা মার্কসীয় অর্থনীতি সর্বত্র সর্বদা অভ্রান্ত। বরং একথা মনে করবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে কেইন্সীর অর্থনীতির আলোকে মার্কসের Das capital -এর অসমাপ্ত খণ্ড, বিশেষ করে Theorien Uber den Mahrwert নতুনভাবে অর্থবহ হয়ে উঠে। কেইন্সীয় অর্থনীতির সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও অর্থনীতির বিশ্লেষণে এটি একটি ঐতিহাসিক দিক চিহ্ন, শুধু তাই নয়,কেইন্সের কারণেই সম্ভবতঃ মার্কসীয় ও নিউ ক্লাসিকাল অর্থনীতির মধ্যে আলোচনা ও বিতর্ক নতুন করে সম্ভব হয়েছে যার কিছু পরিচয় আমরা জোন রবিনসনের লেখায় পেয়ে থাকি।

মানুষ কেইন্স

জন মেনার্ড কেইন্স কেমন লোক ছিলেন ? যৌবনে রসিকতায় মোহনীয়, বুদ্ধিমত্তায় উদ্দীপ্ত, সহানুভূতিতে উদ্বেল, কর্মে নিবেদত এবং স্বীয়দক্ষতায় বিশ্বাসীর দম্ভও তার ছিল। এ সমস্তই তার কাজে, কথায়, লেখায়, চিঠিপত্রে ফুটে উঠেছে। তার কর্মনিষ্ঠার একটা পরিচয় হল তার নিজের কথায় তিনি দিনে অন্ততঃ ১০০০ শব্দ লিখেছেন সে যুগে যখন টাইপ রাইটার, ষ্টেনোগ্রাফার, ডিক্টাফোন বা রেকর্ডার, ওয়ার্ড প্রসেসর কিছুরই চল ছিল না। ১৯২০ থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত তিনি গড়ে সপ্তাহে সংবাদপত্রের জন্য একটি নিবন্ধ লিখেছেন। এ ছাড়া ছিল তার শিক্ষকতা, সম্পাদনা কর্ম, বই লেখা, বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানে তার মতামত জানানো এবং অন্যান্য শিল্প সাহিত্য ব্যবসা সম্পর্কীয় কাজ।

এতসব তিনি কখন করতেন ? তিনি সকালে ঘুম থেকে উঠেই বিছানায় নাস্তা করবার আগেই অনেক কাজ সেরে নিতেন। বিশেষ করে অর্থ সংক্রান্ত কাজগুলো তিনি সকালেই সারতেন, আর করতেন বাধাধরা দৈনন্দিন কাজগুলো। তিনি বেশ গোছালো ছিলেন বলেই তার কাজের সময়ে সাশ্রয় হত, হাতের কাছেই প্রয়োজনীয় কাগজপত্রগুলো পেতেন। চিঠিপত্র লেখাও বিছানায় সারতেন, অশব্য প্রথম মহাযুদ্ধের পর যখন টাইপিষ্ট ব্যবহার করতেন তখন অফিসেও চিঠি লিখেছেন। পরে যখন অনেক চিঠি লিখতে হয়েছে কাজে, অনুরোধে, প্রতিক্রিয়ায় তখন অবশ্য সেক্রেটারীকে ডিক্টেশন দিয়েছেন।

তিনি ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবের সাথে কথা বলতে অথবা ব্যবসার কাজ ছাড়া টেলিফোন ব্যবহার অপছন্দ করতেন এবং অচেনা অজানা লোকের টেলিফোনকে উৎপাত বলে মনে করতেন ।

মেনার্ড কেইন্স কাজ শুরু করেছিলেন ইণ্ডিয়া অফিসের সামরিক বিভাগে। তবে সে কাজে তার মন ছিল না এবং সময়ও তেমন লাগাতো না দৈনন্দিন কাজ শেষ করতে । সে সময়ই তিনি Probability-র উপরে তার গবেষণা সন্দর্ভ রচনায় নিরত হন । অবশ্য অবসরের এই সুযোগ শেষ হয়ে যায় রাজস্ব, পরিসংখ্যান ও বাণিজ্য বিভাগে বদলী হবার সাথে সাথে, এখানেই তিনি ভারতীয় মুদ্রা ও অর্থ ব্যবস্থা সম্পর্কে গভীর জ্ঞান লাভ করেন । এবং এ ব্যাপারে তার অনুসন্ধিৎসা কেম্ব্রিজে ফিরে গিয়েও বর্তমান ছিল । ১৯১১ সালে তিনি এই কাজের ফলশ্রুতি স্বরূপ Recent Development of the Indian Currency System শীর্ষক দীর্ঘ নিবন্ধ রয়াল ইকনমিক সোসাইটিতে পাঠ করেন এবং পরবর্তীতে এটিই তার Indian Currency and Finance বইতে রূপান্তরিত হয় ।

ভারতীয় মুদ্রা ব্যবস্থা তুলনামূলকভাবে জটিল ছিল এবং সময়ের অতিবাহনে এটি জটিলতর হয়ে উঠে । মেনার্ড কেইন্স-এর লেখা থেকে তার এ জটিল পদ্ধতির অনায়াস জ্ঞান ও বিশ্লেষণ পাঠককে আকৃষ্ট করে । সে আলোচনার কোন তথ্যের অবহেলা সেই । কোন বিষয়ের সহজীকরণ নেই, অথচ সমস্ত বিষয়টি বোধগম্য ও সহজপাঠ্য হিসেবে উপস্থিত হয়েছে; একারণেই তিনি ১৯১৩-১৪ সালে Royal Commission on Indian and Finance -এর কনিষ্ঠতম সদস্য হন । কমিশনের অন্যান্য সদস্যরা তার চেয়ে বয়োজেষ্ঠ্য ছিলেন, অনেকেই ব্যক্তি অথবা অর্থ সংক্রান্ত সংস্থায় কাজ করেছেন এবং বৃটিশ ভারতে দীর্ঘদিন অবস্থান করেছেন । তবুও কমিশননের সামনে উপস্থাপিত মতামত, স্বাক্ষ্য, আলোচনা এবং রিপোর্টের মুসাবিদা থেকে সহজেই অনুমেয় যে একমাত্র মেনার্ড কেইন্স এবং সম্ভবতঃ লাওনেল আব্রাহামস (ICS) ছাড়া আর কেউ জটীল মুদ্রা ব্যবস্থা ও তার ভারতীয় জটিলতা তেমন বুঝতে পারতেন না ।

মেনার্ড কেইন্স অতি সহজে বিভিন্ন বিষয়ের বিভিন্ন দিকের সামান্যতম বিষয়ও পর্যালোচনা করতে পারতেন । এ কারণে একমাসের মধ্যে মোটামুটি এককভাবে কাজ করে তিনি বৃটিশ ভারতের জন্য দীর্ঘ ৬০ পৃষ্ঠার একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরিকল্পনা তৈরী করেছিলেন । আলফ্রেড মার্শাল, যিনি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তখন একজন নন্দিত ব্যক্তিত্ব এবং মুদ্রাব্যবস্থা সম্পর্কে তারও গবেষণা প্রসূত লেখা ছিল, মেনার্ড কেইন্সের ভারতীয় মুদ্রা ব্যবস্থা সম্পর্কিত মতামত ও বিশ্লেষণ দেখে মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন তরুণ অর্থনীতিবিদেরা যদি এমন সুন্দর ও সহজভাবে অল্পপরিসরে জটিল ব্যাপার ব্যাখ্যা দিতে গ্রহণযোগ্য করে তুলে ধরতে পারে তবে বয়স্ক অর্থনীতিবিদদের বিদায় নেবার সময় প্রত্যাসন্ন হয়েছে । একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে একমাত্র মেনার্ড কেইন্সের প্রতিভাই রয়েল কমিশনের সদস্যদের অপরিচ্ছন্ন চিন্তাধারা ও পরস্পরবিরোধী মতামত থেকে ঐ রিপোর্টকে রক্ষা করেছিল । এটি তিনি করেছিলেন তার যুক্তি নির্ভর মনের সাহায্যে, যদিও তিনি কেবল কয়েকটি শব্দের পরিবর্তন করতেন মাত্র তবুও তারই মাধ্যমে তিনি নীতিগত পরিবর্তন ও সামঞ্জস্য সাধন করেছেন অতি সহজে । এখানে তার ইংরেজী ভাষাজ্ঞান যথার্থই সাহায্য করেছে ।

১৯১৫ সালে তিনি ট্রেজারীতে চাকুরী নিলেন, তখন বিভিন্ন বিষয়ের খুটিনাটি সম্পর্কিত জ্ঞান ও আগ্রহ তাকে প্রভূত সাহায্য করেছিল । ট্রেজারী তখন জনাকীর্ণ ছিল না, বিশেষজ্ঞ দিয়ে পরিচালিত । প্রতিদিন মেনার্ড কেইন্সকে নতুন তথ্য পরিচ্ছন্ন ভাবে বুঝতে হত এবং অনেক নতুন ব্যাপারে তাকে বিশ্লেষণ বা নির্দেশনামা লিখতে হত । ১৯১৬ সালের সেপ্টেম্বরে তার বাবাকে লেখা এক চিঠি থেকে জানা যায় যে, তিনি সে সপ্তাহে তিনটি বিশ্লেষণমূলক দলিল (memoranda) লিখেছেন যার একটি মন্ত্রী পর্যায়ে আলোচিত হয়েছে । এ ছাড়াও প্রায় একডজন কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মেমোরাণ্ডা লিখেছেন; এ ছাড়াও করেছেন বাজেটের কাজ, রুটিন কাজ এবং Economic Journal সম্পাদনার কাজ । একজন সাধারণ মানুষ এই তালিকা দেখে বিষয়ে শ্রদ্ধায় হতবাকই হতে পারে । মেনার্ড কেইন্সের পরে যারা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আমলে ট্রেজারীতে কাজ করেছেন তারা জানান কেইন্সের মেমোরাণ্ডা কেবলমাত্র একজন স্থায়ী যুগ্ম সচিবের নূন্যতম শাব্দিক পরিবর্তনের পর অর্থমন্ত্রীর কাছে সরাসরী উপস্থাপিত হয়েছে এবং অর্থ মন্ত্রীও বিশেষ কোন পরিবর্তন না করে এগুলোকেই সরকারী দলিলের মর্যদা দিয়েছেন । পয়ত্রিশ বছর বয়স্ক একজন মানুষের জন্য এ ছিল এক অকল্পনীয় মর্যাদা ।

মেনার্ড কেইন্স প্যারীস শান্তি আলোচনায় গিয়েছিলেন ট্রেজারীর পক্ষ থেকে প্রধান প্রতিনিধি হিসাবে, তিনি আলোচনা চলাকালেই মত পাথর্ক্যের জন্য পদত্যাগ করেন । ফলে তিনি সরকারী কর্মচারী না থেকে একজন বিদগ্ধ সমালোচকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন । এ ভূমিকায় যেমনি বেসরকারী লোকের স্বাধীনতা ছিল, তেমনি ছিল সরকারী পদ্ধতি ও চিন্তার অভ্যন্তরীণ জ্ঞান । প্রথম মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতা ও শান্তি আলোচনাকে নিয়েই তিনি The Economic Consequences of the Peace বইটি লেখেন । বইটি ছাপা হয়েছিল ১৯১১ সালের ১২ই ডিসেম্বরে এবং অতিদ্রুত বইটি বিক্রি হয়ে যায় । বইটিতে মেনার্ড কেইন্সের আন্তরিক অনুভূতি বিমূর্ত হয়ে উঠেছে, কিন্তু তথ্য বা বিশ্লেষণকে অস্বীকার করে নয় । তিনি এ বইতে মিত্রদেশের মধ্যকার ঋণ মওকুফ ও ইউরোপের পূণনির্মাণ সম্পর্কে স্পষ্ট বক্তব্য রাখেন । তার মত লয়েড জর্জ সমর্থন করেছিলেন কিন্তু প্রেসিডেন্ট উইলসন তা প্রত্যাখ্যান করেন । তিনি জার্মানীর ক্ষতিপূরণ দেয়ার ক্ষমতা সম্পর্কেও তব্যবহুল আলোচনা করেন যার ফলে পোলিশ সরকার ক্ষুব্ধ হন ।

ট্রেজারীর অভিজ্ঞতা এবং প্যারিস আলোচনা মেনার্ড কেইন্সের ভূমিকায় গুণগত প্রভাব ফেলে । মেনার্ড কেইনন্স পরবর্তী জীবনে তাত্ত্বিক অর্থনীতিবিদ হয়েও, রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক প্রশ্ন ও নীতিমালার প্রতি আকৃষ্ট হন । তিনি এক অর্থে সাংবাদিক ও প্রচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন এবং একই সাথে সংবাদপত্র ও একাডেমিক পত্রিকায় নিবন্ধের পর নিবন্ধ লিখে মানবিকতা, নমনীয়তা, যুক্তি নির্ভরতাকে তুলে ধরেছেন । মেনার্ড কেইন্সের পত্রাবলী থেকে দেখা যায় তার লেখার কারণে প্রথম মহাযুদ্ধের পরে ভার্সাই চুক্তির ফলশ্রুতিতে যে সমস্ত আন্তর্জাতিক মতদ্বৈধতা দেখা দিয়েছিল বৃটিশ সরকার সে সমস্ত ব্যাপারে পরিশেষে অনেক নমনীয় মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন । এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে ১৯২২ সালে তারই সম্পাদনায় Manchester Guardian পত্রিকা Reconstruction of Europe শিরনামে ১২টি খণ্ডে ৭৮২ পৃষ্ঠায় সে

সময়কার বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ সমস্যা ও সমাধান সম্পর্কে খোলামনে আলোচনা প্রকাশ করেন । তিনি এ ব্যাপারে যে সমস্ত মনীষার মতামত একত্রিত করেছিলেন তার মধ্যে ছিলেন গোর্কি, ক্রোচে, কার্ল মেলকিওর, এসকুইথ, লর্ড সেসিল প্রমুখ। তিনি এই বিশাল প্রকাশনার সমস্ত বিষয়ে গভীর আগ্রহ সহকারে সময় দিয়েছেন । তিনি নিজে ১৪টি নিবন্ধ লিখেছিলেন । যদিও বৃটিশ সরকার তার মতামতকে উগ্রপন্থী মনে করেছিলেন তবুও বৈদেশিক মুদ্রায় আগাম বাজার সম্পর্কে তার সুপারিশকে বৃটিশ সরকারের পক্ষ থেকে জেনোয়া সম্মেলনে উত্থাপন করা হয়েছিল ।

যখন মেনার্ড কেইন্স এমন ব্যস্ত, Nation পত্রিকার জন্য প্রতি সপ্তাহে লিখছেন, তখনই তিনি তার অর্থনীতির তাত্বিক বইগুলোও রচনা করেছেন । ম্যানচেষ্টার গার্ডিয়ানের জন্য লিখতে লিখতে রচনা করেছেন A Tract on Monetory Roform. আর এ সময় কেম্ব্রিজে পড়াতে পড়াতে A Treatise on Money এবং The General Theory of Employment, Interest and Money লিখেছেন । এখানে তাড়া নেই, এখানে তাত্ত্বিক নিরীক্ষা অনেক গভীর, এখানে যুক্তির আবহ অনেক উৎকীর্ণ । তাই পড়িয়েছেন, আলোচনা করেছেন, তর্কে নেমেছেন, যুক্তি খুঁজেছেনে । তার সহায়ক ছিলেন একদল তরুন ছাত্র আর শিক্ষক । এ বই দুটি লিখতে প্রচুর সময় লেগেছে । Treatise লিখেছেন ছ'বছর ধরে, ১৯২৪ থেকে ৩০ । লেখার সময় ও লেখার শেষে পিয়েরো শ্রাফা, রিচার্ড কান, জেনস মিড, জোন রবিনশন ও অষ্টিন রবিনশন মেনার্ড কেইন্সের সাথে আলোচনায় নিরত হয়েছেন । এরা সবাই পরে স্বনাম খ্যাত অর্থনীতিবীদ ও অর্থনীতির শিক্ষক হয়েছেন । Treatise বেরুবার পর ঐ বইটিই একটি কোর্সে কেইন্স পড়িয়েছেন । কেইন্স নিজে Treatise নিয়ে তুষ্ট ছিলেন না, শেষ হয়েও যেন শেষ হল না এমন একটা অসন্তষ্টিতে তিনি ভুগছিলেন । এই আলোচনা ও অসন্তষ্টি থেকেই উদ্ভূত হয় General Theory. তখন থেকেই মেনার্ড কেইন্স General Thoery-র উপর কাজ শুরু করেছেন, মানসিক প্রস্তুতি নিয়েছেন, যুক্তি নির্ভরতা খুঁজেছেন; এবং আগে যে বিশ্লেষণ করেছেন তার উন্নয়ন সন্ধান করেছেন । ১৯৩৪ সালেই তিনি তার লেখা প্রাথমিকভাবে শেষ করে General Theory পড়াতে শুরু করেন । তার সে লেখার উপরে যারা ক্রমাগত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছিলেন তারা হলেন রিচার্ড কান, জোন রবিনশন, রয় হ্যারড ও র‍্যালফ হটরে । ফলে General Theory -র বেশ পরিবর্তন সাধিত হয় । (এ সম্পর্কে উল্লেখ্য যে ডেনিস রবার্টশন General Theory-র মতাদর্শকে সমর্থন করেননি ।)

মেনার্ড কেইন্সের বিশাল ব্যক্তিত্বের মধ্যে যৌবনের তাৎক্ষণিককতা যথেষ্ট পরিমাণে ছিল, ছিল সংবেদনশীল হৃদয়ের মহানুভবতা । সমাজের অসুবিধাগ্রস্থদের প্রতি তার একটা তাত্ত্বিক টান ছিল । তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ছাত্রদের জন্য সংখ্যা নির্ধারণের বিরোধীতা করেছেন, মেয়েদের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার এবং অন্যত্র সমানধিকারের সমর্থক ছিলেন, তিনি যুদ্ধবিরোধী বিবেকের তাড়নায় যারা সৈনিক হতে অস্বীকার করেছে তাদের পক্ষ নিয়ে সোচ্চার হয়েছিলেন এই বলে যে, সামরিক কার্যে নিয়োজিত হওয়ার মত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে নিজের মতামতের স্বাধীনতা বিলিয়ে দিতে তিনি রাজী নন ।

তিনি কখনই তার মতামত ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারকে খর্ব হতে দেননি । সে কারণেই তিনি নাটকীয়ভাবে আদর্শগত কারণে প্যারীস শান্তি সম্মেলন থেকে ট্রেজারীর প্রধান প্রতিনিধির পদ থেকে পদত্যাগ করেছিলেন । তিনি যথার্থ ও ন্যায়সংগত সমাধান খুঁজেছিলেন,পরাজিত শক্তিকে দোহন করে বিজয়ী শক্তিকে আর্থিক সমস্যার সমাধান তার কাম্য ছিল না । তিনি ডক্টর মেলকিওর-এর কাছ থেকে জার্মানীর প্রকৃত অর্থনৈতিক অবস্থা ও শক্তি বুঝবার চেষ্টা করেছেন অত্যন্ত আগ্রহ ও সহানুভূতির সাথে।

মেনার্ড কেইন্স এক অর্থে সুবিধাবাদী ছিলেন, তিনি সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পিছ পা হননি এবং শুরুতে পিতৃ-মাতৃ সম্পর্কে পরিচিত উচ্চ পদস্থদের ব্যবহার করেছেন বলে অভিযোগও রয়েছে (যেমন অষ্টিন চেম্বারলীন বা এশকুইথ)। ট্রেজারীতে তার নিরলস কর্ম একদিকে তার নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে অন্যদিকে তার মতামতকে প্রতিষ্ঠা করতে সুযোগ করে দিয়েছে এবং তিনি একাজ অত্যন্ত সজ্ঞানতার সাথে সুযোগ্যতার ভিত্তিতে সদম্ভে করেছেন বলে অনেকের বিশ্বাস। তার প্রাথমিক সাফল্য তাকে দর্পী করে তুলেছিল । তিনি চটপট কাজ করতেন । তিনি অশান্ত এবং অসহনশীলও হতে পারতেন । যেহেতু তিনি অতি সহজে অনেক জটিল ব্যাপার হৃদয়ংগম করতে পারতেন, সেহেতু যারা ধীরে কাজ করে তাদের প্রতি তার সহানুভূতি ছিল কম । তার এই বুদ্ধিমত্তা ও অসহনশীলতা তাকে এক রকম বিচ্ছিন্নতা এনে দিয়েছিল । কেম্ব্রিজ-লণ্ডন-সাসেক্স ছিল তার পৃথিবী । ভারতীয় মুদ্রা ব্যবস্থায় তার আগ্রহ ও জ্ঞান থাকা সত্বেও তিনি ভারতবর্ষে যেতে অস্বীকার করে কমিশন থেকে পদত্যাগ করেন । যদিও ছুটি কাটাতে বিত্তশালী বৃটিশদের মত ইউরোপ এমনকি মরোক্কো ও মিশরে তিনি গিয়েছিলেন । তবুও কাজের জন্য কেম্ব্রিজ-লণ্ডন-সাসেক্স-এর বাইরে যেতে চাননি । কেবল মাত্র জীবনের শেষ প্রান্তে এসে দীর্ঘদিন আমেরিকায় তাকে কাটাতে হয়েছে যুদ্ধবিধ্বস্ত পৃথিবীতে নতুন আন্তর্জাতিক মুদ্রা ব্যবস্থার সন্ধানে । তার বিচ্ছিন্নতার আরেকটি দিক ছিল তার উচ্চবিত্তের জীবন ধারা । তিনি শ্রমিক শ্রেণীর জীবনের মান উন্নীত করতে চেয়েছেন কিন্তু শ্রমিক শ্রেণীর জীবন সম্পর্কে তার কোন পরিচ্ছন্ন ধারণাই ছিল না ।

কেইন্সের রচনাশৈলী

এটা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, অর্থনীতিবিদের লেখা কি রচনাশৈলীর কারণে বিচার্য; অবশ্য একথা শাস্ত্র নির্বিশেষে বলা হয়ে থাকে যে, রুচীই মানুষের পরিচয় আর রচনাশৈলী রুচীর পরিচায়ক । কেইন্স সম্পর্কে একথা অত্যন্ত জোর দিয়ে বলা যায় যে, লেখার মাঝের তার মৌল মনোভংগি, তার বৈশিষ্ট্য ও তার স্বভাব পরিস্ফুট হয়ে ধরা পড়েছে ।

অর্থনীতি শাস্ত্রে অপরিচ্ছন্ন, অসুন্দর এবং সাধারণ লেখার কমতি নেই । বেশীর ভাগ অর্থনীতিবিদদের লেখাই সহজপাঠ্য নয় এবং সেগুলোতে কাঙ্খিত সাবশীলতা থাকে না । কেইন্সের সব লেখাও এক পর্যায়ের নয় । তবুও The Economic Consequences of the Peace কিংবা Eassys in Persuation অথবা Eassys in Biography আকর্ষণীয় পাঠ । তার মৃত্যুর পরে প্রকাশিত তার জীবন স্মৃতি (Two Memoirs) সাহিত্যিক কেইন্সের অপূর্ব পরিচয় বহন করে । অবশ্য স্মরণ রাখতে হবে এ বইগুলো

কেইন্স সাধারণ পাঠকের জন্য লিখেছিলেন এবং অনেক লেখার মধ্য থেকে বাছাই করে গ্রন্থিত করেছেন । এখন অনেকেরই মনে পড়বে না যে, কেইন্স তিন শতাধিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন এবং এর অনেকগুলোই সাধারণ পাঠকের জন্য পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল ।

রচনাশৈলীর আলোচনায়, একথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, তিনি সাংবাদিকতা ও সম্পাদনায় দক্ষ ও নিবেদিত ছিলেন । তিনি বর্তমানের জন্য লিখেছেন, বর্তমান সমস্যা নিয়ে লিখেছেন, অনেক সময় তাৎক্ষণিক সমাধান বা পরিকল্পনা তুলে ধরেছেন । কেইন্স দ্রুত লিখতেন, তার দুর্বোধ্য হাতের লেখায় কমই কাটাকাটি বা পরিবর্তন করতেন; যখন তিনি আবেগে নিন্দামন্দ করতেন, তখনই কেবল তার লেখায় পরিবর্তন তিনি করেছেন । তিনি পরিশ্রমী ছিলেন এবং লেখা তার সহজেই আসত; নিজেকে লেখায় প্রকাশ করতে তার অসুবিধা ছিল না । পরিচ্ছন্ন ঝরঝরে চিন্তা তার লেখাকেও পরিচ্ছন্নতা দান করেছিল । তার লেখার আরেকটি দিক ছিল তার চিন্তার ক্রমাগত বিকাশ এবং তার চিন্তার অভিযোজন । কেইন্স ছিলেন যোদ্ধা, তিনি তার মতবাদকে যুক্তির সাথে সজোরে উত্থাপন করতেন । তিনি প্রচারকও ছিলেন সে অর্থে আর তার শিক্ষকতার রেশ তার লেখায়ও গিয়ে পড়েছে । তার নীতিবোধজাত ঘৃণা ও সংস্কারের উৎসাহ যেমনি তাকে সাংবাদিক করেছে তেমনি তার পারদর্শিতা তাকে লেখার নিয়ত রেখেছে । তিনি তাকে এমন এক বুদ্ধিজীবী মনে করতেন যার কাজ হচ্ছে উদ্বুদ্ধ করা, কাঙ্খিত কর্মে প্ররোচিত করা । তিনি ছিলেন স্বভাব সম্মোহনকারী, এমনকি প্রলুব্ধকারী । তিনি শব্দের ইন্দ্রজাল রচনা করতে পারতেন, আর শব্দগুলো যুক্তির সূত্রে গ্রন্থিত হয়ে কখন আবেগ কখন অনুভূতি সহজে গ্রহণীয় করে উপস্থাপিত করত । শব্দই ছিল তার বীনা, আর শিল্পীর মত তিনি তার ব্যবহার করেছেন । সেজন্য তার লেখা সজ্ঞান আর শব্দের ব্যবহার তার শক্তি ও নৈপুণ্যের পরিচায়ক । তিনি শব্দের সঠিক অর্থ জানতেন আর শব্দের ব্যবহারেই তিনি তার রসবোধ, কল্পনা এমনকি যুক্তির ঝোক সুন্দর করে তুলে ধরতেন ।

নৈপুণ্য এসে ছিল কালক্রমে কিন্তু সজ্ঞানতা তার চিরকালের সম্পদ । সিভিল সার্ভিসে কাজ করবার সময় তিনি যে মেমোরাণ্ডা তৈরী করতেন তাতে বিবেচনাগুলো কিভাবে বিন্যস্ত করা ভাল সে সম্পর্কে তিনি ভাল প্রশিক্ষণ পেয়েছিলেন, এজন্য বিপক্ষের যুক্তি খণ্ডন এবং নিজের যুক্তির আলোচনা সহজ যুক্তিযুক্ত ও সাধারণ জ্ঞানের মতই মনে হয় । সাধারণের জন্য লেখায় জটিল কোন বিষয় তুলে ধরতে হলে কেইন্স পরিচিত রূপকের সাহায্যে নিয়েছেন । কেইন্সের লেখার ধরন অনেক সময় পাঠকের সাথে কথপোকপনের মত ছিল, প্রশ্ন করা ও তার উত্তর খুঁজে বের করা এবং এমন একটা আলাপ চারিতায় সেটা পূর্ণ হত যে অনেক সময় মনেই থাকে না যে, এটা একপক্ষীয় কথাবার্তা ।

তার লেখায় অনেক সময় ভার্জিনিয়া উলফ (যিনি ব্লুমসবেরী ক্লাবের সদস্য ছিলেন) এর মত এক লাইনে একজন জীবন্ত মানুষের চারিত্রকে চিত্রন করতে পারতেন । লয়েড জর্জ ও উড্রু উইলনের চরিত্র স্মরণ করা যেতে পারে । এমনকি আলফ্রেড মার্শাল সম্পর্কে তার স্মৃতিকথাও স্মরণীয় । তার কল্পনাও অনেক সময় বল্গাহীন হতে

পারত । যেমন রাশিয়ার কম্যুনিষ্টদের তিনি আটিল্লার নেতৃত্বে প্রথম যুগের খৃস্টান বলে বর্ণনা করেছিলেন । তার মৌলিক রসালাপ অনেক সময় বিদ্রূপের মত শোনাত । অসম্ভবের জ্ঞান তাকে ব্যংগ সম্পর্কে সচেতনতা দিয়েছিল আর তার লেখায় এই ব্যাংগ কায়িক রূপ পরিগ্রহ করত (যেমন আমেরিকানরা বিশ্বের স্বর্ণসম্ভারে হোচট খেয়ে পড়ে আকাশমুখী স্বর্ণবাছুর তৈরী করছে)। স্তুতিচ্ছলে নিন্দাও তার লেখায় প্রচুর পাওয়া যায় । (যেমন তিনি বলেছেন ইউরোপীয় অধমর্নের ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা আমেরিকানরা সদয়ভাবে গ্রহণ করে তাদেরকে ক্ষমা দিয়ে অভিভূত করে দেয়)।

কেইন্সের সংবাদপত্রের জন্য প্রথম লেখাগুলো অত্যন্ত কার্যকর, বাহুল্যবর্জিত ও স্তিতধী । তবে পরবর্তীকালে তার লেখায় দ্রুততাজনিত অসাবধানতা, কিছু অতিরঞ্জন, কিছু আনাড়িসুলভ শৈলী পরিলক্ষিত হয়েছে ।' কিন্তু তার লেখার পরিমাণ লক্ষ্য করলে, এটা অবশ্য তেমন উল্লেখ্য নয় ।

তার লেখার উপস্থাপনায় দু'টি জিনিসের সংমিশ্রণ ছিল । প্রথমেই তিনি উদ্‌ঘাটিত গোপন তথ্যের সংক্ষিপ্ত সার দিতেন যেখানে অমংগলের পূর্ব সূচনা চিহ্নিত হয়েছে এবং ভবিষ্যৎ বাণীও লিপিবদ্ধ হয়েছে, এর পরে থাকত ইতিহাসের আলোচনা যেটি তার অন্তর্দৃষ্টিতে উজ্জল হয়ে উঠত । দ্বিতীয় যে জিনিস তিনি তুলে ধরতেন সেটি একপ্রস্ত পরিসংখ্যান, সহজে যাদের বিশ্বাস হয় না তাদের জন্য । এই দুই জিনিসের মিশ্রণ কেবল যে কার্যকরী ছিল তা নয় বরং সেটা আকর্ষণীয়ও ছিল ।

এতসব সত্ত্বেও কেইন্স অনেক অর্থনীতিবিদদের হতবুদ্ধি করেছেন তার রচনা দিয়ে । শব্দের নতুন যোজনায়; কোন কোন অর্থনীতিবিদকে তিনি হতবাক ও হতদৃষ্টিও করে ফেলেছেন । এজন্য এ.সি. পিগু তার বিরুদ্ধে সহমতের চাইতে ভিন্ন মতকে তুলে ধরে কুজ্ঝটিকা সৃষ্টির অভিযোগ এনেছেন । কেউ বা বলেছেন তিনি কেবল শব্দাধুনীক মাত্র । তবুও একথা সত্য যে, জন মেনার্ড কেইন্স তার লেখায় নতুন তত্ত্বের স্বচ্ছ যোজনা করেছেন আর পুরাতন তত্ত্বের যৌক্তিক বিশ্লেষণ তুলে ধরেছেন ।

ECONOMIC AND MANAGEMENT PROBLEMS OF DEVELOPMENT BANKING

Central Banking, Monetary Management and Related Issues with Special Reference to Bangladesh Experience

A. M. A. RAHIM*
MOHAMMAD SOHRAB UDDIN**

1. Introduction

This paper is an attempt to discuss some of the issues of the central banks in monetary management and economic development with special reference to Bangladesh experience, in policy measures. It is written from the perspective of our experience of dealing with central banking problems for a number of years. We have, therefore, placed emphasis on the practical problems and the key policy issues that the central bankers are often confronted with in actual situation.

The functions of central bank are carried out within the framework of a nation's overall economic policy objectives, the most important of which are (a) sustained economic growth, (b) reasonable price stability and (c) a stable balance of payments position. Central banks are required to pursue policies in a manner which helps attain the above policy objectives. However, simultaneous attainment of all the above objectives is not an easy task since the policy goals are often in conflict with each other. Policy pursued to achieve price stability and an improved balance

---

* Secretary to the Government of the Peoples' Republic of Bangladesh.
** General Manager, Bangladesh Bank.

The views expressed in the paper are the authors' own and do not, in any way, reflect the views of the institutions for which they work.

of payments situation may slow down the economic growth. Therefore, while formulating monetary policy, efforts are made to maintain proper balance between these objectives. Since the central bank of a country, in general, regulates the financial system of the country, it is the responsibility of the central bank to formulate and implement monetary policy in line with the overall economic policies pursued by the Government. Though the central bank's major responsibilities are to frame the monetary policy, in practice, the authority exercised by central banks in the discharge of responsibilities differ from country to country. In general, the central banks are expected to carry out their duties in consultation with the relevant government agencies.

The formulation of an appropriate monetary policy and the execution thereof are very difficult task. The monetary authorities have to face great difficulties in framing a sound policy and its maintenance in the light of the changed economic environment. In order to formulate a sound and effective monetary policy information on all the sectors of the domestic economy and a short-term projection of future developments both at home and abroad is required. In most of the developing countries there is a lack of reliable data, and moreover most of the data become available with a time lag. The authorities, therefore, have to work with limited information and often with un-reliable data. They also face the problem of lack of coordination in economic policies pursued by various government departments in different areas. If there is a lack of proper coordination in various policies affecting the country's economy, best results from policy actions taken by the monetary authorities cannot be expected to be achieved. It is also important to have detailed information on the current state of international economic condition and the direction towards which it is moving since changes in international economic environment affect, in several ways, the domestic economic conditions which may necessitate initiation of domestic policy changes to correct the effects of external factors.

The main objectives of monetary policy in Bangladesh are laid down in Bangladesh Bank Order 1972. In accordance with this order, Bangladesh Bank has been entrusted with the responsibility of regulating the issue of currency and the keeping of reserves and managing the currency and credit system of Bangladesh with a view to stabilising domestic monetary value, preserving par value of Bangladesh Taka, promoting and maintaining a high level of production, employment and real income in Bangladesh, and fostering growth and development of the country's productive resources in the best national interest. However, with the passage of time, Bangladesh Bank's responsibility has gone beyond what is indicated in the Bangladesh Bank's Order. The Bank is now required to pursue policy in line with the

declared policies and programmes of the Government. While formulating the monetary and credit policy due attention is also paid to regional balance and social justice.

The plan of the rest of the paper is as follows. In Section II we discuss the issues of monetary management in Bangladesh with particular reference to the instruments of control. In Section III we discuss the role of central Bank in relation to the government and in the light of central bank autonomy in over-all development and monetary management. The central bank's efforts to mobilise rural savings and finance its priority sectors are also discussed very briefly in this section.

II. Monetary Management

Definition of Money Supply

Traditionally, money has been defined as the sum of currency with public and that portion of deposits held by the public with banks which can be withdrawn on demand. In the economic literature this money is referred to as narrow money and is abbreviated as M_1. Money in broad sense is defined as the sum of currency with the public plus all deposits held by the public with banks irrespective of whether these deposits are withdrawable on demand or not. This money is referred to as broad money and is abbreviated in Bangladesh, in line with the practice of International Monetary Fund (IMF), as M_2. The question then arises which definition of money should be adopted for the purpose of monetary policy. Theoretically, one should use that definition of money which gives a predictable and stable demand function for money. The estimated demand function for money enables the policy makers to determine what should be the quantum of increase in money supply in a period given the expected increase in real output and tolerable rate of inflation.

In Bangladesh, the broader concept of money supply is used for the purpose of formulation of monetary policy. The decision to use broad money (M_2) for monetary and credit policy is, however, not based on the statistical properties of the demand function for money, but perhaps based on the ground that control of broad mcney by the monetary authorities is much simpler. There may be other consideration as well. We shall revert to the subject later.

Safe Limit to Monetary Expansion.

The basic framework of monetary policy in Bangladesh is to fix a target level of broad money which is defined to include, as mentioned earlier, currency held with the public, demand and time deposits. Various credit control and support measures are taken by the monetary authorities to

contain monetary expansion within the target level and allocate credit to various sectors in such a way as to ensure deployment of scarce bank credit in the best possible manner for increasing production, employment and real income. The safe limit for monetary expansion is calculated on the basis of estimated growth rate of real G.D.P., acceptable rate of inflation, and growth in income velocity of money. The income version of the transaction equation in the form of the rates of growth is the underlying theoretical framework for calculation of target level of money supply. It says that the sum of rate of growth of broad money and the rate of change of income velocity of money is equal to sum of the growth of the real income and the rate of inflation. Given the expected growth in real income, the acceptable limit of price change, and the expected change in income velocity of money, the safe limit for monetary expansion is derived. However, the factors such as rate of monetisation and substantial amount of excess liquidity in the previous years are sometimes taken into consideration for projection of monetary expansion. The safe limit for monetary expansion calculated by the monetary authorities on the basis of expected growth rate of real GDP and rate of inflation is given in Table-I. It can be seen from the statistics given in Table-I that all the years 1980-81 through 1983-84 expected change in income velocity of money has been assumed to be zero. The rate of monetisation of the non-monetised sector or the lagged effect of money supply has also not been taken into account.

Table-1

G.D.P. Price and Broad Money

Period	Expected GDP Growth Rate	Expected Rate of Inflation	Estimiate of Safe Limit of Broad Money Expansion	Actual Mone tory Expansion
1980-81	7.1	5.0	12.1	27.5
1981-82	7.0	10.0	17.0	10.0
1982-83	6.0	13.0	19.0	29.7
1983-84	6.7	12.0	18.7	42.2
1984-85	5.5	12.0	16.5	25.6

Source : Bangladesh Bank

Note : For detailed data see appendix table of Bank Porikrama vol XII, P.100 and Economic Trends, Bangladesh Bank.

Given the estimated growth rate in real G.D.P. and acceptable rate of inflation, the calculation of safe limit for monetary expansion depends crucially on two parameters viz. rate of monetisation and change in the income velocity of money. Unless these parameters are estimated precisely and taken into account. the calculation of safe limit for monetary expansion will not be accurate. While drawing up annual monetary and credit programme, the monetary authorities in Bangladesh make certain assumptions about the rate of monetisation and the expected changed in the income velocity of money, but these assumptions, as far as we are aware, are not made on the basis of any empirical study. Empirical studies for estimation of these parameters may be undertaken by the appropriate authority and the estimated values of these parameters may be taken into consideration for monetary projections every year.

The formulation of monetary programmes in the quantity theory framework assumes implicitly that real income is exogenous, that is, real income remains un-influenced by changes in money. It may be noted that money creation, given the same level of net foreign assets, is simultaneously accompanied by credit creation. To the extent that the increase in credit increases output, the impact of monetary expansion on prices is neutralised. In Bangladesh, monetary expansion, if accompanied by an increase in domestic credit, has both demand and supply side effects. The increase in money supply increases consumers demands for goods and services which in turn increases prices almost proportionately in the short run, but the resultant increase in price tends to induce the producers to produce more goods and services, and the increased output reduces the price. In the long run there will be higher price and an increase in output, but the increase in output will not be as much as in developed countries, because of the structural rigidities of the Bangladesh economy.

Expansion of credit has, both demand and supply side effects. Monetary expansion occured as a result of extension of credit increases the demand for goods and services and thus prices, but if the credit is extended to such sectors where there is a considerable scope for increase in production and where production is constrained due to inadequate cash resources, the credit expansion increases the volume of production directly. Therefore, monetary expansion, if resulted from credit expansion, increases the level of output through both demand and supply side effects. However, whether there will be any change in price, and if so, to what extent, depends on the relative strengths of the two effects. If the demand side effect is higher than the supply side effect, the resultant price will be higher. On the other hand, the price will be lower if supply side effect is higher than the demand side effect. The nature of

inter-action between money, output and prices is, therefore, very complex. The problem may be tackled through a framework of a macro model focusing on the relation between output and credit, and also between prices, and output and money. Therefore, while determining the target level of monetary agregate, the above factors may also be taken into account.

Instruments of Monetary Policy

The main policy instruments available to the central banks to effect the desired change in monetary aggregates are discount rate, open market operations, variable reserve requirements, statutory luquidity requirement, quantitative and selective credit controls and moral suasion. However, all policy instruments are not equally important. The order of importance depends on the characteristics of the economy in general, and the degree of development of money and capital markets in particular.

The central banks through the change in the discount rate, the rate at which the commercial banks borrow from the central banks to supplement their resources against eligible papers/securities, influence the size of lending operations of the banks. For example, change in bank rate increases/decreases the cost of borrowing of commercial banks from the central bank and thus discourage/encourage the banks to borrow from the central bank. However, in many developing countries the central bank provides credit to commercial banks at rates below the bank rate to finance selected sectors.

Open market operations refers to sale and purchase of securities by the central banks in the open market to effect desired changes in the monetary aggregates. Purchase of securities from the public by the central bank increases the level of money stocks; the magnitude of increase depends on, among other factors, the mode of financing. If the purches is financed through adjustment of existing assets portfolio of the central bank without increasing the amount of reserve money, the magnitude of the increase will be less than if the purchase is financed through creation of additional reserve money. If the securities held by the central bank are sold to the public, the level of money stock is immediately reduced. The open market operation, therefore, is a useful tool to control the monetary aggregate. However, the success and appropriateness of this tool depend on the degree of development of securities market. Apart from the control of monetary aggregate, the open market operations are conducted in many countries on other consideration as well. We shall discuss these and other related issues later.

Commercial banks are required to keep a certain percentage of their deposit liabilities in the form of balances with the central bank as reserve requirements. The central bank exercises a direct influence on the credit creating capacity of commercial banks through variations in the reserve requirements. Increase in reserve requirements reduces the excess reserves of the commercial banks which in turn reduces the credit creating capacity of the commercial banks. On the other hand, decrease in reserve requirements increases their credit creating capacity. In many countries, banks are also required to keep a certain percentage of their deposit liabilities in the form of specifically prescribed liquid assets. This requirement is known as the statutory liquidity requirement. The central banks change this requirement from time to time to bring about desired change in credit.

In many countries, particularly in developing countries, the central banks impose quantitative ceilings on total bank credit as and when needed. This direct control on credit enables the central banks to control the money stock more effectively. The central banks can also direct the commercial banks to extend credit or prohibit the extension of credit to certain sectors. The central banks in many developing countries also set different margin requirements and different interest rates for different types of loans. Apart from quantitative and selective credit control, moral suasion is also used to influence the credit operation of the banks in line with the overall monetary policy framed by the monetary authorities.

The policy instruments described above briefly are generally used by the monetary authorities to bring about the desired change in the monetary aggregates. However, which policy instruments would be more relevant than the others depend on the economic characteristics and institutional set up of the country concerned. In Bangladesh, cash reserve requirements (CRR), statutory liquidity requirement (SLR), Bank rate and open market operations (OMO) are seldom used as policy instruments. The monetary authorities place more emphasis on quantitative and selective credit controls. Variation of interests on bank deposits and bank lending is made from time to time in conjunction with quantitative and selective credit controls. The rationale and appropriateness of this policy will be discussed later.

Control of Money Supply Through Control of Reserve Money

Reserve money which is commonly reffered to in the literature as a monetary base or high powered money represents certain liabilities of the central bank including its currency liabilities and the currency liabilities of the government. In Bangladesh, reserve money comprises total currency held by the public, cash with scheduled banks and deposits of

all banks with Bangladesh Bank. These liabilities are matched by the assets of the central bank. The sources of change in monetary base are changes in (i) net foreign assets held by Bangladesh Bank, (ii) claims on government (net) by Bangladesh Bank, (iii) credit to scheduled banks by Bangladesh Bank, and (iv) other assets (net) of Bangladesh Bank. The ability of Bangladesh Bank to control monetary base, therefore, depends on its ability to control these four sources. Credit to scheduled banks by Bangladesh Bank and other assets (net) of Bangladesh Bank are amenable to control by Bangladesh Bank. To the extent that there is a proper coordination between fiscal and monetary policy, control of Bangladesh Bank's credit to the Government is not difficult. The difficulty arises only in the case of foreign sector. Bangladesh Bank has no control over the foreign sector. Changes in net foreign assets depend on a host of exogenous factors. The most desirable thing in this case would be to make realistic projection of balance of payments position. To the extent that actual changes in net foreign assests diverge from the projected changes, the Bank should be able to make adjustments in other sources to offset the errors so that in the end the desired change in the monetary base can be attained. In practice, however, it is very difficult to effect such changes within a short notice. Nevertheless, Bangladesh should have some control over the monetary base.

Money supply, as mentioned earlier, not only depends on the monetary base but also on the money multiplier. Even if the central bank can control the monetary base, its ability to control money supply depends on its ability to predict the value of the money multiplier. It may be noted that setting reserve requirements of commercial banks is within the purview of the central bank, other elements of the monetary multiplier such as excess reserves of the banks and the currency ratio depend on the behaviour of the banks and the public respectively, and therefore their control does not lie within the powers of the central bank. The central bank can, however, influence the behaviour of the commercial banks and the public through appropriate policy measures. For example, an increase in lending rate induces the commercial banks to decrease the excess reserves, and an increase in interest rate on deposits encourages the public to decrease their currency holdings relative to deposits. In both the events, the value of the money multiplier increases. However, it is not an easy task to make precise estimate of the effects of these policy measures on the behaviour of commercial banks and the public, Bangladesh Bank does not normally control money supply through control of monetary base and the money multiplier. It takes recourse to other mechanism. But this is not to say that it is not necessary to control the monetary base or to effect change in the value of the money multiplier for control of money supply. In fact, it is our view

that whatever mechanism a central bank adopts to effect desired change in money supply, required regulation of monetary base and money multiplier may also be adopted simultaneously.

Monetary Control through Control of Net Domestic Assets of the Banking System.

Monetary control can be achieved through the control of net domestic assets of the banking system. The sum of net domestic assets and net foreign assets of the banking system is identically equal to broad money (M_2). Therefore, given the change in net foreign assets, the desired change in broad money can be brought about through change in net domestic assets. The net domestic assets can be decomposed into domestic credit of the banking system and other assets (net) of the banking system. Domestic credit includes credit to the government, other public sector and private sector. The control of net domestic assets, therefore, involves the control of credit to the government, public sector, the private sector and also the control of other assets of the baking system.

As mentioned earlier, the safe limit for monetary expansion in Bangladesh is derived using the quantity theory framework. Given the base year level of money supply and the safe limit for monetary expansion, the target level of money supply is derived. After the target level is estimated, the level of net foreign assets and other assets (net) of the banking system are projected to estimate permissible expansion in domestic credit in a given period. Control of money supply in this framework, therefore, depends on, among other things, the monetary authorities' ability to make realistic projections of the change in net foreign assets and also the change in other net assets of the banking system. Even if the monetary authorities are able to control the bank credit, the ability to control broad money supply depends on the accuracy of the projection of these assets.

The monetary authorities in Bangladesh fix credit ceilings for the government, other public sector and the private sector within the framework of overall expansion in credit. The overall and sectoral credit programmes are made on annual basis, but quarterly phasing of the credit programmes is made by taking into consideration the influence of seasonal factors. After the quarterly credit ceilings are drawn, credit ceiling for each bank is made on the basis of their share in outstanding credit at the end of the preceding quarter.

We may now discuss the rationale of targetting broad money (M_2) rather than narrow money (M_1). It is easier for Bangladesh Bank to control broad money since given the projected level of net foreign assets and other assets (net) of the banking system, Bangladesh Bank can keep

the broad monetary expansion within the desired limit by fixing up the credit ceiling for each bank and persuade them to adhere to the ceiling accordingly. In order to control narrow money (M_1), it is necessary for Bangladesh Bank to apply other instruments. Since the precise estimate of the effects of policy instruments on narrow money is very difficult, it is easier to control broad money through the direct control of domestic credit which is within the purview of Bangladesh Bank because, other things remaining un-changed, there is one to one correspondence between domestic credit and broad money stock. There may have other considerations as well. First, though there has not been any dependable empirical study on the money demand function and its statistical properties, empirical studies using data of developing countries showed that predictability and stability of demand function for broad money is better than that for narrow money. Secondly, broad money, as mentioned earlier, is the sum of narrow money and time deposits. Time deposits includes fixed deposits of all terms and a substantial portion of savings deposits. In Bangladesh, the portion of savings deposits which is treated as time deposits is also withdrawn by the the depositors as and when monetary stringency occurs, Fixed deposits can be withdrawn on penalty, and moreover loans can be taken from the banks against the collateral of fixed deposits. Inclusion of time deposits in the definition of money for the purpose of monetary policy does not, therefore, seem to be inappropriate. The present practice of considering time deposits as part of money stock for formulation and implementation of monetary policy may, therefore, continue until a detailed study about the statistical properties of money demand function and the nature and frequency of transactions in fixed deposit accounts are made. Fixation of credit ceiling for each bank on the basis of each bank's share in total outstanding credit is based on the implicit assumptions that each bank's performance in respect of loan recovery is the same and that the capacity of extension of loan out of their own resources is the same. If these assumptions do not hold, the present policy of fixation of credit ceiling suffers from two major weaknesses. First, a bank whose outstanding loans contain a large amount of overdue loans is, at present, being treated equally with the bank whose outstanding loans contain little or no overdue loans. This policy of treating the banks equally, whose performance in respect of recovery of loans is different, is inconsistent with the policy of reducing the share of overdue loans in total outstanding bank credit. Secondly, some banks borrow heavily from Banlgadesh Bank while there are banks which rely mainly on their own resources for credit expansion. Fixation of ceiling for each bank on the basis of their share in total outstanding credit without taking into consideration the liquidity position of the banks is inconsistent with the policy of encouraging the banks for mobilising deposits. While fixing the credit ceiling for each bank,

Bangladesh Bank may, therefore, not only take into account the share of each bank's outstanding credit in total bank credit in the previous quarter, but also the share of each bank's overdue loans in total outstanding credit and the credit deposit ratio. It may, however, be noted that Bangladesh Bank has recently discontinued the policy of imposing bankwise credit ceiling.

Other Policy Measures

As mentioned earlier, the central bank influences the size of the bank's lending operation by changing the Bank rate. Change in the Bank rate not only influences the size of the bank credit but also the overall borrowing in the economy since it influences the other market interest rates. Changes in interest rates also have the effect on flow of funds which in turn affect the country's balance of payments. We now examine the relevance of the Bank rate as an instrument of monetary policy in the existing institutional set up of the country.

Bangladesh Bank, in general, follows a refinance policy under which it extends loans to commercial banks for financing certain specific sectors and charges different rates of interest depending on the purpose for which the amount is borrowed by the commercial banks. The rates of interest charged for refinancing depend on the importance of sectors the Bank attaches to for financing. However, for certain sectors different rates of interests for different slabs are charged instead of a single rate. In general, a large portion of commercial banks' borrowings from the Bangladesh Bank is in the form of refinance extended to them by Bangladesh Bank. In a situation where the commercial banks borrow substantial amounts from Bangladesh Bank at rates of interest other than the Bank rate, the Bank rate does not seem to have much relevance to the control of bank credit. It is really the refinance policy that plays an important role in influencing the size of the bank credit.

The rates of interests on deposits and bank lending are institutionally fixed in Bangladesh. Variation of Bank rate does not have any effect on these rates, unless these rates are changed simultaneously by Bangladesh Bank with the change of Bank rate. Securities and capital markkets are highly underdeveloped. Interests on the securities which are very few in numbers are hardly any reflection of market forces of demand and supply and, therefore, change in Bank rates has little influence on the prices and thus the yields of these securities. Changes in the Bank rate has, therefore, little or no influence on the market rates of interest and thus the availability of investment funds in the economy. Therefore, the Bank rate as an instrument of monetary policy has not been used frequently in Bangladesh. The Bank rate has been changed few times only since independence. Any significant change in the Bank

rate was either accompanied or followed by changes in scheduled bank deposit and lending rates. This implies that the Bank rate was changed to keep it in line with the changes in deposit and lending rates of banks, or when the Bank rate was changed, deposit and lending rates were changed to keep these rates aligned with the Bank rate.

Bangladesh Bank followed a policy of low interest rates on deposits and advances since independence until October, 1980. The rates of interest fixed on different types of deposits were below the rate of inflation thus giving a negative rate of return. It can be observed from the data given in the table -2 that the real rates of return on all types of deposits as on 30th June, 1980 were negative.

The difference between the weighted rates of interests on advances and deposits was maintained around 6-7 percent. The rates of interest on deposits were, therefore, fixed at low levels. However, on October 16, 1980 interest rates on deposits and advances were refixed and set at reasonably high levels. This policy shift was expected to achieve two major objectives. First, the high rates of interest on deposits were expected to generate additional savings which could be used for productive investment in the economy. Secondly, relatively higher rates of interests on longer term doposits would induce the savers to shift their funds from other type of deposits to longer term deposits, and as a result, the shift in composition would reduce the income velocity of money and thus produce less inflationary impact on the economy. If we examine the data given at Table-2 we find that the rates of interest on fixed deposits were fixed in such a way that it gave savers a positive real rate of return As a result of revision of interest rates a shift in the composition of deposits took place. Time deposits which was around 60 percent of total deposits before the revision stood at over 70 percent as on 30th June, 1985. The objectives of upward revision of interest rates on deposits seem to have been achieved to a certain extent.

Interests on deposits and lending are costs and income of commercial banks respectively. Increase in interests rates on deposits impair the profitability of the banks unless the rates of interests on lending are also increased. Therefore, Bangladesh Bank increased the lending rates simultaneously with the increase in interest rates on deposits. Two observations seem to be in order. First the policy of higher rates of interests on deposits which creates the base for credit expansion through increase in the value of money multiplier is inconsistent with the policy of slowing down credit expansion. If Bangladesh Bank is to continue with the policy of decreasing the rate of credit expansion, then there is a case for downward revision of interest rates on deposits. Secondly, savings is a 'leakage' and invenstment is an 'injection'. Unless savings are used for productive investment, additional savings generation may

TABLE-2
Real Return on Bank Deposits

Types of Deposits	Rates of Interest as on 30th June, 1980	Rates of Interest as on 30th June, 1985	Real Rate of Return on Deposits as on 30th June, 1980	Real Rate of Return on Deposits as on 30th June, 1985
	1	2	3	4
A. Saving Deposits				
i) With Chequing Facilities	6.00	8.50	-9.50	-3.34
ii) Without chequing Facilities	7.00	10.00	-8.50	-1.34
B. Fixed Deposits				
i) for 3 months and over but less than 6 months.	7.00	12.00	-8.50	0.16
ii) For 6 months and over but less than 1 year.	7.50	13.00	-8.00	1.16
iii) For 1 year and over but less than 2 years.	8.25	14.00	-7.25	2.16
iv) For 2 years and over but less than 3 years.	9.25	14.50	-6.25	2.66
v) For 3 years and over	10.25	15.00	-5.25	3.16

Source of Basic Data : Economic Trends, Bangladesh Bank.
Note : Real Rates of Return of deposits as on 30th June, 1980 and 30th June, 1985 have been calculated by deducting average inflation rate of 1979-80 and 1980-85 respectively from rates of interests on different types of deposits.

become counter productive. Creation of investment opportunities through appropriate policy measures simultaneously is, therefore, also necessary.

Market for government securities is highly underdeveloped in Bangladesh, and as a result Bangladesh Bank cannot undertake open market operation as an instrument of monetary policy. In order for the open market operation to be effective and successful as an instrument of monetary policy two things must be insured. The securities should be highly marketable, and the yield on the securities should be competitive with the yields on alternative assets. In Bangladesh the marketability of the government securities is very low and the yield on these securities is also low as compared to the yields on other assets. The people are unwilling to hold the government securities and treasury bills because of its low level of marketability and yields. The main holders of the government securities and bills are, therefore, the Bangladesh Bank and the commercial banks. The question then arises if the public do not hold the government securities and treasury bills because of its low level of yield and unmarketability then what makes the commercial banks to hold these securities ? One of the reasons for holding those securities by the banks is that they are required to hold certain percentage of their depositors liabilities in cash, balances with Bangladesh Bank and approved securities as statutory liquidity requirement.

In the developed economy open market operation is used as the most effective instrument of monetary policy. The yield on the government securities depends on the market forces of supply of and demand for these securities. It is easy to sell and buy government securities whenever there is a need to do so because there is a well organised market for these securities. The yield on the securities is comparable to the yield on alternative assets because the price at which these securities are sold and bought in the markert depends also, among other factors, on the current market rates of interests. In the absence of such a well organised market, it is almost impossible to generate excess liquidity or mop up excess liquidity in the economy by Bangladesh Bank as and when needed. This is not to say that open market operation as an instrument of monetary policy is irrelevant in Bangladesh because there does not exist any securities market in which to conduct the operation. What we suggest is that the efforts may be made to develop the securities market so that the conventional monetary policy insturments can be used to influence the economy in the desired direction.

The interest rates on government treasury bills are very low. Since the prices of the bills do not vary, the rates of interests are the yields of these bills. If we examine the data given in the Tables-2 and 3 we find that the interest rates on treasury bills are lower than the rates of interest on savings and fixed deposits. The public, therefore, cannot be expected to hold the bills which offered such low rates of interest relative to those on other assets.

TABLE-3
Intrest rates on Treasury Bills

Type of Treasury Bills	Upto October 15, 1980	Effective from October 16, 1980
(a) Treasury bills	6.00	8.50
(b) Treasury bills on tap	7.00	9.50

Source: Economic Trends, Bangladesh Bank.

Many pepole in the developing countries tend to aruge that low rates of interests on government securities is appropriate because increase in interest on government securities increase the cost of government borrowing which in turn is likely to reduce the government development expenditure affecting production and employment adversely. To the extent that the government securities are held by the central bank and the nationalized banks, increase in interests on governmentsecurities implies transfer of money from one government department to another. Real cost of the government borrowing increases if the securities are held by the public and private banks. Lower rates of interest on government securities impairs the profitablity of the banks. If the central bank lowers the statutory liquidity requirement or interest on bank deposits in order to enables the banks to maintain the same level of profitibility, the effectiveness of the important policy instruments is reduced. If instead of lowering liquidity requirement and interest on deposits, the central bank increases the banks' lending rates, the private sectors borrowing from the commercial banks is reduced, which in turn affects adversely the private investment in the economy.

Open market operation has both monetary and fiscal aspects. If the interests on government securities are kept low administratively, open market operations will fail to achieve its desired objectives, and therefore, cannot be used as an instrument of monetary policy. On the other hand, if the interests on government borrowings are fixed at high levels, the cost of the government borrowing will go up and is likely to reduce government investment. However, it may be noted tbat if low rates of interests on government securities are to be accompanied by either decrease in interest rates on fixed deposits or increase in interest rates on lending or both for the purpose of maintaining the level of profitability of the banks, such low level of interests on government securities is not

without any cost to the economy, since decrease in interest rates on deposits adversely affects the level of financial savings and increase in lending rates reduces the public demand for credit affecting the level of investment in the economy.

Scheduled banks in Bangladesh are required to hold a certain minimum percentage of their deposit liabilities in the form of balances with Bangladesh Bank as cash reserve requirement. Variation of this requirement exercises a direct effect on the credit creating capacity of the banks and thus the aggregate money stock. This is a very useful monetary policy instrument to effect the desired change in the monetary aggregates. In Bangladesh, cash reserve requirement has not been used by Bangladesh Bank as a monetary policy instrument. After independence, the cash reserve requirement was fixed at 5 percent of total deposit liabilities. The amount of reserve money has increased substantially in recent years, and so is the value of the money multiplier. In this situation cash reserve requirement could be used effectively to reduce the value of money multiplier and thus the credit creating capacity of the banks.

The banks are also subject to additional reserve requirement, called statutory liquidity requirement. According to this requirement, the banks are required to hold certain minimum percentage of their deposit liabilities in cash Balances with Bangladesh Bank and investment in approved securities. Though the primary purpose of this statutory liquidity requirement is to ensure the liquidity of the banks for safety reasons, the monetary authorities could use this requirement as a credit control device. It can also be used as a device to allocate resources to government for financing government expenditure. Bangladesh Bank has not used the statutory liquidity requirement as an instrument of monetary policy to control monetary aggregates. After independence, the requirement was fixed at 25 percent of total deposit liabilities, and this ratio was not changed for a long time. Recently, the liquidity requirement in the case of time liabilities was reduced from 25 percent to 23 percent. It is our view that in order to have an effective monetary policy the monetary authorities may make use of statutory luquidity reqquirement as one of the policy instruments as and when needed. In october 1987 both cash reserves and liquidity requirement have been raised by the Bangladesh Bank.

Bangladesh Bank imposes ceilings on the total amount of loans and investments of the banks as and when needed. Ceiling for each bank is determined, as mentioned earlier, on the basis of predetermined total bank credit on a given date and the share of each bank's credit to total outstanding Bank credit at the end of the previous period. After credit ceiling for each bank is determined Bangladesh Bank imposes selective

credit control and other measures with the objectives for increasing production, employment and real income with due regard to socio-economic priorities, distributive justice, regional balance.

Selective credit controls in Bangladesh take the form of a complete restriction of credit for specified purpose of setting a maximum limit on the amount of credit for certain purposes or fixing a minimum amount of credit expressed as a certain percentage of total deposit liabilities or specified assets for certain purposes. It also takes, among others, the form of setting minimum margin requirements or change the margin requirements as and when needed. In Bangladesh, these selective and quantitative credit control measures are a very effective tool for the conduct of monetary policy. Since the selective and quantitative level of bank credit as also the amount of credit to specified sectors of the economy for specific purpose are essential for achieving the desired objectives within the framework of overall economic policies and programmes of the government, the present policy of using selective and quantitative credit control measures may continue along with the use of other policy measures. However, it may be noted that mere issue of directives/circulars to banks to comply with certain instructions does not serve the purpose unless Bangladesh Bank monitors, from time to time, whether those instructions have been carried out properly. One way to ensure whether the banks have complied with the instructions given by Bangladesh Bank is to inspect the bank branches periodically and check whether the operations of the bank branches are consistent with the prevailing instructions. Another way is to examine various data submitted by them to different departments of Bangladesh Bank and see whether those data are consistent with the data expected as per the various directives/circulars issued by the Bank. In order to make the selective credit control measures effective, it is desirable to cross check all the information gathered by Bangladesh Bank from scheduled banks and to take corrective measures as and when needed.

III. Related Issues

The broad strategy of economic and monetary policy is decided by the government. The Bangladesh Bank is responsible for coordination and implementation of the government's policy. The Bank clearly makes its influence felt on a wide range of policy decisions and is represented on many Committees through which economic policy is formulated and co-ordinated. The Bank, therefore, has a special role to play at the formulation stage in advising the government on monetary and fiscal affairs.

It has sometimes been common to talk about autonomy or independence of central banks. The use of the word independence may,

of course, be misleading to some people about the position of a central bank. The authority of the state over the central bank is invariably absolute. What is open to question is the extent to which the government should detail its command to the central bank. The extent of government regulation of the central bank, however, varies from country to country depending upon the precise role that the central bank is assigned by statute or by tradition. Generally, the central bank is created as a corporate body whose powers are regulated by its Charter, just as an ordinary bank's powers are regulated by its Articles of Association. In Bangladesh, the central bank (Bangladesh Bank), like all other corporations and banks, has been created by Charter. The bank's role can be analysed on the following categories :

(a) The Bank's relationship with the Government;
(b) Its relationship with the banking and financial community; and
(c) Its relationship with the general public.

By Charter the Bangladesh Bank is the Government's Bank. The government's consolidated account is maintained by the Bank free of cost. Bangladesh Bank does not pay any interests on balances of Government account maintained with the Bank. The Government, like the customer of a commercial bank, has 'ways and means' advance limit determined by mutual consultation. Whenever this limit is exceeded, the excess drawal is covered by adhoc securities. This aspect of the Bank's relationship with the government is more or less of a routine nature.

Bangladesh Bank's relationship with the government has two distinct phases-advisory and operational. It is a common feature of the modern central banks throughout the world that they have the main operational responsibility for official dealings, both in their own markets and the international markets. The earlier philosophy that the central bank should not cater and pay too much regard to politics of government, is steadily giving rise to different conception that a central bank, albeit detached from executive anxieties, nonetheless be an insider in the policy realm of the government. It has become increasingly recognised that the larger and overall interest of the country demands harmonisation of policies and it would only be disastrous if one part of the official machine pulls in one direction and the other part in another. The monetary policy is only a fraction of the entire gamut of economic policy in which the final responsiblilty must inevitably lie with the government. In a planned economy in which government controls virtually all commercial and financial activities a central bank outside the government's control would be wasteful and superfluous. But in a mixed economy where economic decisions are made by the households, and productive and distributive activities adjust to those decisions, the central bank and the government may not have the same kind of orientation.

In terms of clause (1) of Article 9 of the Bangladesh Bank Order, 1972 the government has the power to give directions to the Bank to cover any matter of policy. This provision locates clearly where the ultimate responsibility lies. However, it seems to us that there are clear circumstances where views may be divergent between the government and the Bank. In such situations, disagrements should be discussed threadbare in the best intersts of the country.

The Annual Report of a central bank is useful instrument through which it can air a good deal of its ideas to the public. The Annual Report not only records the economic events of the period under review but also analyses, focuses and pinpoints the factors which are responsible for the performance of the economy in a particular way. This function of the central bank like its relationship with the government, in the final analysis, depends on the availability of expertise and technical competence at the command of the central bank. If the government's department is better organised in anlysing issues, tracking out a course for the economy and establishing causal relationship among the various macro variables, the central bank will certainly fade into unimportance in this role. It is, therefore, important how well-educated and able are the operational and technical staff of the central bank.

The effectiveness of central banking policies designed to regulate the monetary conditions depends largely on the degree of development of money and capital markets. In countries where money and capital markets are of a rudimentary nature, it is necessary for the central banks to play an important role in the development of money and capital markets. Empirical evidence has shown that financial development and economic growth are positively related and that in most of the LDCs fifnancial development induces real economic growth. Apart from performing the traditional functions, the central banks in LDCs are, therefore, required to make strenuous efforts to develop a sound financial system which can play an important role for the economic development of the contry.

Bangladesh Bank direct the nationalised banks from time to time to provide sufficient credit to priority areas such as agriculture, exports, small industries etc. In order to extend banking services to rural areas the nationalised commercial banks were required to establish two rural branches in order to obtain a licence to open an urban branch. This policy led to the substantial increase in the number of rural branches. The number of rural branches which was about one-third of the total number of branches as at end December, 1971 has increased to about twothirds of the total number of branches as at end june, 1985 (Annexure-1). However, this fast expansion of rural branches was not initially well

planned as a result of which there was a concentration of branches in some areas while some areas remain uncovered.

The monetary authorities formulate programme and policies in line with the overall government's national economic policies. In the development plans and programmes the government places continuing emphasis on rural development. The monetary authorities have, therefore, adopted policies in such a manner that flow of credit to rural areas increases over the years. The percentage share of rural advances which was lower than that of percentage share of rural deposits till 1981/82 increased in recent years (Annexure-2)

The Government allowed private banks to operate in the country. The objectives of allowing private banks to operate in the country are, among other things, to encourage competition in the banking sector which is expected to raise efficiency by rendering improved counter and non-counter services to the customers, to mobilise deposits from hitherto untapped sources,to channelise credit to genuine users so that overall economic activity could be raised to a satisfactory level. However, if we examine the loan structure of different banks (Annexure-3) it can be seen that in contrast to substantial flow of funds from the nationalised and specialised banks to agriculture and other priority sectors, the advances by local private banks and foreign banks remain concentrated mainly in trading services. The nationalised commercial banks and the specialised banks are therefore, heavily burdened with meeting socio-economic priorities set by the monetary authorities. It may be desirable to direct the local private banks and foreign banks to extend certain percentage of their loan to priority sectors.

REFERENCES

1. Bangladesh Bank : Economic Trends, Various Issues.
2. Bangladesh Bank : Scheduled Banks Statistics, Various Issues.
3. Rahim, A.M.A. : The Performance of Banking System, 1971-77, In Rahim(ed) Current Issues of Bangladesh Economy, Bangladesh Books International Ltd., Dhaka, 1978.
4. Rahim, A.M.A. and Sohrab Uddin, M: The Layout of Monetary Analysis in Bangladesh, Bangladesh Bank Bulletin. October, 1974.
5. Sohrab Uddin, M.: Monetary Approach to Balance of Payments: Evidence from Less Developed Countries, Indian Economic Journal, July, 1985.
6. Sohrab Uddin, M.: Monetary Policy in the Third Five Year Plan, Bangladesh Journal of Political Economy Conference Vol. I A, December, 1986.
7. Sohrab Uddin M.: Relationship Between Output Price and Money: An Exploratory Study, Bank Parikrama (forthcoming).

ANNEXURE-1

Number of Bank Branches Operating in Bangladesh

Year		Rural Branch	Urban Branch	Total
1		2	3	4
December	1971	412	757	1169
June	1972	414	757	1173
June	1973	519	780	1299
June	1974	694	798	1492
June	1975	784	836	1620
June	1976	821	930	1751
June	1977	1095	969	2061
June	1978	1592	1163	2755
June	1979	1983	1266	3249
June	1980	2456	1364	3820
June	1981	2851	1527	4378
June	1982	2932	1538	4470
June	1983	3050	1553	4603
June	1984	3225	1592	4817
June	1985	3335	1628	4963

Source: Compiled from different issues of scheduled banks statistics, Bangladesh Bank.

ANNEXURE-2

Percentage Distribution of Advances and Deposits by Areas (Urban and Rural)

Period	Advances		Deposits	
	Rural	Urban	Rural	Urban
30.6.75	92.31	7.69	86.50	13.50
30.6.76	96.40	3.60	90.83	9.17
30.6.77	94.23	5.77	89.26	10.74
30.6.78	90.82	9.18	86.75	13.25
30.6.79	90.19	9.81	84.65	15.44
30.6.80	89.18	10.82	85.60	14.40
30.6.81	87.59	12.41	84.11	15.89
30.6.82	86.78	13.22	84.58	15.42
30.6.83	81.40	18.60	83.24	16.76
30.6.84	74.22	25.78	82.94	17.06
30.6.85	71.50	24.50	82.73	17.27

Source: Different Issues of Scheduled Banks Statistics, Bangladesh Bank, Dhaka.

ANNEXURE-3

Advances Classified by Economic Purpose

(Figures in percentage)

Economic purpose	As on 30.6.1985			
	NCBs	Specialis-ed Banks	Foreign Banks	Private Banks
1	2	3	4	5
A. Agriculture, Hunting, Forestry & Fishing	21.04	68.58	1.76	7.55
B. Minig & Quarrying	0.35	0.30	—	0.04
C. Manufacturing	22.94	23.27	40.58	21.68
D. Construction	2.72	0.15	2.98	4.47
E. Electricity, Gas, Water & Sanitary Services	1.21	0.08	0.01	0.85
F. Wholesale & Retail Trade & Restaurants & Hotels	41.77	1.58	47.74	60.21
G. Financing, Insurance, Real Estate & Business Services	0.71	0.18	0.08	0.09
H. Transport, Storage & Communication	1.76	3.90	2.66	2.42
I. Community, Social & Personal Services				
J. Employees & Activities not Adequately Des-cribed	7.50	1.95	4.19	2.69
Total	100	100	100	100

Note: Compiled from Scheduled Banks Statistics, Bangladesh Bank.

Aspects of Development Finance Institutions in Bangladesh

A.M.M. Shawkat Ali *
Nazmul Bari **
A.B.M. Siddique ***
A.K.M. Shameem ****

Introduction

This paper is intended to throw light on some aspects of development financial institutions (DFIs) in Bangladesh. The paper is divided in 3 parts. Part I discusses what is a development bank and how it has grown in Bangladesh context. Part II presents descriptive account of the relationship between development banks and other banks working, in a limited way in the same or related sectors. Part III provides analytical overview of the working of BSB and BSRS. The paper is not intended to provide an exhaustive analysis of the working of DFIs in Bangladesh but is meant to provoke a debate on the subject.

I. What is a DFI ?

William Diamond has addressed the question. [1]. During the last two and a half decades the governments in the third world countries have created organisations called "development corporations" and "development banks." These organisations have diverse forms. Although these organisations have been created by the government, some are owned exclusively by government, others by private interests and still others by a combination of the two. Diamond argues that conceptually it is possible to make a distinction between a "development bank" and a "finance corporation." Development bank is concerned primarily with

---

* Managing Director, Bangladesh Krishi Bank.
** Assistant General Manager, Bangladesh Shilpa Bank.
*** Agricultural Economist, Ministry of Agriculture.
**** Principal Officer, Agrani Bank.

The views expressed in the paper are of the authors' and do not necessarily reflect views of the organisations with which they are associated or of the government.

long term loan capital and a "finance corporation" is concerned "primarily with equity capital" and "with fostering and managing specific companies as well as providing financial supports." However, Diamond argues that although this distinction may be conceptually valid, it is too blurred to be useful in practice.

Diamond uses the terms "development corporation" and the "finance corporation" almost in the same breath. In Bangladesh context, development corporation has a different connotation and its growth was the result of adopting the concept of corporate under a law which defines its functions, responsibilities and powers, If development corporation is seen as an institution concerned primarily with equity capital and with management of specific companies as well as providing financial support, some of the development corporations in Bangladesh may not stand this text. BADC and BWDB are cases in point. They do not provide equity capital nor do they manage specific companies. On the other hand, some of the development corporations like PDB, BCIC and BSEC may come near to the concept of development corporation to which Diamond has referred. Although PDB is yet to have any company, it is understood that government is setting up such companies starting with Dhaka Electric Supply. BCIC has a number of holding companies and so have BSEC and BSFIC.

Diamond does accept the fact that there may be a thin line of difference between loan-giving development banks and equity-providing development corporation. He further argues that both development bank and development corporation have one common goal; the provision of capital and provision of enterprise. He sees them bound by the common purpose of supplying two elements of production, the objective being to speed up the process of development.

Diamond draws a further line of distinction for the development banks :

— those concerned with government investment and

— those concerned with the private sectors.

He cites examples of countries where governments have decided to meet the gap of capital and enterprise required for speeding up the process of development. Thus organisations are created to plan, finance and carry out investment projects and programmes on government account. He cites the cases of "Prombank" in Soviet Russia and "Sumer bank" of Turkey and "Corporation Boliviana de Fomento." These institutions were established to execute government investment projects. The closest parallel in Bangladesh context was the EPIDC. However, it must be borne in mind that EPIDC was never a development bank. EPIDC acted

wholly as an agent of the government for long term investment in the industrial sector. This difference between a development bank which primarily provides capital and a development corporation which promotes the process of development on behalf of the government is not lost sight of by Diamond. For the purposes of his discussion, Diamond defines a development bank as a financial institution devoted primarily to stimulating the private sector of the economy [1;4].

In Bangladesh context, a typical example of a development corporation is Bangladesh Small and Cottage Industrial Corporation (BSCIC). BSCIC is responsible for promoting small and cottage industries. It provides for setting up of industrial estates, selects entrepreneurs and facilitates grant of loans to the selected entrepreneurs through the banks. It is not responsible for making investment on behalf of the government except for setting up of industrial estates for small investors.

Diamond argues that the development bank as an institution to promote and finance enterprises in the private sector is not a new device. Such institution for production investment has existed for more than a century and they have gained popularity in Asia, Latin America and Africa because of the growing urge for rapid economic development. Just as the nations of Asia, Africa and Latin America today are looking on Western Europe and North America for machinery and technical know-how, so did the continental Europe look on Britain in the middle of nineteenth century. When defining a development bank as an institution providing capital, enterprise, managerial and technical advice to the private sector, Diamond admits that this does not adequately describe the range and depth of its operation. He deals with such issues as the conditions affecting private investment and how much can be done to promote such investment. In view of the diversity of forms of financial institutions, we shall use the term DFI to denote both finance corporation and development bank.

The problems of investment

The problems associated with productive investment are as varied as they are complex. The size of investment needed for a particular enterprise may be in short supply. A nation's savings may be indequate or it cannot otherwise be mobilised. It may even be misdirected. Even when capital is available, the entrepreneurs may be averse to risk the investment proposed. There may also be other socio-economic and institutional impediments. The seeting up of a development bank by itself may not provide solutions to all these problems because a development bank is to operate in a given economic and institutional environment. Furthermore, it cannot act unilaterally in the sense that it

has to act in conjunction with other institutions, financial, administrative and political.

Difference in approach in lending operations of DFIs and Commercial Banks

In discussing the issue of differences in approach in lending operations of DFIs and commercial banks, one may as well raise the question : is a development bank at all necessary ? The argument against setting up of new institution involves questions of cost, shortage of managerial and technical personnel which is characteristic of underdeveloped countries and the undesirability of spreading that personnel too thinly. [1;41-42].

During the early nineteeth century, the commercial banks have largely financed the industrial sector in continental Europe and the United States. In many countries such as Columbia, the law forbids comercial and investment banking. In others, such as India, Pakistan and Bangladesh, a mixed system is preferred.

It may be perhaps correct to say that in the South Asian countries of India, Pakistan and Bangladesh, the need to set up development banks arose out of two factors. First, industrial finance is primarily related to providing long term loans for fixed capital although, after an enterprise is established, it would also need floating (working) capital. Because commercial banks have an overwhelming preference for short-term lending, it is not possible for them to go for long-term financing on large scale.

Second, development banks, in their approach to long term financing, take into account considerations other than purely commercial. Besides, other essential ingredients of investment: enterprise and skill are precisely what the commercial banks lack.

The Bangladesh Context

During the fifties, there where two finance corporations. Pakistan Industrial Finance Corporation (PIFCO) was established in 1949 with the object of "making medium and long term credits more readily available to industrial concerns in Pakistan." It was a joint venture of government and private capital, the government owning 51% share.

Pakistan Industrial Credit and Investment Corporation (PICIC) was established in 1957. The main objectives of the corporation were to assist industrial enterprises in the private sector by providing assistance in creation, expansion and modernisation of such enterprises. It could also sponsor and facilitate participation of private capital in such enterprises.

The Credit Inquiry Commission, 1959 noted the overlapping of activities of PICIC and PIFCO and recommended conversion of PIFCO into a Industrial Development Bank catering only to the needs of medium-sized industry [2;117]. In 1959, PIFCO had branch offices only in Lahore and Chittagong. The Commission recommended setting up of operational offices in Dhaka under senior officers with well-defined powers to sanction loans. Following the recommendation of the Commission, the Industrial Development Bank of Pakistan (IDBP) was established in 1961.

In the agricultural sector, during the fifties, there were also two institutions: Agricultural Development Finance Corporation (ADFC) and Agricultural Bank of Pakistan (ABP). As in the case of the industrial sector institutions, the Credit Inquiry Commission recommended setting up of one institution. Thus ADFC and ABP were merged and Agricultural Development Bank of Pakistan (ADBP) was established in 1961.

At liberation in 1971, these institutions assumed new names reflecting the spirit of independent Bangladesh. ADBP came to be known as Bangladesh Krishi Bank (BKB), IDBP came to be known as Bangladesh Shilpa Bank (BSB) and PICIC came to be known as Bangladesh Shilpa Rin Sangstha (BSRS). The private commercial banks ere nationalised and they, with former National Bank of Pakistan (now Sonali) came to be known as Nationalised Commercial Banks (NCBs). An investment corporation was also set up and is known as Investment Corporation of Bangladesh (ICB). There are also Samabaya (Cooperative) Bank (BSBL) and the Grameen Bank (GB). In addition there are some private investment companies.

Except for Grameen Bank (GB), all other institutions are engaged in long-term finance for industries, although BKB's role is limited to agro-based industries only. BKB and BSB are legally defined banking companies fully owned by the government. BSRS and ICB are development corporations dealing in long term loans. ICB is owned by the government, the relevant parastatals and private investors. Its main operations include provision of bridge financing, equity support and management of investment accounts.

For the purposes of our consideration, the discussion will primarily be limited to BSB and BSRS which are seen as the leading industrial financing institutions in Bangladesh. The basic difference between the two is that while BSB is a development bank in the sense that it is a banking company, BSRS is a development (finance) corporation.

II. Relationship among DFIs, NCBs and BKB

In order to understand the operational significance of DFIs in industrial financing, it is important to discuss the linkages and interrelationship between DFIs and other financial institutions. As already stated, in Bangladesh, it is a mixed system in so far as long-term financing in industrial sector is concerned. The law does not appear to prohibit long term financing by the NCBs. In fact the government policy has increasingly involved the NCBs in the financing of medium and small scale industries. BKB's position is somewhat different from those of the NCBs. BKB's charter allows financing of agro-based industries and at the same time it is required to operate on commercial principles. In most cases, financing of medium and small industries by NCBs and BKB resulted from different aid agreements signed by the government with international donor institutions. However, involvement of NCBs and BKB in long term financing in the industrial sector is not significantly high. In case of BKB only Tk. 1190 million have been outstanding as on June 30, 1986 which is 5.7% of the total outstanding amount of Tk. 20580 million.[1] For NCBs, the total invested amount in financing the industrial sector is believed to be much less.

However, BKB's involvement in financing agro-based industries is much higher than those of the NCBs. For instance, BKB is the lone bank providing long term finance for the development of tea sector. To that extent BKB is performing the roles of a DFI and a specialised commercial bank. Similarly, in maintaining a separate window for financing medium and small industries, the NCBs are also doing the functions of a DFI.

Direct financing of medium and small industries by NCBs or agrobased industries by BKB is just one of the aspects of the operation of the mixed system. The other aspect of the system is more fundamental which involves providing working capital loans for the enterprises set up by the DFIs. Working capital is in the nature of a short term loan which are provided by the NCBs and BKB. However, in practice, the line of distinction between long term loans for fixed capital and short term loans for working capital is thin indeed. Working capital loans are often renewed beyond a working season not only in Bangladesh but also in India and elsewhere. Depending on the circumstances of each case, a working capital loan, renewed over the years, becomes a term loan.

Viewed in this context, DFIs, BKB and NCBs work in mutually supportive roles. Working capital loans are advanced to all enterprises

1. In case of BKB, foreign aided projects also include fisheries, horticulture and livestock development.

funded by BSB, BSRS and ICB. In fact, the current procedure followed in sanctioning industrial loans which the DFIs have sponsored make it almost obligatory for NCBs and BKB to provide working capital loans. Thus when a project is considered for sanction of funds, the bank which will provide working capital is also identified after mutual consultation.

The fixed capital assets of an enterprise funded by a DFI is mortagaged to that DFI. For working capital loans, a second charge on the mortgaged property is created in favour of the bank providing working capital. The second charge under the existing law implies in the event of continued default, the working capital loan-providing bank will have a claim on the property after the liabilities of the first charge are fully liquidated.

In providing or renewing working capital loans, BKB and NCBs usually demand a 'no objection certificate' from the DFI which has provided the long term loan for fixed capital. The object is to obtain information on the borrower's payment habit, Unless the certificate asked for can be obtained working capital funds are not given. This procedure enables the DFIs to force the borrower to have a satisfactory record of payment.

Conversely, whenever a new entrepreneur approaches a DFI for capital loan, the DFI checks with NCBs and BKB as to the applicant's liability. This system is intended to screen out entrepreneurs having bad payment records with other banks. The borrower thus has to come to a satisfactory arrangement with the bank in which he has large overdues. This system works to the advantage of other banks in getting the defaulted amount back or at least a substantial part of it.

As regards ICB, it is not a development bank. Its primary function is to ensure supply of securities in the stock-market. ICB now generally comes into contact with the DFIs after the project has started operation. As a financial intermediary, it helps investors to raise funds from the capital market.

III. Working of BSB and BSRS: 1972-1985

In this part an analytical overview of working of BSB and BSRS, the two major lending institutions in the industrial sector will be analysed in terms of disbursement, recovery, overdue, outstanding for the period from FY 1972 to FY 1985. Our selection of these aspects is dictated by the fact that over the past few years the problem of disbursement and recovery coupled with high overdues of these two institutions have attracted the attention of donors as well as the government [3;35]. There is a growing consensus among some quarters that these two institutions

have become unvialbe and major restructuring of both the organisations is seriously called for. It is not our intention to go into the question of restructuring. We intend to limit our attention to specific points in time when disbursements rose, overdues piled up, the status of loan repayment, the sectoral distribution of investment and other related issues.

For the sake of convenience the period from FY 1972 to FY 1985 is divided into three parts reflecting three distinct political regimes. First, the period from 1972 to 1974. Second, the period from 1975 to 1981. Third, the period from 1982 to 1985. The first part deals with the period immediately following the emergence of Bangladesh when the politically accepted principle articulated through the constitution was in favour of public sector investment to achieve the goals of socialism. Consequently it was expected that BSB and BSRS would go in for higher level of investment in the public sector.

BSB: 1972-74

Thus during these years, out of a total of Tk. 360.5 million sanctioned by BSB, 83% was for public and the remaining 17% for the private sectors. Out of the sanctioned amount of Tk. 360.5 million only 34% was committed reflecting an amount of Tk. 122.0 million. Out of these Tk. 122.0 million, 67% was committed to the public sector and 33% for the private sector. The amount disbursed was even less and it was 42% of the amount committed indicating the total disbursed amount of Tk. 51.4 million. Out of these Tk. 51.4 million 62% was for public sector and remaining 38% for the private sector. The emerging picture from the above trend is that while the sanctioned amount for the private sector was at the low level of 17%, the committed and disbursed amount nearly doubled leading to a corresponding decline for the public sector. It can, therefore, be said that although the political philosophy of industrialisation was overwhelmingly in favour of public sector, the share of funding to private sector in fact was not neglected.

BSB: 1975-81

Between the years 1975 to 1981 the political principle of industrial investment underwent a radical change with greater emphasis for the development of the private sector. The scenario in respect of amount sanctioned, committed and disbursed betwen public and private sectors was similarly reversed compared to the regime immedicately preceding it. The volume of propsed investment by BSB rose sharply from Tk. 360.5 million FY 1972 to FY 1974 to Tk. 4943.7 million during FY 1975 to FY 1981 registering a rise of 1271%. Even if we consider the fact that the comparison is between unequal length of time, the rise was significantly

high. Of even more significance than this is the fact that during these periods as far as BSB is concerned the sanctioned amount for the public sector was only 3% of the total amount of Tk. 4943.7 million. The amount committed during these periods in BSB was Tk. 2814.8 million which was 43% less than the amount sanctioned. Out of these committed amount, the share of public sector was only 1.5%. In respect of disbursement the situation continues to be the same. The amount disbursed was Tk. 2050.2 million which was 27% less than the amount committed. Out of these disbursed amount of Tk. 2050.2 million, the share of public sector amounted to 4% only.

BSB : 1982-85

During the period from FY 1982 to FY 1986, the share of public sector in terms of sanctioned, committed and disburshed amount was nil. During these periods the amount sanctioned stood at Tk. 1968.1 million of which Tk. 1228.4 million was committed and Tk. 1401.5 million was disbursed. Thus disbursement was higher than amount committed.

BSB : 1972-85

During the period from FY 1972 to FY 1985 BSB disbursed an amount of Tk. 3503.1 million of which 96.6% was for private sector and 3.4% for public sector.

BSRS : 1972-74

In case of BSRS the situation is more or less same. Thus during the period under review, out of a total sanctioned amount of Tk. 107.0 million, 59% was for public sector and 41% for private sector. The amount committed was 21% less than the sanctioned amount i.e. Tk. 83.8 million. Out of these committed amount of Tk. 83.8 million, 61% was for public sector and 39% for private sector. Thus it is seen that the share of public sector in the committed amount increased by 2% leading to a corresponding decrease of 2% in private sector. The amount disbursed fell by 30% compared to the amount committed. Out of the disbursed amount of Tk. 53.9 million, 93% went to the public sector and the remaining 7% for the private sector. Thus it is seen that as far as BSRS was concerned the ultimate disbursement for the private sector was drastically reduced.

On an over all basis, however, the disbursed amount in the public sector remained at 78% leaving 22% for the private sector. The total amount disbursed during the period by both the organisations stood at Tk. 105.3 million.

BSRS : 1975-81

During the FY 1975 to 1981 BSRS sanctioned an amount of Tk. 4428.3 million of which 95% was for private sector and 5% for public sector. The amount committed during the same period was Tk. 3128.7 million which was 29% less than the amount sanctioned. Out of this committed amount of Tk. 3128.7 million, 93% was for private sector and the remaining 7% for the public sector. The amount disbursed was Tk. 1796.3 million which was 43% less than the amount committed. Out of this disbursed amount 90% was for private sector and 10% for public sector. Thus it is seen that although public sector started with the 5% of the sanctioned amount, the amount disbursed actually doubled.

BSRS : 1982-85

During the period from FY 1982 to FY 1985, the total amount sanctioned by BSRS was Tk. 1895.2 million of which 96% went to the private sector and the remaining 4% for the public sector. During the same period the amount committed stood was Tk. 751.6 million which was 60% less than the amount sanctiond. Out of this committed amount of Tk. 751.6 million, 91% was for private sector and 9% for public sector. The amount disbursed during the same period stood at Tk. 1181.5 million which was 57% higher than the amount committed. Out of this disbursed amount of Tk. 1181.5 million, 99% was for private sector and only 1% for public sector. Thus the share of public sector was insignificant.

BSRS : 1972-85

During the period from FY 1972 to FY 1985 the amount disbursed by BSRS stood at Tk. 2583.0 million of which 99.9% went to the private sector. During the same period the two lending institutions disbursed an amount of Tk. 6534.8 million of which 94.6% went to private sector and the remaining 5.4% to the public setor. The over all situation is shown in annex-I.

The Status of Repayment

It is perhaps relevant to find out the respective share of public and private sector in loan repayment. It has been found that the shaie of public sector in loan repayment is generally higher than that of the private sector. The recovery figures for the FY 1972 and FY 1973 divided between public and private sector are not available in respect of BSB. For BSRS the figures show that an amount of Tk. 55.8 million was collected during FY 1972 to FY 1974 of which Tk. 45.2 million was from

the public sector representing 82% of the total recovered amount. During the period from FY 1975 to FY 1981, out of the collected amount of Tk 1549.3 million by BSRS, 89% was from the public sector and for BSB it was 67%, the collected amount being Tk. 1411.2 million.

During the period from FY 1982 to FY 1985, BSRS collected an amount of Tk. 1119.6 million of which 48% was from the public sector and 52% from the private sector. During the same period, BSB collected an amount of Tk. 1411.17 million of which 20% was from public sector and 80% was from private sector. The situation during this period is, therefore, totally opposite of the preceding periods. However, on an over all bsis from FY 1972 to FY 1985 the share of public sector stood at 56% although during the last decade the disbursement to public sector rapidly declined drawn to zero.

Rate of Recovery of BSB and BSRS

The discussion on the status of repayment reflects only partially the relative performance of the public and private sectors. A clear picture will emerge if one looks at the recovery rate of both the institutions. This is shown in table-1:

In case of BSB the recovery rate divided into private and public sector for the period between FY 1972 to FY 1974 is not available. The recovery rate for the period between FY 1975 to 1981 of BSB is consistently higher in respect of the public sector except for the FY 1975. In most cases it is generally 4 times higher than that of private sector in a given year.

In case of BSRS except for the period between FY 1972 to FY 1974 the recovery rate for public sector is also consistently higher than that of the private sector. This tends to signify the fact that the repayment habit of the public sector is better than that of the private sector. It may be argued that since both the lending institutions are wholly owned by the government they are in much better position to exert pressure on public sector borrowers and get the money back. Conversely it may also signify the fact that the two lending institutions in the period under review, have not either been able to exert the required level of pressure on the private sector or the private sector is given to habitual default in loan repayment. It has often been argued that the inability or unwillingness of two lending institutions to exert the required level of pressure on the private sector stems from two basic factors. First, the legal framework for recovery of loan from the defaulting borrowers is outmoded, expensive and time consuming. Second, most of the big and habitual defaulters are often able to get undue and undeserved political protection against any attempts by the banks to recover the loans within the limitation imposed by the outmoded legal framework.

Table-1
Recovery Rate of BSB and BSRS Loan in the Private and Public Sector during FY 1972 to FY 1985

	BSB			BSRS		
	Recovery Rate in percentage			Recovery Rate in percentage		
Year	Private	Public	Total (Private+ Public)	Private	Public	Total (Private+ Public)
1972	—	—	8.1	1.7	5.1	4.7
1973	—	—	11.0	8.5	4.4	4.9
1974	—	—	11.1	8.8	2.7	3.2
1975	21.6	5.9	8.9	7.9	14.4	13.1
1976	18.5	32.2	26.8	7.1	36.1	28.5
1977	18.0	57.1	37.6	4.1	24.2	17.6
1978	22.5	32.1	27.5	5.5	12.6	10.7
1979	17.8	69.9	46.0	7.6	44.9	35.3
1980	22.1	70.2	41.2	9.4	48.1	32.1
1981	21.6	64.2	32.2	8.1	45.2	24.5
1982	14.9	40.0	19.7	5.6	29.6	11.7
1983	15.4	40.2	17.4	6.6	23.8	9.9
1984	12.3	46.9	14.3	4.3	17.5	6.5
1985	11.7	41.1	13.5	9.8	20.4	6.9

Note : Recovery Rate = $\frac{\text{Amount Recovered}}{\text{Amount overdue + Amount Recovered}} \times 100$

Source : Analysis based on figures of BSB and BSRS

While the above line of reasoning is advocated by the lending institutions, the defaulting borrowers have their own arguments not to repay their debt in time. Of the many arguments advanced a few may be cited. First, unusual delay in project appraisal and ultimate disbursement which leads to cost overrun. Second, inadequacy of the project appraised by the bank's appraisal staff resulting largely from overdependence on macro level information and consequent over congestion in a particular sector. Third, fiscal policies which imposes unnecessary tax burden on the entrepreneurs. Fourth, insufficient or interrupted power supply. Fifth, turbulent labour unionism which often leads to either lock out or complete suspension of factory operation. Sixth, uncertainties of the level of protection granted to indigenous industries through import policy orders and unforeseen waivers given for imports presumably as part of political patronage. Seventh, unplanned sanction of industrial enterprises in the same sector leading to over congestion and consequent unviability of enterprises from commercial point of view. Eighth, cumbersome and dilatory process of documentation.

While the truth perhaps lies between the two sets of opposite arguments, it cannot perhaps be denied that from 1975 onward there has been complete reliance on the institutional, managerial and technical capability of the private sector in making sound investment. It may even be said that this type of reliance instrumented through liberal disbursement of loan to the private sector was somewhat misdirected in that the private sector entrepreneurship was not perhaps ready to absorb the flow of fund in a way which would ensure adequate return on investment with which to pay back the debt. Instances are not lacking when many investors found it prudent to divert a large portion of the investible fund to build up other assets such as real estate or trading. In such cases even the best appraised project would be sick because of indadequate finance. A conclusive judgement on the issue of the two of diametrically opposite arguments may be possible through further investigation and research. One thing that is certain, is that the piling up of overdues in industrial sector resulted as much from the relaxed attitude of the borrowes as from the lack of political and administrative commitment on the part of the government to ensure loan recovery.

This is substantiated by the very high level of overdues for both the financing institutions. In case of BSB the outstanding and overdue till FY 1985 respectively are Tk. 6107.3 million and Tk. 2673.4 million. Of the total outstanding amount of Tk. 6107.3 million, Tk. 5985.2 million representing 98% is for private and the remaining 2% for public sector. Of the total overdue amount of Tk. 2673.4 million, Tk. 2627.5 million representing 98% is for private sector. The overdue as percentage of outstanding is 44% in case of BSB.

In BSRS the total outstanding till FY 1985 is Tk. 7071.6 million of which Tk. 4640.3 million is overdue representing 66% for private and the rest for public sector. Of the total overdue amount, 89% is for private sector and the remaining is for public sector.

It is relevant to look at the trend in piling up of overdue during three periods of which reference has already been made. The total overdue amount in FY 1974 was Tk. 488.2 million in case of BSB and Tk. 791.6 million in case of BSRS. BSRS, therefore, started with a higher overdue in FY 1974 considered as base year. In FY 1985 the overdue amount of BSB and BSRS respectively stood at Tk. 2673.4 million and Tk. 4640.3 million. The available evidence suggests that piling up of overdues occurred during the period from FY 1981 to FY 1985. In case of BSB the overdue rose by 64% in FY 1981 over the level of FY 1974. The overdue increased by 235% in FY 1985 over the level of FY 1981. In case of BSRS, the overdue increased by 55% in FY 1981 over the level of FY 1974. Again the overdue increased by 278% in FY 1985 over the level of FY 1981. It can be argued that the larger piling up of overdues between FY 1982 to FY 1985 in both the cases resulted from higher disbursements during the period from FY 1975 to FY 1981. This is evident from annex-II.

However, if the piling up of overdues is seen in conjunction with table-1, it can also be argued that piling up of overdues was also caused by the unwillingness or inability of the two institutions to maintain reasonable rate of recovery. Thus it can be seen that the recovery rate for both public and private sectors of the two institutions were generally higher between the period from FY 1975 to FY 1981 than the period from FY 1982 to FY 1985.

It has been stated earlier that due to unplanned sanction of loans there has been over congestion in paritcular sector. An attempt has been made to collect information of this aspect of loan administration for both the institutions. The overall picture is presented in table-2.

It will be seen from table-2 that highest concentration is in cotton, woolen and synthetic textiles, food and allied products and jute and allied products. An attempt was also made to obtain overdue figures of different sectors in order to correctly assess the question of over concentration which is often cited as one of the major reasons of default. The overall picture is in Table-3.

Table-2

Loans disbursed by industrial sector of BSB and BSRS during FY 1972 to FY 1985

(Figure in Percentage)

Sector	BSB	BSRS
1. Food and Allied Products	21.7	23.8
2. Jute and Allied Products	11.2	17.2
3. Cotton, Woolen and Synthetic Textiles	22.8	17.1
4. Paper, Paper Products and Printing	9.7	1.7
5. Tannery, Leather and Rubber Products	3.1	1.0
6. Non-Metalic Mineral Products	1.3	4.4
7. Engineering Industries	9.0	7.7
8. Transport Equipments	7.5	7.8
9. Chemicals, Pharmaceuticals and Allied Industries	6.6	10.6
10. Service Indurstries	6.7	5.0
11. Others	0.4	3.7
Total	100.0	100.0

Source : BSB, BSRS

Table-3

Overdues by industrial sector of BSB and BSRS during FY 1982 to 1985

(Figure in Percentage)

Sector	BSB	BSRS
1. Food and Allied Products	23.7	18.9
2. Jute and Allied Products	20.5	24.0
3. Cotton, Woolen and Synthetic Textiles	11.3	12.1
4. Paper, Paper Products and Printing	9.5	5.2
5. Tannery, Leather and Rubber Products	2.0	0.8
6. Non-Metalic Mineral Products	1.5	3.1
7. Engineering Industries	5.2	4.3
8. Transport Equipments	8.1	11.1
9. Chemicals, Pharmaceuticals and Allied Industries	7.8	10.1
10. Service Industries	7.9	2.7
11. Others	2.5	7.7
Total	100.0	100.0

Source : BSB, BSRS

When we look at the overdue situation by sectors the picture is somewhat different. Food and Allied Products followed by jute and allied products have higher overdues than textiles. It is significant that the first two sectors which are dependent wholly on locally available raw materials have higher overdues. While identification of factors responsible for such a scenario must have a more rigorous empirical investigation, rigidity of markets in these two sectors is often cited as a major reason for overdues.

Age Analysis of Loans

An attempt was also made to obtain overdue figures by age in order to correctly ascertain the extent of long overdues in different sectors. Unfortunately although figures of loans are being maintained by age these are not maintained by sectors. Again the age factors are not uniformly stated in both the banks. BSB maintains it by month while BSRS does it by days. It is felt that uniform use of age analysis would be helpful for comparative analysis. We have used the age analaysis by month for both the institutions. It has been found that as on June 30, 1986, 60% of BSRS loans are over 12 months and 57.11% of BSB loans fall in the same category. The situation is presented in Table-4 below:

Table-4

Age Analysis of overdue loan of BSB and BSRS as on June 30, 1986

	BSRS	BSB
Upto 6 months	29%	24.3%
Over 6 months but not exceeding 12 months	11%	18.7%
Over 12 months but not exceeding 18 months	10%	12.9%
Over 18 months	50%	44.2%
Total	100%	100%

Source : BSB, BSRS.

Information was also obtained in regard to the total number of sick projects. It has been found that in BSB out of 865 private sector projects as many as 112 projects are sick representing 13% of the total number of

projects in this sector. In these sick projects, a sum of Tk. 910,9 million is stuck up representing 15% of the total outstanding in the private sector.

In BSRS out of a total number of 426 projects, 203 projects are said to be sick representing 48% of the total. Thus in case of BSRS the number of sick projects are much higher than in case of BSB. No standard criterion is adopted for identification of sick projects in both the institutions. However, projects which are operating in loss or in technical or financial difficulties are generally treated as sick projects. In BSRS a sum of Tk. 2250.1 million is stuck in 203 sick projects representing 32% of the total outstanding amount. All these projects are said to be in the private sector.

BSB has of late started selling of such projects and it is yet to be estimated how much of the outstanding amount can be recovered by such sale.

It is yet to be estimated how many of such projects can be rehabilitated by change of management or infusion of further capital. It is felt that quick decision on such projects in terms of either rehabilitation or outright sale is imperative not only in the interest of the bank but also in the interest of economy. Unfortunately, speedy decision on such issues is often impeded by lengthy legal battles over which banks do not have any control. It is understood that to remove the time consuming process of taking over management or outright sale, a special recovery act has been under consideration of the government for the past few months. Unfortunately, the proposed law is yet to see the light of the day.

The Status of Repayment of Debt Servicing Liabilities (DSL)

The question of high overdues for both the banks should be seen in conjunction with their capability to meet debt services obligation. It is only natural that with high overdues there would be failure to meet debt service obligation. Incase of BSB it has been found that from FY 1973 to FY 1975 it could meet its debt service obligation fully. In FY 1976 debt service payment fell to 81% and after that there is steady decline except for the FY 1980. The worst period is from FY 1981 to FY 1983 when BSB's debt service payment ranged between 11.6% to 7.4%. The total DSL payable in FY 1985 stood at Tk. 2482.38 million of which Tk. 907.4 million representing 36.5% have been paid.

In case of BSRS the figures available are from FY 1974 to FY 1985. The pattern is almost similar except for the year FY 1985. There was 100% repayment from FY 1974 to FY 1977. In FY 1985, 257% payment was made which looks somewhat unusual. Investigations made to explain

this high rate of payment show that during FY 1985, cash payment of DSL amount to 14.5% which also includes transfer of part of DSL payable to government to paid up capital. In this process a total sum of Tk. 74.64 million was transferred. The other explanations for unusually high payment is that amount on account of EFAS and bad debt provision were also adjusted. The total amount involved in these two elements is Tk. 1449.68 million. The total DSL due to be paid in FY 1985 stood at Tk. 2545 million. The amount paid is Tk. 2280.80 million inclusive of adjustments referred to above. If these adjustments are excluded the total payment made stands at Tk. 830.7 million representing 32.6%. The details are shown at table-5 below :

Table-5

Debt Service Liabilities of BSB and BSRS

Amount in Million Taka

	BSB			BSRS		
Fiscal Year	DSL payable	DSL paid	%	DSL payable	DSL paid	%
1973	4.57	4.57	100.0	—	—	—
1974	4.72	4.72	100.0	0.34	0.34	100.0
1975	12.39	12.39	100.0	65.19	65.19	100.0
1976	35.34	28.46	80.5	51.27	51.27	100.0
1977	124.91	60.91	48.8	67.22	73.67	109.6
1978	130.28	40.28	30.9	146.14	41.57	28.4
1979	154.84	64.84	41.9	141.67	83.31	58.8
1980	166.50	91.50	55.0	142.11	90.57	63.7
1981	241.72	28.12	11.6	162.06	56.67	34.9
1982	304.84	26.79	8.8	287.41	92.26	32.1
1983	355.03	26.18	7.4	352.39	87.84	24.9
1984	418.73	397.35	94.9	532.77	101.15	19.0
1985	528.53	141.05	26.7	597.34	86.90	14.5
Total	2482.38	907.14	36.5	2545.90	830.72	32.6

Source : BSB and BSRS

The Future

A major restructuring of both the DFIs is said to be in the offing. Already the Parliament has approved the amendment of relevant laws allowing sale of shares to the public of both the DFIs. They have also been granted more autonomy. It is learnt that BSRS may go off the stage of industrial financing and its functions will be limited to advisory services and rehabilitation of the sick projects financed by it. Private investment companies are also now operating although it is too early to assess their performance. Government is understood to have approved the establishment of a private sector Bank for financing small scale industries. Atleast one, if not more, institution is also financing small industries and this institution has been jointly established by the Government of Bangladesh and Saudi Arabia. It is learnt that more such institutions may in future be established in the public sector. In addition, as has already been stated, NCBs and BKB are already providing finance to the same sector.

With such development as these funding of projects does not seem to be a problem. The problem lies in keeping the projects viable so as to ensure desired returns on investment.

REFERENCES

1. Diamond William : Development Banks, A World Bank Publication, The John Hopkins University Press, Baltimore and London, 1975.
2. Credit Inquiry Commission (Abdul Qadir, Chairman) : Government of Pakistan, 1959.
3. World Bank : Bangladesh : Revent Economic Developments and Medium Term Projects, Report No. 6049, 1986.

Annex—1
Sanction, Commitment, Disbursement and Recovery Position of Bangladesh Shilpa Bank during FY 1972 to FY 1985

(Amount in Million Taka)

YEARS	Sanction			Commitment			Disbursement			Recovery		
	Amount			Amount			Amount			Amount		
	Private	Public	Total	Private	Public	Total	Private	Public	Total	Private	Public	Total
1972-73	6.9	9.9	16.8	5.0	5.4	10.4	4.9	3.0	7.9	—	—	24.0
1973-74	8.9	66.9	75.8	6.2	12.7	18.9	2.9	5.3	8.2	—	—	45.8
1974-75	44.1	223.8	267.9	8.6	63.8	92.4	11.5	23.8	35.3	46.0	14.7	60.7
Sub-Total	59.9	300.6	360.5	39.8	81.9	121.7	19.3	32.1	51.4			130.5
1975-76	58.8	6.2	65.0	16.9	3.4	20.3	31.7	56.1	87.8	28.5	33.0	61.5
1976-77	179.4	24.8	204.2	69.1	27.9	97.0	41.5	3.0	44.5	24.2	65.9	90.1
1977-78	345.2	53.1	398.3	263.2	—	263.2	98.6	17.1	115.7	34.5	109.9	144.4
1978-79	493.7	8.2	501.9	363.9	8.7	372.6	279 9	1.3	281.2	50.8	79.3	130.1
1979-80	1025.8	66.2	1092.0	471.1	—	471.1	344.8	6.9	351.7	56.4	270.4	326.8
1980-81	1589.4	—	1589.4	902.9	—	902.9	522.3	1.2	523.5	102.4	214.6	317.0
1981-82	1092.9	—	1092.9	687.7	—	687.7	645.8	—	645.8	171.9	169.4	341.3
Sub-Total	4785.2	158.5	4943.7	2774.8	40.0	2814.8	1964.6	85.6	2050.2	468.7	942.5	1411.2
1982-83	89.7	—	89.7	484.9	—	484.9	621.7	—	621.7	175.0	112.2	287.2
1983-84	224.6	—	224.6	287.9	—	287.9	369.4	—	369.4	277.2	63.2	340.4
1984-85	662.7	—	662.7	195.7	—	195.7	288.1	—	288.1	298.5	68.4	366.9
1985-86	991.1	—	991.1	259.9	—	259.9	122.3	—	122.3	385.2	32.0	417.2
Sub-Total	1968.1	—	1968.1	1228.4	—	1228.4	1401.5	—	1401.5	1135.9	275.8	1411.7
G. Total	6813.12	459.1	7272.3	4043.0	121.9	4164.9	3385.4	117.7	3503.1	1650.6	1233.0	2953.5

Source : BSB

Annex—2
Sanction, Commitment, Disbursement and Recovery Position of Bangladesh Shilpa Rin Sangstha during FY 1972 to FY 1985

(Amount in Million Taka)

YEARS	Sanction			Commitment			Disbursement			Recovery		
	Amount			Amount			Amount			Amount		
	Private	Public	Total	Private	Public	Total	Private	Public	Total	Private	Public	Total
1972-73	0.3	47.3	47.6	—	21.2	21.2	—	12.2	12.2	0.6	11.9	12.5
1973-74	15.1	6.9	22.0	1.7	21.1	22.8	0.9	21.8	22.7	3.7	13.3	17.0
1974-75	28.1	9.3	37.4	31.2	8.6	39.8	2.9	16.1	19.0	6.3	20.0	26.3
Sub-Total	43.5	63.5	107.0	32.9	50.9	83.8	3.8	50.1	53.9	10.6	45.2	55.8
1975-76	84.8	103.7	188.5	50.1	74.6	124.7	10.7	1.7	12.4	7.2	53.3	60.5
1976-77	285.1	13.5	298.6	67.1	55.4	122.5	39.2	10.2	49.4	9.2	132.3	141.5
1977-78	375.3	68.4	443.7	681.4	8.5	689.9	35.1	74.5	109.6	7.4	87.7	95.1
1978-79	464.4	8.3	474.7	358.4	62.0	420.4	125.2	92.8	218.0	12.7	79.4	92.1
1979-80	1280.0	—	1280.0	585.3	—	585.3	487.7	—	487.7	22.5	386.6	409.1
1980-81	1624.2	23.2	1647.4	855.1	—	855.1	580.0	2.1	582.1	50.3	366.6	416.9
1981-82	97.4	—	97.4	307.6	23.2	330.8	337.1	—	337.1	61.7	272.4	334.1
Sub-Total	4211.2	217.1	4428.3	2905.0	223.7	3128.7	1615.0	181.3	1796.3	1710.0	1378.3	1549.3
1982-83	270.0	41.1	311.1	199.1	—	199.1	469.4	—	469.4	85.4	154.0	239.4
1983-84	1272.6	15.6	1288.2	355.5	53.3	408.8	421.0	2.8	423.8	147.7	127.4	275.1
1984-85	153.4	15.6	169.0	68.8	15.5	84.3	191.2	6.3	197.5	141.2	120.0	261.2
1985-86	126.9	—	126.9	59.4	—	59.4	90.8	—	90.8	207.6	136.3	343.9
Sub-Total	1822.9	72.3	1895.2	682.8	68.8	751.6	1172.4	9.1	1181.5	581.9	537.7	1119.6
G. Total :	6077.6	352.9	6430.5	3620.7	343.4	3964.1	2791.2	240.5	3031.7	663.5	1961.2	2724.7

Source : Resume of Activities of the Financial Institutions in Bangladesh, Ministry of Finance, GOB, 1985-86

Annex—3
Outstanding Loans and Advances and Overdues of Private and Public Sector of BSB during FY 1972 to FY 1985

(Figure in Million Taka)

As on	Outstanding loans and advances			Overdues		
	Private Sector	Public Sector	Total	Private Sector	Public Sector	Total
June 30, 1973	—	—	772.8	—	—	273.7
June 30, 1974	—	—	811.7	—	—	372.2
June 30, 1975	—	—	1081.9	—	—	488.2
June 30, 1976	234.2	998.0	1232.2	103.2	529.0	1632.2
June 30, 1977	288.0	955.5	1243.5	106.8	138.7	245.5
June 30, 1978	425.4	960.8	1386.2	157.4	82.5	239.9
June 30, 1979	719.1	786.7	1705.8	174.7	167.9	342.6
June 30, 1980	1144.2	879.5	2023.7	260.7	116.7	377.4
June 30, 1981	1705.5	770.5	2476.0	361.8	91.2	453.0
June 30, 1982	2644.0	680.5	3324.5	624.7	94.5	799.2
June 30, 1983	3655.5	662.0	4317.5	991.7	168.4	1168.1
June 30, 1984	4683.5	269.3	4952.8	1522.0	94.0	1616.0
June 30, 1985	5476.2	197.8	5674.0	2120.8	77.3	2198.1
June 30, 1986	5985.2	122.1	6107.3	2627.5	45.9	2673.4

Source : BSB

Annex—4
Outstanding Loans and Advances and Overdues of Private and Public Sector of BSRS during FY 1972 to FY 1985

(Figure in Million Taka)

As on	Outstanding loans and advances			Overdues		
	Private Sector	Public Sector	Total	Private Sector	Public Sector	Total
June 30, 1973	65.6	612.6	678.2	34.3	220.7	255.0
June 30, 1974	59.2	619.4	678.6	39.8	291.1	330.9
June 30, 1975	93.7	995.0	1088.7	65.0	726.6	791.6
June 30, 1976	104.7	1126.3	1231.0	84.0	316.4	400.4
June 30, 1977	195.1	1212.6	1407.7	121.0	234.2	355.2
June 30, 1978	231.4	1288.5	1519.9	169.8	274.6	444.4
June 30, 1979	363.3	1359.3	1722.6	215.5	552.2	767.7
June 30, 1980	851.0	1184.7	2035.7	275.1	473.5	748.6
June 30, 1981	1443.7	1008.0	2451.7	484.9	395.1	880.0
June 30, 1982	1918.6	919.9	2838.5	897.6	330.3	1227.9
June 30, 1983	3454.3	814.6	4268.9	1435.4	366.5	1801.9
June 30, 1984	4458.0	736.9	5194.9	2102.7	407.5	2510.2
June 30, 1985	5359.5	859.0	6218.5	3162.8	565.9	3728.7
June 30, 1986	6338.5	733.1	7071.6	4108.5	531.8	4640.3

Source : BSRS

Role of Commercial Banks in Economic Development Bangladesh Experience

MOHAMMAD HOSSAIN *

The story of commercial banking dates back to the sixteenth century. "The Bank of St. George at Genoa, and other banks founded in imitation of it, were at first only companies to make loans to, and float loans for, the government of the cities in which they were formed" [1;77]. Another purpose which necessitated an institution like banking was to remedy the inconveniences in transaction in foreign trade. The Bank of Venice, Genoa, Amsterdam etc, had all been originally established with this view. In Engiland, the Bank of England was established in 1609 to facilitate foreign trade financing specially dealing with foreign bills of exchange. Contrary to common notion the function of receiving deposit by the banks was a much later development. In most countries deposit banking came much later than the other functions of the bank. For about a century and a half note issue occupied foremost important function of the banks. Deposit banking followed note issue gradually and slowly. "Probably upto 1830 in England, or thereabouts, the main profit of banks was derived from the circulation, and for many years after that the deposits were treated as very minor matters, and the whole of so-called banking discussion turned on question of circulation" [1;83]. But with the development of trade and commerce and the emerging necessity for shortterm financing both nationally and internationally, banks needed the resources for lending and consequently borrowing and lending surpassed all other activities of the banks, specially after the withdrawl of the power of issue of notes by the banks. That is how the concept of financial intermediation developed. In the eighteenth and the nineteenth centuries the City of London became the centre of world financing and till today it remains so and not in a diminutive form inspite of the advent of the great money markets in Newyork and Tokyo. It was said at one time that any national can borrow any amount of money from the City at any time but at a cost.

* Director-General, Bangladesh Management Development Centre The views expressed in this article are the author's own.

English commercial banks were thus and till today are pre-dominently the provider of short-term capital to trade and business. The direct link of banking with economic development was not thus obvious in the English banking system. One reason for this is that at the time the Industrial Revolution started in England, it had already accumulated capital from agriculture and trade and with the development of industries from the surplus of industries. The scenerio has been largely different in the continent where the nations were late-starters in modern economic development which required long-term capitals. The German and French banks, therefore, had a different orientation than the English banks. Though they also dealt primarily with short-term credits, they provided capital on a long-term basis also on a roll-over mechanism of the short-term capital and as a result, the banks in the continent became a powerful instrument in the development of industrial enterprises and had a great influence on them. "A German Bank", as the saying went, "accompanied and industrial enterprise from the cradle to the grave" [2;14].

Upto the early fifties of the present century the main function of banks was supplying a cheap means of payment and to some extent, mobilising savings. The most important of the responsibilities of the banks in proper allocation of economic resources and in optimising the financial services was not obvious till the fifties when a spurt of research activities ensured on the concept of financial development and its relations with economic growth.

Financial Development and Economic Growth

Financial Development of an economy can be gauged by the identification and analysis of its financial structure over time. The financial structure comprises and inventory of the stock of various financial assets in the economy and how they are commanded by the various financial institutions. Since financial structure is a composite concept it has to be represented by some surrogate indicators which have been developed by Goldsmith in the late sixties [3]. The important among the indicators are the following :

1. Financial Interrelations Ratio:

$$= \frac{\text{Ratio of the value of Financial Assets outstanding}}{\text{Value of Tangible Assets.}}$$

2. $$\frac{\text{Financial Assets}}{\text{GNP}}$$

$$= \frac{\text{Financial Assets}}{\text{National Wealth}} \times \frac{\text{Capital}}{\text{GNP}}$$

$$= \text{FIR} \times \text{Capital output ratio}$$

3. Financial Intermediation Ratio

$$= \frac{\text{Financial Assets held by Financial Institutions}}{\text{All Finanacial Assets.}}$$

4. New Issues Ratio

$$= \frac{\text{Increase in Assets of Financial Institutions}}{\text{GNP}}$$

5. Monetisation Ratio

$$= \frac{\text{Total money stock}}{\text{GNP}}$$

By definition, financial interrelations ratio is an indicator of the financial development of an economy. It will be greater in value the higher the nation's financial development. The financial Intermediation ratio measures the participation of the financial institutions in financial development. "This ratio reflects the degree of institutionalisation of borrowing and lending and the importance of indirect finance which is greater the higher is this ratio."[4;26] The new issues Ratio measures the additional financial stock created/owned by the financial institutions each year or in a period of time. Goldsmith has studied the financial history of many countries over the past 150-200 years. His findings can be summarised in broadest terms as follows:

(1) The financial interrelations ratio (financial assets: national wealth) rises with a country's economic growth. In other words, the financial structure grows faster than national wealth (and than national product).

(2) Financial development starts with the banking system and depends especially on the diffusion of scriptural money, which the banking system provides. As a corollary, the ratio of money (and of each of its components, coins, notes, deposits) to national wealth first increases with growth but eventually levels off or declines.

(3) As countries become highly developed, the share of the banking system in the assets of the financial sector declines, while that of newer and more specialized institutions- such as building societies, life insurance companies, retirement funds and finance companies- increases. Thus in advanced economies the financial assets of the banking system are of lesser value than the financial assets held by all other financial institutions, whreas the reverse is true in economically underdeveloped countries.

(4) Over long periods, there has been in most countries a rough but unmistakable parallel between economic growth and financial development. But the direction of cause and effect in this obvious association is not clearly established.

Role of Commercial Banks

Commercial banking system has played a vital role in financial development in Bangladesh since independence specially in view of the fact that the emergence of other financial institutions had to take time and they have not been able to take dominent role in the financial sector except in providing term-financing for industries. Table-1 gives the basic statistics of commercial banks in Bangladesh between 1975-85.

Table-1

Basic Statistics of Commercial Banks (1975-85).

	House hold (000)			No. of branches			No. of Accounts dps. (000)			Deposit in in crore			Advance in crore		
Year	Urban	Rural	Total	Urban	Rural	Total	Urban	Rural	Total	Urban	Rural	Total	Urban	Rural	Total
1975	1846	11341	13187	762	648	1410	2687	1204	3891	871	147	1016	553	144	697
1976	1882	11561	13443	833	743	1576	3015	1352	4367	1074	182	1256	657	172	829
1977	1956	11743	13699	917	949	1866	3466	1554	5020	1305	221	1526	916	240	1155
1978	1991	11964	13955	1030	1505	2535	3890	1886	5776	1612	289	1901	1166	305	1471
1979	2027	12184	14211	1144	1822	2966	4278	2238	6516	2000	361	2361	1504	393	1897
1980	2032	12435	14467	1231	2103	3334	4534	2612	7246	2420	487	2907	1939	507	2446
1981	2042	12743	14785	1373	2323	3696	5035	3054	8089	2785	594	3379	2288	596	2886
1982	2077	12964	15041	1416	2303	3799	5252	3422	8674	3163	710	3373	3023	791	3814
1983	2113	13184	15297	1422	2412	3834	5736	4011	9747	4218	997	5215	3225	843	4069
1984	2151	13425	15576	1432	2455	3887	6477	4858	11335	5743	1420	7171	4339	1135	5474
1985	2126	13646	15832	1131	2247	3376	6246	4685	10931	6003	1492	7495	4637	1226	5913

Source : Bangladesh Bureau of Statistics : Statistical Year Book of Bangladesh.
Asian Development Bank: Report of Asian Development Bank, February, 1984
Bangladesh Bank: Scheduled Bank statistics Oct.,Dec. 1984.
Bangladesh Bank: Bangladesh Bank Bulletin, May, 1986.

Right from independence the commercial banking system has become the center-piece of the financial structure of Bangladesh and the development of the system over the years has been remarkable.

In 1976, the Central Bank directed that Commercial Banks must open rural branches as a vecessary conkition for opening new urban branches, and this was fixed at 3 new rural branches for every urban branch. Subsquently, the central Bank allotted exclusive Unions for the operation of Special Agriculture Credit programme by each Bank. These policies resulted in a growth impetus of financial infranstructure throughout the country.

From Table-2, we trace the dominant results of this deliberate effort to reach the benefits of financial services to the rural economy.

Table-2

Financial Development in Rural & Urban Sector, 1976-83.

	Rural		Urban		Growth, 1976-83	
	1976	1983	1976	1983	Rural	Urban
NCBs						
— Nr. of Branches	743	2,287	833	1,419	17.42	7.91
— Deposits (Tk.Milln)	1,045	6,454	9,496	30,044	29.71	17.89
Advances (Tk.Milln)	99	4,050	6,825	31,161	69.93	24.23
Spl. Financial Instns.						
— Nr of Branches	85	729	74	101	35.93	4.54
— Deposits (Tk. Milln)	18	620	318	2,041	65.80	30.42
— Advances (Tk. Milln)	230	4,023	1,740	6,748	49.77	21.36

Source : ADB : Domestic Resource Mobilisation through Financial Development in Bangladesh Feb, 1984.

The growth of financial services in the rural sector is indeed remarkable as compared to the urban sector.

When we reflect that the emergence of private banks is a recent phenomenon and with strong urbanbias and that the foreign banks operate only in urban areas, then it becomes apparent that the phenomenal growth of rural banking has been mainly the contribution of the Nationalised Commercial Banks (NCB) and Bangladesh Krishi Bank (BKB).

Our examination of Table-3 only emphasises the catalytic role of the NCBs in financial development of the country. Thus, the growth rate of the NCBs vis-a-vis Specialised Financial Institutions in expanding branch network in spectacularly high; in 1976-83 period the total

Table-3

Assets of Financial Institutions (1974-85).

(Tk. in Crore)

Bank	Group	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985
1.	Central Bank	318.00 (11.95)	568.85 (16.67)	696.81 (18.29)	667.84 (14.06)	798.20 (14.05)	1241.85 (16.08)	1559.83 (16.50)	1885.86 (16.89)	2544.93 (17.81)	2740.31 (14.55)	2882.88 (10.69)	3753.02 (10.18)
2.	N C Bs	1975.27 (74.23)	1407.83 (70.56)	2660.11 (69.84)	3508.29 (73.84)	4106.07 (72.30)	5465.67 (70.76)	6602.21 69.85)	7430.59 (66.55)	9289.86 (65.03)	12388.89 (65.76)	15928.83 (59.07)	20640.77 (56.01)
3.	Specialised Banks	203.06 (7.63)	245.89 (7.20)	281.14 (7.38)	341.74 (7.19)	426.30 (7.51)	534.29 (6.92)	695.50 (7.36)	875.14 (7.84)	1187.39 (8.32)	1556.86 (8.26)	3014.87 (11.18)	4425.00 (12.01)
4.	Domestic Pvt. Banks	—	—	—	—	—	—	—	—	—	803.55 (4.26)	3370.75 (12.50)	5969.66 (16.20)
5.	Foreign Banks	164.85 (6.19)	189.91 (5.57)	170.90 (4.49)	233.04 (4.91)	348.92 (6.14)	482.33 (6.24)	595.03 (6.29)	974.26 (8.72)	1263.32 (8.84)	1349.88 (7.17)	1767.33 (6.56)	2066.34 (5.60)
	Total all Banks	2661.18	3412.48	3808.94	4750.92	5679.49	7724.14	9452.57	11165.85	14285.50	18839.49	26964.66 (100)	36854.79 (100)
6.	Total Commercial Banks	2140.12 (80.41)	2597.74 (76.12)	2831.01 (74.32)	3741.33 (78.74)	4454.99 (78.43)	5948.00 (77.00)	7197.24 (76.14)	8404.85 (75.27)	10553.18 (73.87)	14542.32 (77.19)	21066.91 (78.12)	28676.77 (77.81)

Source : Bangladesh Bank : Bangladesh Bank Buletin— June & July, 1986.
Note : Figures in parenthesis indicates percentage of total for all banks.

Table-3A
Growth Rate of Assets (1975-85).

Bank Group	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985
Central Bank	79	22	—4	20	59	26	21	35	8	5	30
NCB's	22	10	32	17	33	21	13	25	33	29	30
Specialised Banks	21	14	22	25	25	30	26	36	31	94	47
Domestic Private Banks	—	—	—	—	—	—	—	—	—	319	77
Foreign Banks	15	—10	36	50	38	23	64	30	07	31	17
Total	28	12	25	20	36	22	18	28	32	43	37

number of branches of NCBs grew from 1576 to 3706 recording an average growth rate of above 30%. During the same period, the rural branches increased at an average rate of 17.42% against 7.91% of the urban branches. Similarly, there was a very high rate of growth of rural deposits which had an average growth rate of 29.71% against 17.89% in urban areas. There was a really momentous growth in rural advances of 69.93% against 24.23% in urban areas. The phenomenal rise in rural advances was brought about by the massive disbursement of credit during 1983 and 1984.

Rural operations, however, continue to be a very small fraction of the total financial operations despite the fact that rural branches have grown from 49% in 1976 to 67% in 1983 for all banks. The rural deposits have changed from 10% (1977) to (1983) and rural advances from 4% (1976) to 18% (1983) in this period. Both ratios are far below the share of the Rural population in national income and call for serious attention.

Growth of Assets of Commercial Banks.

The growth of assets of the commercial sector is an indicator of the financial development of an economy. From table 3 and 3(A) we find that growth rate of assets of the financial institutions achieved an impressive record during the period from 1976-85. From table-4 we find that the assets of all Banks and financial institutions (excep BSRS and the two insurance corporations) grew at a compound annual rate of 25.51% in 1976-80 period and 34.79% in 1981-85 period; for the entire 10 year period (1976-85) the assets of the banks grew at a compound annual rate of 28.68%. In the 10 year period this growth is around twice as much as the growth of GDP.

Banks & financial institutions thus came to play an increasingly vital rote in the Bangladesh economy. Since the growth level of assets of banks and financial institutions was above the price level, the financial development has been ahead of economic development of the country. This would go to indicate that the financial superstructure of the economy is fully capable to assume a greater role in economic development, and that the real growth failed to keep pace with the financial growth.

Of the financial institutions, the nationalised commercial banks hold 56.01% of the total assets and it is obvious that the impressive growth rate of the financial sector had been caused mostly by the activities of these commercial banks. In their case, the growth rate of the assets has been 26.27% 35.91% & 29.34% in the 1976-80, 1981-85 and 1976-85 respectively.

Table 4
Growth Pattern of the Financial Institutions.

Parameter	Period		
	1976-80 (%)	1981-85 (%)	1976-85 (%)
1. Change of GDP	16.63%	14.37	15.68
2. Change of Assets			
a) Central Bank	22.32	18.77	20.57
b) NCBs	25.52	29.10	25.57
c) Specialised Banks	25.42	49.95	35.83
d) Domestic private Banks	—	—	172.56
e) Foreign Banks	36.60	20.68	31.91
3. Total for all Banks	25.51	34.79	28.68
4. Total for Commercial Banks	26.27	35.91	29.34

Note : The growth rate of assets of domestic private banks is calculated for 1983-85 period.

Among commercial banks, again, the nationalised commercial banks played the most important role in as much as that their share of the total assets in 1985 has been 56.01%; the share in 1976 was much higher being around 69.84%. Over the years the nationalised commercial banks lost 13.83% of the share in the total assets of financial institutions mainly due to the emergence of the domestice private banks in 1984, which rapidly increased strength and acquired a total asset of Tk. 5969 crores as in 1985 - i.e. in 2 years only.

Financial Development & Commercial Banks in Bangladesh Financial Intermediation.

We may try to work out the financial intermediation ratio of the commercial banking sector, to find out their services as development agents.

$$\text{Financial Intermediation Ratio of commercial banks} = \frac{\text{Financial assets held by commercial banks}}{\text{All financial assets.}}$$

$$\text{FIR for 1974} = \frac{2140}{2661} = 0.80$$

$$\text{FIR for 1985} = \frac{28676}{36854} = 0.78$$

The movement of financial intermediation ratio from 0.80 in 1974 to 0.78 in 1985 is significant. It points out that the role of commercial banks is gradually diminishing in favour of the specialised financial institutions. This is quite in keeping with the experience of other countries in financial development. At the early stage of economic development, the commercial banks have to act as the prime mover of financial development because of the absence of specialised institutions. But as the economy gets financially organised gradually, the services of specialised financing become necessary and the commercial banks act as catalysis to the development of such institutions. Ultimately the commercial banks yields its place of major actor in the economy to the specialised financial institutions, which are logically developed for providing sophisticated and specialised financial services to the economy.

New Issues Ratio

Another indicator of financial development is the new issues ratio which is :

$$\text{New Issues Ratio of financial institution} = \frac{\text{Increase in financial institution's assets}}{\text{GNP}}$$

Table-5 gives the new issues ratio of our financial institutions between 1976 & 85. It is seen that the new issues ratio of the commercial banks has improved from 3.69% in 1975 to 20.24% in 1985. The new issues ratio is gradually improving but not by any specticular degree.

In the case of the nationalised commercial banks the new issues ratio of 3.49% in 1975 had risen upto 12.53% in 1985 (an increase by about 400%) as compared to 3.69% and 20.24% respectively for all commercial banks, (an increase by about

Table-5

New Issue Ratios of Financial Institutions (1975-85)

Bank Group	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985
1. Central Bank	2.02	1.26	-	1.06	3.25	1.69	1.48	2.62	0.72	0.43	2.21
2. NCBs	3.49	2.49	8.51	4.85	9.95	6.06	2.40	7.40	11.35	10.69	12.53
3. Specialised Banks	0.35	0.35	0.61	0.69	0.79	0.86	0.82	1.24	1.35	4.40	3.75
4. Domestic Pvt. Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	0.32	7.75	6.91
5. Foreign Banks	0.20	-	0.62	0.94	0.98	0.60	1.73	1.15	0.32	1.26	0.80
Total all Banks	6.06	3.91	9.45	7.53	14.96	9.21	7.79	12.41	16.68	24.54	26.30
Total Commercial Banks	3.69	2.30	9.14	5.79	10.93	6.66	5.49	8.55	14.61	19.71	20.24

Source : Bangladesh Bank

548%. The specialised banks recorded new issue ratio of 3.75% in 1985 from 0.35% in 1975. Since this increase is from a very low base, this development is not yet significantly important.

The new Issues ratio in Bangladesh is, however, still very low. In India, the new Issues ratio of all financial institutions was as high as 32.7 in 1950 and rose to 49.7 in 1960. In the case of Bangladesh it rose from 6 in 1975 to 26 in 1985, The no doubt is a substantial growth of 433%, But even them this compares poorly with the Indian attainment.

Commercial Bank Credit

The composition and movement of assets of financial institutions in Bangladesh has so far been discussed in general. Since the commercial banking system commands the lion's share of these assets till today, we now make an attempt to anlyse the growth and composition of assets of the system. Table-6 gives the composition of assets of all banks on three dates : on 31st December '76, 31st December '80 and 31st December '85. the following pattern of the change and growth in the assets is discernible :—

(1) The most important feature which immediately attracts our attention is the reduction in cash holdings of the banks from 5.4% in 1976 to 3.76% in 1985 which bears a testimony to the increasing motivation of the commercial banks in fully utilising their resources in earning assets. This has also been possible due to liberal refinancing of agricultural loans by the Central Bank.

(2) Addvances still form the major portion of the assets of the commercial banks; this is more so when we consider that under the classification 'others', there are hidden advances of export and import financing. This type of asets (i.e. others) started at a very high percentage of 63.30% and it has increased to 64.79% in 1985. The share, however, fell in 1980 mainly because during that year due to economic depression throughout the world, import and export financing substantially plummeted.

(3) Assets in the form of investment have been steadily deteriorating from 1976 till 1985 and onwards. Considering the fact that the share of advances has also declined one should come to the conclusion that the commercial banks have developed an abhorance in holding assets in investment. This is too obvious because of the non-availability of reliable and good-yielding private financial assets and the very low yield of treasury bills. To improve this position, the government should offer a variety of financial instruments to attract investment by commercial banks, otherwise, banks will be tempted to utilise their funds in quick money-making in export-import financing. This, ofcourse, does not

Table-6

Composition of Bank Assets in 1976, 80 & 85.

	Cash in hand and at Banks			Advances			Investments			Others			Total		
	1976	1980	1985	1976	1980	1985	1976	1980	1985	1976	1980	1985	1976	1980	1985
Total for Commercial Banks	155.10	367.47	1078.54	880.00	2558.20	7289.95	278.39	579.30	1729.51	1517.52	3692.27	18578.77	2831.01	7197.24	28676.77
(a)	(5.48)	(5.11)	(3.76)	31.08)	(35.54)	(25.42)	(9.84)	(8.05)	(6.03)	(53.60)	(51.30)	(64.79)	(100.00)	(100.00)	(100.00)
(b)	(96.84)	(93.56)	(90.48)	(74.49)	(72.27)	(66.03)	(60.11)	(60.93)	(77.42)	(75.72)	(80.81)	(82.98)	(74.33)	(76.14)	(77.81)
Total of all Banks	160.16	392.77	1192.00	1181.39	3539.77	11040.68	463.14	950.84	2233.95	2004.25	4569.19	22388.15	3808.94	9452.57	36854.79
(c)	(4.20)	(4.16)	(3.23)	(31.02)	(37.45)	(29.96)	(12.16)	(10.06)	(6.06)	(52.62)	(48.33)	(60.75)	(100.00)	(100.00)	(100.00)
	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)

Note : (a) and (c) : Figure in parenthesis indicates % of the total assets.
(b) : Figure in parenthesis indicates % of Comercial Bank's share against the total of the particular group of Assets.
Source Bangladesh Bank : Bangladesh Bank Bulletin, July, 1986.

mean that such type of financing is not necessary but aims at indicating that such financing should be economised so that there is no leakage of bank resources by diversion to uneconomic purposes. It is a common belief that in export financing, in our eagerness to boost up export, we have allowed exporters, specially the jute exporters, superfluous funds susceptible to diversion.

(4) When we analyse the share of commercial banks' assets vis-a-vis the assets of all banks, we find that the commercial banks held about 74% of the advances and 60% investment in 1976. Though the share of advances declined to 66% investment in 1985, share of investment rose to 77% in that year. A part of this latter phenomenon is explained by the compulsory purchace of government securities by commercial banks for maintaining their statutory reserves for their deposits.

Composition of Credit of Commercial Banks by Economic Purpose

Between 1976 and 85, the growth of assets occured at 24.40% compared to the change of GDP at 15.68%. From tables 7 and 7 (A) the main change in the distribution of assets has been in the increase of agricultural sector advances which increased from 8.92% (1976) to 22.07% (1983) and 28.55% (1985) while modern sector advances (including manufacturing, mining, construction & essential services) have decreased from 49.02% (1976) to 42.52% (1983) and 25.90% (1985). Trade & transport sector has varied from 33.40% (1976) to 25.09% (1983) and to 38.85% (1985).

In this relatively short period, Bangladesh banking system thus changed from a pattern common in underdeveloped countries of emulating an industrial-led growth strategy, to a defined emphasis on agriculture-led growth strategy. This has been made possible by the rapid expansion of rural banking.

Composition of Advances by Accounts

The importan transformation created by banks is evidenced by the composition of account holders in 1984 and 85 agriculture accounted for 87.20% and 88.34% of the total loan accounts as compared to 4.18% (1984) and 3.74% (1985) accounted by the modern sector, and 3.54% (1984) and 3.52% (1985) by the trade and transport sector. No doubt, the modern sector (25.9%) and the trade transport sector (38.85%) claimed the major chunk of the bank credit in 1985 as compared to agriculture (28.55%), but the significant feature is that much larger and backward agriculture economy has been drawn into a modern financial system. For the period 1976-85 growth in account operations has been

Table-7

Classification of Advances by Sectors (Dec' 1976 to Dec' 1983)

(Taka in Crores)

Sl. No.	Sectors	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Agriculture, Hunting, Forestry and Fishing.	95.98 (8.92)	157.25 (10.85)	244.55 (13.49)	395.34 (16.64)	536.04 (17.58)	725.65 (19.54)	974.37 (19.66)	1276.21 (22.07)
2.	Mining and Quarrying	1.93 (0.18)	0.77 (0.05)	0.32 (0.02)	47.59 (2.00)	58.53 (1.92)	29.19 (0.79)	190.69 (3.85)	442.25 (7.34)
3.	Manufacturing	516.32 (48.00)	699.02 (42.03)	733.05 (40.43)	919.56 (38.70)	1251.66 (41.04)	1610.37 (43.36)	2209.84 (44.59)	1901.76 (32.90)
4.	Construction	7.63 (0.71)	13.07 (0.90)	17.76 (0.98)	24.70 (1.04)	39.06 (1.28)	69.05 (1.86)	78.78 (1.59)	109.44 (1.89)
5.	Electricity, Gas, Water & Sanitary Services	1.45 (0.13)	4.97 (0.35)	9.27 (0.51)	21.85 (0.92)	16.04 (0.52)	47.06 (1.26)	37.98 (0.77)	22.32 (0.39)
6.	Whosesale & Retail Trade and Restaurants & Hotels	316.81 (29.46)	429.95 (29.68)	496.00 (27.36)	596.81 (25.12)	779.35 (25.55)	754.57 (20.32)	911.29 (18.39)	1251.69 (21.65)

7.	Financing Insurance, Real Estate & Business Services	17.66 (1.65)	43.34 (2.99)	42.56 (2.35)	138.21 (5.82)	78.92 (2.59)	96.39 (2.60)	107.95 (2.18)	152.48 (2.64)
8.	Transport, Storage & Communication	42.37 (3.94)	70.32 (4.85)	82.18 (4.53)	97.32 (4.10)	113.44 (3.72)	137.72 (3.71)	150.92 (3.04)	198.90 (3.44)
9.	Community, Social & Personal Services	50.80 (4.73)	68.27 (4.71)	84.01 (4.63)	95.96 (4.04)	122.10 (4.00)	181.21 (4.88)	216.84 (4.38)	300.02 (5.19)
10.	Employees & activities not adequately described	24.53 (2.28)	51.96 (3.59)	103.39 (5.70)	38.57 (1.62)	54.80 (1.80)	62.39 (1.60)	77.19 (1.55)	144.18 (2.49)
	Total	1075.48 (100.00)	1448.92 (100.00)	1813.09 (100.00)	2375.91 (100.00)	3049.94 (100.00)	3713.60 (100.00)	4955.85 (100.00)	5781.25 (100.00)

Source : Bangladesh Bank : Scheduled Bank Statistics.
Note : Figure in parenthesis indicates % of total.

Table-7(A)

Advances Classified by Economic Purpose (1984-85)

(Tk. in Crore)

		1984		1985	
	Economic Purposes	No. of Account	Amount	No of Account	Amount
1.	Agriculture, Fishing and Forestry	56,02,003 (87.20)	2318.23 (28.22)	58,15,236 (88.34)	2897.72 (28.35)
2.	Mining and Quarrying	24,933 (0.39)	31.51 (0.38)	11,615 (0.18)	27.82 (0.27)
3.	Industry (other than working capital financing)	2,08,749 (3.25)	1712.05 (20.84)	2,08,744 (3.17)	2298.70 (22.65)
4.	Construction	27,596 (0.43)	180.13 (2.19)	23,228 (0.35)	223.38 (2.30)
5.	Electricity, Gas, & Sanitary Services	7,197 (0.11)	62.59 (0.76)	2,315 (0.04)	69.49 (0.68)
6.	Transport, Storage and Communication	23,489 (0.37)	191.40 (2.33)	19,632 (0.30)	220.96 (2.19)
7.	Trade	2,03,497 (3.17)	3031.67 (36.91)	2,12,034 (3.22)	3720.80 (36.66)
8.	Financial institutions (Exciuding Schedule Banks)	8,006 (0.12)	21.11 (0.26)	15,232 (0.23)	35.45 (0.35)
9.	Working Capital Financial	13,029 (0.20)	281.76 (3.43)	20,729 (0.31)	324.98 (3.20)
10.	Miscellanouse Services	3,05,894 (4.76)	384.03 (4.68)	2,54,340 (3,86)	319.57 (3.15)
	Total :	64,24,393 (100)	8214.50 (100)	65,83,105 (100)	10148.87 (100)

Source : Bangladesh Bank : Scheduled Banks statistics.
Note : Figures in parenthesis indicates percentage of total.

11.58% in the urban sector compared to 14.81% in the rural sector; and 28.18% in the urban sector compared to 24.39% in the rural sector has been growth in bank advances.

Advances by Size of Accounts

In Agriculture, advances very normally from Tk. 500 to Tk. 50,000 from table B, we find that over the period 1977-84, the small accounts (Tk. 500- Tk. 999) has decreased from 63.63% to 17.07%, while that of medium accounts (Tk. 1000- Tk. 9999) increased from 33.49% to 77.52 and large accounts (Tk. 10000- Tk. 49999) have grown from 1.78% to 4.06%. This lands support to the notion that banks are becoming more discriminatory in extending rural credits requires careful attention.

At the other end of the spectrum in the modern and trade sectors which normally have account sizes above Tk. 50,000, we find that over 1977-84 the number of Accounts have grown from 1.10% to 1.33% but advances have shrunk from 84.65% to 72.32%. This is due to the re-orientation of the banking system towards agriculture, and is a prominent manifestation of a growing internalisation of the economic.

Public Sector vs Private Sector

After 1975, banks were asked to promote the private sector shall now examine the major trends obtained is this respect. From Table-9 and 9 (A) we see that bank advances to the public-sector has decreased from 62.18% (1976) to 47.19% (1980) and then to 22.27% (1985); while corresponding for the private sector advances increased form 37.82% (1976) to 52.81% (1980) and then to 77.73% (1985). The compound growth rate for 1976-80 is 20.02% (public) and 39.79% (private); for 1980-85 it is 9.17% (public) and 37.82% (private).

It becomes obvious that more financial assets have been created for the private sector as compared to the public sector. If we examine the compound growth rate over 1976-85, we find private advances grew at 39.17% while public advances grew at 14.61% while the total financial sector advances gerw at 28.46% Such a draw-down of financial assets have not seen commensurate with the sectoral contibutions to GDP. This therefore, calls for better financial discipline and credit management as otherwise commercial banks would help create infaltionary conditions.

Rural Sector vs Urban Sector

As we mentioned earlier that since 1976, rural orientation emerged as a major feature, it will be of interest to examine the bank performance over 1977-84. period from table 10, we find that the rural branches gerw at 14.54% while urban branches grew at 7.49%; rural accounts grew at 15.86% while urban accounts grew at 26.08%; rural advances gerw at 44.57% while to urban advances grew at 24.24%. This confirms our earlier observation that banks have achieved a significant transformation of the rural financial market in a remarkably short time.

Table-8
Advances Distributed by Size of Accounts

Size of A/C. By Taka	No.of Accounts		Amount (Tk.000)		Average Am. (Tk.000)		Percentage Breakup of A/Cs and Amount			
		of					% No. of A/C.		% of Amount	
	1977	1984	1977	1984	1977	1984	1977	1984	1977	1984
500-999	10,32,262	10,96,424	686339	2669638	0.66	2.43	63.63	17.07	4.74	3.25
100-9999	5,43,373	49,79,929	920926	14553848	1.59	2.92	33.49	77.52	6.36	17.71
10000-24999	20,864	1,82,129	330825	2897632	15.86	15.91	1.29	2.83	2.29	3.53
25000-49999	8,010	79,164	284418	2624411	35.51	33.15	0.49	1.23	1.96	3.19
50000-99999	7,634	33,345	528035	2287906	69.17	68.61	0.17	0.52	3.64	2.79
Above 100,000	10,162	53,402	11738551	57111592	155.14	1069.47	0.63	0.83	81.01	69.53
Total	16,22,305	64,24,393	14489094	82145027	8.33	12.79	100.00	100.00	100.00	100.00

Source : Bangladesh Bank : Scheduled Banks Statistics.

Table-9
Sector-Wise Position of Advances as on 30th June of 1977, 1980, 1981 and 1985.

(In crore Taka)

Sectors	1976	1980	1981	1985
Public	583.15 (62.18)	1210.04 (47.19)	1400.56 (42.12)	1989.69 (22.27)
Private	354.65 (37.82)	1354.41 (52.81)	1924.64 (57.88)	6943.49 (77.73)
Total	937.80 (100.00)	2564.45 (100.00)	3325.20 (100.00)	8933.18 (100.00)

Source : Bangladesh Bank : Bangladesh Bank Bulletin July 1986
Figures in parenthesis indicate % of total.

Table-9A
Growth Rate of Sector-Wise Advances (Periodic).

Sectors	1976-1980	1981-1985	1976-1985
Public	20.02%	9.17%	14.61%
Private	39.79%	37.82%	39.17%
Total	28.59%	28.03%	28.46%

Source : Bangladesh Bank : Bangladesh Bank Bulletin, July, 1986.

It will be of interest to compare here the contributions of the banks to this rural transformation. Quite obviously, private banks and foreign banks have no contribution; so that only the NCBs and the specialised banks (mainly BKB and marginally Bangladesh Samabay Bank Limited) are the major actors. The compound growth rate over 1977-84 for all banks is 21.81% for accounts and 54.14% for advances, while the corresponding figures for the nationalised commercial banks are 15.86% and 44.57% respectively. It becomes evident that the NCBs carried the lions share of rural uplift in this period.

Table-10
Schedule Banks : Advances, Branches, Accounts.

Bank Group	Branch		Accounts		Advances (Tk.)		Branches (1984)		Accounts (1984)		Advances (1984)	
	1977	1984	1977	1984	1977	1984	Rural	Urban	Rural	Urben	Rural	Urban
NCB's	2366	3887	6,79,913	34,03,618	1155,81,36	5473,72,66	2455	1432	27,94,194	6,09,424	1134,66,35	4339,06,31
Private Bank	—	67	—	8,429	—	414,34,11	—	67	5	8,424	70,20	413,63,91
Foreign Bank	20	21	1,247	3,098	59,81,29	411,69,12	—	21	—	3,098	—	411,69,12
Specialised Bank	206	949	9,41,145	30,09,248	233,28,29	1914,74,38	846	103	25,01,817	5,07,431	987,90,12	926,84,26
Total All Banks	2592	4924	16,22,305	64,24,393	1448,90,94	8214,50,27	3301	1623	52,96,016	11,28,377	2123,26,67	6091,23,60
							(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
Growth rate		9.61%		2173%		28.13%	13.01%	4.53%	21.81%	21.30%	54.14%	24.07%
Totalfor Comm, Bank	2386	3975	6,81,160	34,15,145	1215,62,65	6299,75,89	2455	1520	27,94,199	6,20,946	1135,36,55	5164,39,34
Growth rate		7.57%		25.90%		26.50%	10.52%	3.85%	15.86%	26.08%	44.57%	24.24%

Source Bangladesh Bank : Scheduled Banks Statistics.

Note :
i) As ratio of rural branches (1402) of 1977
ii) As ratio of urban branches (1190) of 1977
iii) As ratio of urban accounts (1330290) of 1977
iv) As ratio of urban accounts (292015) of 1977
v) As ratio of rural advances Tk. 102.72 crore of 1977
vi) As ratio of urban advances Tk. 1346.19 crore of 1977

Mobilisation of Deposits by Commercial Banks

In developing countries, household savings dominate the total savings pattern. It has also been established econometrically that household savings display a marked preference for investments in financial Assets through banks relative to investments in securities and debenture. This therefore highlights the importance of commercial banking in mobilising deposit funds for development. We shall try to identify the major trends in Bangladesh over 1975-1985 in this respect.

(a) Private Deposit vs. Public Deposit

From table 11, we can test the growth of the banking culture in Bangladesh by testing the behaviour of private funds. Thus, private deposit grew from Tk. 749 crores (55%) of the total in 1976 to Tk 7504 crores (72% of the total) in 1985 the corresponding figures for the public deposits were Tk 625 crores (45% of the total) and Tk. 2912 crores (28% of the total) in 1985. The growth as a whole was indicative of financial deepening

(b) Growth of Deposits

From table-12, we find that the compound growth rate for 1976-85 period higher for private funds (29.18%) as compared to public funds (18.66%) and overall growht of the financial sector (25.24%). This would confirm our observation on FIR, that capital deepening may be related to the spread of commercial banking into the rural areas.

Table-11

Year-wise/Sector-wise/Category-wise Deposit as on 31st December of the years from 1975-1985.

(Taka in Crore)

Types/ Category		1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985
FDR												
(a)	Public	:	163.15	176.35	207.89	301.19	276.98	332.58	428.18	636.69	1009.60	1183.95
(b)	Private	:	134.62	205.13	281.09	363.94	509.21	784.30	1004.14	1511.58	2335.10	2811.93
	Sub-Total	:	297.77	381.48	488.98	665.13	786.19	1116.88	1432.32	2148.27	3344.70	3995.88
SAVINGS :												
(a)	Public	:	18.58	20.42	23.32	36.87	38.07	162.00	59.40	67.75	73.84	79.61
(b)	Private	:	288.05	363.54	477.22	584.24	743.95	911.71	968.18	1302.51	1729.34	2181.93
	Sub-Total	:	306.63	383.96	500.54	621.11	782.02	1073.71	1027.58	1370.26	1803.18	2261.54
CURRENT :												
(a)	Public	:	157.17	165.15	210.58	191.71	230.86	254.54	326.66	411.77	406.22	424.03
(b)	Private	:	213.01	293.97	372.78	440.95	518.30	558.56	637.95	916.14	1228.25	1477.48
	Sub-Total	:	370.18	459.12	583.36	632.66	749.16	813.10	964.61	1327.91	1634.47	1901.51
OTHERS :												
(a)	Public	:	285.67	317.12	339.88	423.75	623.37	515.71	614.10	831.01	1244.97	1224.18
(b)	Private	:	113.31	145.24	203.68	317.12	309.47	332.65	420.75	596.15	883.15	1032.33
	Sub-Total	:	398.98	462.36	543.36	740.87	932.84	848.36	1034.85	1427.16	2128.12	2256.51
Total :	Public	:	624.57	679.04	781.67	953.52	1169.28	1264.83	1428.34	1947.21	2734.63	2911.77
	Private	:	748.99	1007.88	1334.77	1706.25	2080.93	2587.22	3031.02	4326.39	6175.84	7503.67
	Grand Total	:	1373.56	1686.92	2116.44	2659.77	3250.21	3852.05	4459.36	6273.60	8910.47	10415.44

Source : Bangladesh Bank : Scheduled Bank Statistics.

Table-12
Growth Rate of Sector Wise Deposit of The Financial Institutions (Preiodically).

Sector	76-80 (%)	81-85 (%)	76-85 (%)
Public	16.97	23.18	18.66
Private	29.11	30.50	29.18
Total	24.03	28.23	25.24

Source : Bangladesh Bank

Composition of Deposits

The changing share of demand, fixed and savings deposits is partially a reflection of the opportunity cost of the different economic sectors who deposit their monies in financial institutions. However, growth of investments in financial assets without commensurate increase in investment opportunities outside the financial sector can only carry risks of depreciation of worth.

From Table-13, we find that the share in total deposits of small depositors (Tk. 500- 10,000) have shrunk from 35.31% (1977) to 20.23% (1984) whereas the share of large depositors (above Tk. 50,000/0 has increased from 52.12% to 63.98% in the same period. This is a cause for serious concern and needs careful attention by both the banks and the planners.

Rural Deposit vs. Urban Deposit.

From Table-14, it is interesting to note that rural deposits has grown at 32.59% compared to 25.81% at which urban deposits and 21.95% at which the financial sector as a whole grew. This can be directly ascribed to the greater participation of commercial banks in the rural economy.

However, Rural deposits must be canalised carefully in to rural investment, otherwise the undesired economic phenomenon of migration of rural capital can defeat the very purpose of spreading rural banking.

Table-13.
Deposits Distributed by Size of Accounts

Size of A/C. By Tk.	No. of Accounts		Amount (Tk.000)		Average Am. (Tk.000)		Percentage Breakup of A/Cs and Amount			
							No. of A/C		% of Amount	
	1977	1984	1977	1984	1977	1984	1977	1984	1977	1984
500-999	33,51,688	22,73,876	19,03,397	26,41,919	0.57	1.16	62.84	17.57	11.28	2.96
1000-9999	18,47,388	97,93,005	40,54,179	153,89,270	2.19	1.57	34.63	75.73	24.03	17.27
10000-24999	83,294	4,56,523	13,12,684	71,60,749	15.76	15.69	1.56	3.53	7.78	8.04
2500-49999	23,830	1,97,687	8,08,018	69,07,894	33.91	34.94	30.45	1.53	4.39	4.75
50000-99999	12,618	1,21,003	8,74,636	82,43,698	69.32	68.18	0.24	0.94	5.19	9.26
Above 1,00,000	15,202	90,688	79,16,330	487,61,139	520.74	537.68	0.28	0.70	46.93	54.72
Total	53,34,020	129,35,782	168,69,244	891,04,669	3.16	6.89	100	100	100	100

Source : Bangladesh Bank : Scheduled Banks Statistics.

Table-14

Scheduled Banks : Deposits, Branches, Accounts.

(in crore of taka)

	Branch		Accounts		Deposits (Tk.)		Branch (1984)		Accounts (1984)		Deposits (1984)	
Bank Group	1977(Dec)	1984(Dec)	1977(Dec)	1984(Dec)	1977(Dec)	1984(Dec)	Rural	Vrban	Rural	Urban	Rural	Urban
NCBs	2366	3887	50,19,664	113,35,671	1525.60	7170.69	2455	1432	48,58,183	64,77,488	1427.75	5742.94
Private	—	67	—	1,19,459	—	701.62	—	67	—	1,19,459	—	701.62
Foreign	20	21	56,286	87,243	102.25	566.17	—	21	—	87,243	—	566.17
Specialised	206	949	2,58,070	13,93,409	59.08	471.98	846	103	10,58,487	3,34,922	174.74	297.24
Total all Banks	2592	4924	53,34,020	1,29,35,782	1686.93	8910.46	3301	1623	59,16,670	70,19,112	1602.49	7307.97
Growth rate		9.61%		13.49%		26.84	(I) 13.01%	(II) 4.53%	(III) 20.19%	(IV) 9.57%	(V) 32.59%	(VI) 25.81%
Total for Commercial Banks	2386	3975	50,75,950	1,15,42,373	1627.85	8438.48	2455	1520	48,58,183	66,84,190	1427.75	7010.73
Growth rate		7.57%		12.45%		26.50%	10.52%	3.85	17.68%	9.59%	30.55%	25.79%

Surce: Bangladesh Bank : Scheduled Banks statistics.

Note :
(I) As ratio of rural branches (1402) of 1977
(II) As ratio of urban branches (1190) of 1977
(III) As ratio of rural accounts (1633075) 1977
(IV) As ratio of urban accounts (3700945) of 1977
(V) As ratio of rural deposits Tk. 222.49 cr. of 1977
(VI) As ratio of urban deposits Tk. 1464.44 cr. of 1977

Performance of Banks.

From Table-14, we find that the NCBs are sitll the major actors in deposit banking. The decline in their share of total deposits from 90% (Tk. 1526 crores) in 1977 to 80% (Tk. 7171 crores) in 1984, corresponds to the growth of private banks and specialised financial institutions. This is an expected phenomenon as pointed out erlier. The deposits of the foreign banks remained unchanged at 6% of the total in this period.

REFERENCES

1. Bagehot Walter: Lombard Street, John Murray, London, 1920.
2. Gerschenkron Alexander: Economic Backwardness in Historical Perspective, University Press, Harvard-Cambridge, 1963.
3. Goldsmith Raymond W.: Financial Structure and Development, Yale University Press, New Haven, 1969.
4. Drake P.J.: Money, Finance and Development.

Public Enterprises and the Financial System in Bangladesh

MUHIUDDIN KHAN ALAMGIR*

Public enterprises are (i) units of production and economic management outside the formal structure of the government but (ii) effectively owned and controlled by it (iii) for producing public or public interest goods for public or private consumption (iv) in conformity with public policies[1]. This definition follows the classification of public enterprises as followed in the IMF, Government Finance Statistics and the UN System of National Accounts. As per the latest count there are at present in Bangladesh 392 autonomous bodies and enterprises including on-going-projects. Following the aforesaid definition, excluding public regulatory bodies, and non-profit making organisations, but including public utilities operated as government departments, as of now, there are 281 public enterprises in the country [3;Appendix-1]. All these have been listed in annex-'A' .Of these 18 are financial public enterprises[2], which leave for 263 nonfinancial public enterprises (NFPEs) whose functional relationship with the former as constituents of the country's financial system is outlined in this paper.

Atleast 3 relevant features of these public enterprises in Bangladesh may be noted at the outset. First, in comparison with the 70s, their number in the 80s has been reduced. Following recommendations of the Committee for Re-organisation of Public Statutory Corporations and adoption of the New Industrial Policy, in 1982, the role of public enterprises in Bangladesh was rationalised and their number reduced [5,6]. Out of a total of 155 corporations set up in the 70s, 13 were abolished, 30 were amalgamated into 12 and 21 were reorganised

---

* Member, Directing Staff, Bangladesh Public Administration Training Centre. The views expressed in this paper are the author's personal ones which do not necessarily reflect the views of the organisation with which he is associated. The figures quoted in this paper are of September'86. There have been some marginal changes since then.

1. In Bangladesh context this definition of public enterprises is substantially accepted in all relevant discourses. See for instance [1,2].

2. For a working definition of financial public enterprises please see [4].

[7;1-27]. The New Industrial Policy, 82, opened up private investment in all industrial sectors except 6, namely arms and ammunition, atomic energy, tele-communication, air transport, generation and distribution of electricity and mechanised forestry. This policy adopted private enterprise as the main conduit for industrial development and provided for transfer of nationalised jute and cotton textile mills to their local owners. Under the policy of privatisation pursued since 1976 between then and 1986, altogether 371 public sector industrial enterprises were denationalised and disinvested[3]. The policy towards privatisation was further emphasised and corresponding limitation imposed on the private sector operation in the Industrial Policy, 1986 [9].

Second, these public enterprises operate in usual fields of socio-economic operation covering infrastructure, basic manufacture, large and essential trade and management of abandoned industrial and commercial units. In comparison with India and Pakistan, the coverage, except in terms of manufacture of jute and other textiles has been neither more nor intense. Of 263 NFPEs listed in annex-'A', 185 operate in manufacture, 3 in power, gas and water, 11 in transport, storage and communication and 20 in trade. In 1984-85, these NFPEs were estimated to have accounted for not more than 3.21% of GDP. In the value added by manufacturing in the same year, the share of NFPEs was 18%; in trade 9.42%; in transport, storage & communication 4.5%; only in power, gas and water the share of NFPEs in the sectoral GDP exceeded 80%[4]. Despite occassional complaints, in Bangladesh today NFPEs do not occupy the 'commanding heights' of the economy; nor in comparison with the private enterprises operating in the rest of the economy they can be called or summed up as grotesque, awkward and fumbling giants.

And finally, in relation to the Banks, the specialised financial institutions and the insurance companies, both public and private, these NFPEs, in comparison with private enterprises have not been provided with any avenue for special or preferential treatment. For those NFPEs set up or takenover and operated as companies with limited liabilities, in comparison with the companies with limited liabilities under the private enterprise, the rights and obligations as prescribed under the Company's Act, 1913, are the same. For others, set up under special laws, no

---

3. Source : Government of Bangladesh : Ministry of Industries. For an outline of the nationalisation measures in the 70s and the privatisation measures undertaken by the Government in early 80s, see [8].

4. These are author's estimates, based on figures for value added calculated for 87% of assets of all corporate NFPEs as computed in [15].

preferential treatment from the banks, the specialised financial institutions and the insurance companies have been given. NFPEs set up under these special laws[5] have been given authority to borrow on long term or raise long term loans from the market or banks with prior approval of the government; for short term borrowing of working capital no such prior approval is needed, and no preferential treatment in relation to the companies under the private enterprise has been provided or stipulated.

II

The financial system of Bangladesh, as of now, in its core, consists of the Bangladesh Bank as the central bank, 4 nationalised commercial banks, 3 specialised banks, 8 private commercial banks, 7 foreign banks, traditional co-operative banks under the Bangladesh Samabaya Bank Ltd. (BSBL) and co-operative associations (operating in part as saving and loan associations) under the Bangladesh Rural Development Board. There are, in addition, related financial institutions like the Bangladesh Shilpa Rin Sangstha (BSRS), Investment Corporation of Bangladesh (ICB), House Building Finance Corporation (HBFC), Post Office Savings Banks, insurance corporations in-the public sector and insurance companies, investment finance and leasing companies, in the private sector all of which together with the aforesaid banks, the Dhaka Stock Exchange and the informal money market constitute the financial system.

The informal money market includes money lenders, friends, relatives, shopkeepers and self-financing accounts: it essentially operates on patron-client relationship uncovered and unsubstituted by institutions of a formal money market or banks and financial institutions. Despite non-availability of precise information, the volume of transactions in the informal market is believed to be high and the rate of interest usurious [10]. NFPEs do not have any direct relation with this market. Indirectly some of them informally combining thier logistic suppport with extension of target group orinented credit from the Grameen Bank, the Bangladesh Krishi Bank and the nationalised commercial banks, contribute to contain the exploitation and polarisation inherent in the informal sector. In this, very marginally NFPEs come to substitute the ills of pristine and distorted market place and 'poverty of opportunity' with the benefits of modernity, state intervention and public enterprise. The

5. Examples of these special laws are: (1) The Industrial Enterprises (Nationalisation) Order, 1972 (2) Bangladesh Water & Power Development Boards Order, 1972 (3) Bangladesh Biman Ordinance, 1972 (4) Trading Corporation of Bangladesh Order, 1972 (5) The Insurance Corporations Act, 1973.

Dhaka Stock Exchange, (DSE) the only one of the country- is still at a nascent stage of development. As of now, only 79 public limited companies are listed with DSE[6]. Of these only 5 are public enterprises, in as much as more than 50% of the stock is owned by the government.[7] None of the public enterprises under the Bangladesh Jute Mills Corporation (BJMC) and the Bangladesh Textile Mills Corporation (BTMC) is listed in DSE and none of the projects undertaken by the sector corporations in ADP for 1986-87 aims at raising capital through public issue. The taking over of all shares and proprietory interests of the nationalised enterprises by the government and the relevant sector corporation on behalf of the government instead of enterprises each as seperate legal entities as provided for in the Industrial Enterprises (Nationalisation) Order, 1972 stand on the way of and funding balancing, modernisation, rehabilitation and expansion (BMREs) of these through allocations made in ADP discourage, raising of capital from the market and participation of these NFPEs in DSE.

As of now, in the field of insurance, 2 public enterprises, namely, the Sadharan Bima Corporation dealing with all general insurance and the Jiban Bima Corporation dealing with life insurance businesses are operating in Bangladesh. The Sadharan Bima Corporation was set up in '73 under a special law as the sole institution to deal with general insurance business of the country[8]. Effective July, 1985, following the policy of privatisation, insurance business was opened up for the private sector. As of now, 6 private general insurance companies are operating in the country[9]. All these private general insurance companies have to reinsure with or through the Sadharan Bima Corporation. Besides, insurance coverage of public properties[10] to be taken by public sector agencies are to be taken with the Sadharan Bima Corporation. Excepting this, the sphere of operation of private general insurance companies and

---

6. Source : Dhaka Stock Exchange Ltd : The figure is of August 13, 1986.
7. These are, Investment Corporation of Bangladesh, National Tea Company Ltd (extent of government ownership 51%), Burma Eastern Ltd (extent of government ownership 50.35%), Eastern Lubricants (government ownership 65%) and Bangladesh Shipping Corporation (extent of government ownership 87%).
8. The Insurance Corporations Act, 1973.
9. Namely, (i) People's Insurance Company Ltd, (ii) United Insurance Co. Ltd., (iii)Bangladesh Co-operative Insurance Society Ltd., (iv) Bangladesh General Insurance Co. Ltd. (v) Green Delta Insurance Co. Ltd. and (vi) Progoti General Insurance Co. Ltd. The figure is for September '86.
10. Public properties are those belonging or protected by the government or a local authority or a public enterprise or a project funded out of external aid or loan till such project commences production. See, Government of Bangladesh, Ministry of Law, The Insurance Corporation (Amendment) Ordinance, 1984, S-23.

the Sadharan Bima Corporation is the one and the same. In comparison with other general insurance companies, the Sadharan Bima Corporation has, however, one distinct advantage : all sums assured by its policies are guaranteed as to their payment by the government[11]. In 1973, the Jiban Bima Corporation was set up as a public enterprise by nationalising and merging all existing local private life insurance companies. Only one private insurance company, being distinctly foreign[12] was allowed to operate in the country. Following opening up of the insurance business to the private sector in 1985, only one private company[13] has, till date, come to operate in this field. Neither by specific legal provisions nor by administrative instructions, the personnel of the public sector are required or enjoined to prefer the Jiban Bima Corporation to the private life insurance companies. An in-built advantage, however, has been given to the Jiban Bima Corporation in as much as all policies issued by it are guaranteed by the government[14].

At present there are 3 investment companies[15], and 1 leasing company[16] operating outside the public sector. All these are registered as public limited companies under the Company's Act. 1913. A private sector investment company set up without any specific agreement with the government (as in case of IPDC & SABINCO) is required to have atleast Tk. 150 million as authorised and Tk. 100 million as paid up capital. It cannot accept deposits. It is allowed to borrow, home and abroad upto 20 times its equity (capital + reserves). Borrowing from abroad, however, is subject to prior approval of the government. Till now their investment has been minuscle and invariably in the private sector projects.

The Bangladesh House Building Finance Corporation was set up in 1972 under a special law with an authorised capital of Tk. 100 million subscribable by the government. As of now, with a paid up capital of Tk.

---

11. Vide Bangladesh Parliament: The Insurance Corporations Act, 1973, S-24.
12. Namely, the American Express Life Insurance Co. Ltd.
13. Namely, the National Life Insurance Co. Ltd.
14. Bangladesh Parliament : The Insurance Corporations Act, 1973, S-24.
15. Namely, the Saudi Bangladesh Agricultural Industrial Investment Co. (SABINCO), the Investment Promotion and Development Co. (IPDC) and the National Credit Ltd. SABINCO is jointly owned by the Government of Bangladesh (50%) and the Government of the Kingdom of Saudi Arabia (50%). IFC, CDC, DEG and Industrial Promotion Services (Switzerland) collaborated as co-owners with the Government of Bangladesh in setting up IPDC. The Government of Bangladesh owns 30% of the total share of IPDC. The National Credit Ltd is a public limited company under full ownership of the private sector.
16. Namely, the Industrial Development Leasing Company of Bangladesh Ltd. BSB & BSRS are authorised under their respective charters to undertake lease financing. Till date they have not done so.

983 million, it is operating through 5 zonal and 14 regional offices providing long term credit for construction and remodelling of residential houses and apartments in cities, towns and upazila headquarters and rural areas. Between 1972 and 1985, HBFC sanctioned Tk. 7885.6 million to build/remodel 67222 housing units [11;198]. Almost none of these units was built for the public sector.

The Post Office Savings Bank in Bangladesh operates as a constituent of the Directorate General of Bangladesh Post Office. Annual net depostis (total deposites— total withdrawals and interests payments) accrue to the government as its income. In March 1985 outstanding balance deposits in the post office savings bank figured at Tk. 786.5 million [12;58-9]. The Post Office Savings Bank does not lend; as its net annual depostis is a component of the general income stream of the government, it cannot directly be linked to the process of funding NFPEs.

The Grameen Bank (GB) was set up in September, 1983, under the Grameen Bank Ordinance, 1983 with the specific objective to provide credit with or without collateral to landless persons for all types of economic activities including housing but excluding business in foreign exchanges transaction. The GB has an authorised capital of 100 million of which till December, 1985 Tk. 30 million has been paid up. The government owns 60% of the paid up shares while the rest 40% is owned by the borrowers i.e. landless persons. Till March, 1986, the bank covered 4053 villages in 5 greater districts, provided collateral free loans of Tk. 1056.8 milllion to 159127 landless people including 105134 women. The rate of recovery amounted to almost 98% [11;140-1]. The GB obviously does not have any direct relation or dealings with NFPEs.

The Bangladesh Krishi Bank (BKB) was established in 1973 under a special law[17] to provide credit to the agricultural sector. Of its authorised capital of Tk. 500 million, as of September '86, Tk. 376.1 million has been fully paid up by the government. With a network of 992 branches it covers all upazilas of the country. It provides short term credit for crops and term loans for acquisition of irrigation equipment, setting up of agro-based industries as well as undertaking productive schemes in fields of agriculture, pisci-culture and poultry and livestock raising. In 1984-85, BKB disbursed Tk. 6147.3 million to over 1 million borrowers. Of the amount advanced 58.81% was short term, 40.71% medium term and 10.48% long term. Excepting a very marginal involvement in respect of funding a public sector tea producing and blending company[18], all

17. The Bangladesh Krishi Bank Order, 1973. BKB has since been bifurcated with the setting up of the Rajshahi Krishi Bank covering the northern regions.
18. Namely, National Tea Company.

advances of BKB are for private sector activities and individual enterprises.

At present, mainly two types of co-operatives are operating in Bangladesh. Of these, the traditional component is a 3-tier system with Banglaeesh Samabaya Bank Ltd (BSBL) at the apex, the central co-operative banks (67) the sugarcane growers' societies (12) and the land mortgage bank (20) etc. at the intermediate level and the primary co-operatives at the village level. In 1985-86, the BSBL's paid up capital amounted to Tk. 27.26 million (authorised capital being Tk. 100 million), deposits Tk. 24 million and disbursed credit Tk. 181 million. The rate of recovery of BSBL's loans and advances is 21%[19]. The modern component is the 2-tier system of co-operatives consisting of upazila central co-operative associations and krishi samabaya samities operating under the Bangladesh Rural Development Board. Apart from a very small amount of deposits and shares of the co-operatives, all these co-operatives operate on borrowed funds; the BSBL system is refinanced by the Bangladesh Bank upto 90% of its programme while, the co-operatives of the BRDB system is supported by the Sonali Bank. In 1984-85, the Banlgadesh Bank refinanced Tk. 281 million to the BSBL to support the laters credit programme. In the same year the Sonali Bank refinanced Tk. 593.8 million to the BRDB Co-operatives. In addition to the aforesaid main-stream co-operatives 8 commercial co-operative banks are also operating in the country. These Banks are not included in the schedule of supervision of the Bangladesh Bank Needless to mention, the mainstream co-operatives as well as the commercial co-operative banks in their financial transactions do not have any transaction/relation with NFPEs.

At present 7 foreign banks (private) with 21 branches are operating in Bangladesh[20]. They do not have any branch in the rural areas. They are all required to comply with the provisions of the Banking Companies Ordinance, 1962, the Bangladesh Bank Order, 1972 and other relevant laws of the land. A foreign bank is (i) expected to syndicate loans from the international money markets for the Bangladesh Bank or the government; (ii) finance foreign exchange component of public sector projects; (iii) support funding of private sector projects on pay-as-you-earn basis; (iv) fund export and support foreign investment in production for export; (v) attract foreign investment in energy sector;

---

19. Source, BSBL.

20. These are (i) Grindlays Bank PLC, (ii) Standard and Chartered PLC, (iii) Bank of Credit and Commerce International (Overseas) Ltd. (iv) The American Express International Banking Corporation, (v) Habib Bank Ltd., (vi) State Bank of India and (vii) Indo-Suez Bank Ltd.

(vi) arrange export credit from overseas institutions for import of capital goods into Bangladesh and (vii) provide technical service to the private sector in formulation and appraisal of projects. Till now except in case of setting up a security printing press under the sponsorship of the Bangladesh Bank, these foreign banks did not fund any project in the public sector In 1985, the foreign banks accounted for 6.12% of all bank deposits and 5.08% of all bank advances. As on June 30, 1986, 47.74% of all advances made by the foreign banks was in trade, and 29.30% in industry (other than working capital); and 11.2% in industry and commerce given in the form of working capital[21]

All banks excluding non-Pakistani foreign banks were nationalised in 1972. In 1988 following the principle of privatisation the government allowed setting up and operation of local private banks. Following disinvestment of 2 nationalised banks, namely the Uttara Bank Ltd. and the Pubali Bank Ltd, as of now including the afforesaid 2 there are 8 private banks operating in this country [22]. At the end- June 1985, the private banks operated with 632 branches, had Tk. 16455.4 million of deposits and provided Tk. 10983.7 million as loans and advances. Except the Uttara Bank Ltd. and the Pubali Bank Ltd. none of the private banks has programme for giving agricultural credit. And with possible marginal exception of these 2 private banks and that too as spillovers from the nationalised period, none of the private banks have any dealing with NFPEs. Their advances and investment are limited to the private sector and that too in trade, which at end- June, 1985 accounted for over 60% of their total advances [13, Table xxxv; 98].

The Investment Corporation of Bangladesh (ICB) was set up in 1976 under a special law with an objective to encourage and broaden the base of investment, develop the capital market and mobilise savings. The authorised capital of the Corporation is Tk. 2000 million of which, till June 30, 1986, Tk. 100 million has been paid up. As of now, the government owns 27% of the shares, the Bangladesh Bank 12%, SBC 9% and BSB & BSRS 6% each and the commercial banks (including NCB's 15%) and private individuals own 25%. In pursuance of its objectives, ICB underwrites public issue, provides bridge finance, co-ordinates a consortium of banks and financial institutions in giving equity support to industrial projects/companies, maintains investors' accounts for buying and selling corporate securities, manages mutul funds and issues unit certificates. In 1985-86 it committed equity capital

---

21. Source: Bangladesh Bank.
22. These are: (i) The National Bank Ltd. (ii) The City Bank Ltd. (iii) The United Commercial Bank Ltd. (iv) The IFIC Bank Ltd. (v) The Arab Bangladesh Bank Ltd. (vi) The Islami Bank Bangladesh Ltd.

and bridge loan amounitng to Tk. 61.6 million to 9 private sector projects. As of now, all its operations are geared for the private sector enterprises and individual investors.

The Banglaeesh Shilpa Rin Sangstha (BSRS) was set up by a special law in 1972 with an authorised capital of Tk. 1000 million subscribable by the government. As of now, the paid up capital is Tk. 625.40 million. Its specified objectives is to provide term loan and related financial and promotional support to industrial concerns both in the public and the private sectors. Right from the start it was saddled with quite a number of nationalised industrial enterprises. At end- 1985 BSRS had, in its port-folio, 434 projects, of which, 76 were recipients of support in terms of equity, debenture-financing and underwriting of public issue. All these 76 were private sector projects/companies. The rest 358 were recipients of term loan, the liability on account of which amounted to Tk. 5943 million at end- 1985. Of these, 41 are public sector projects, having 14.42% of the aforesaid loan liability. The private sector projects are 317 having over 85% of the loan liability[23]. As per the recent policy adopted by the government, BSRS does not go for funding newer projects. Constrained by wide spread default, estimated at over 90% in 1984-85, as of now its operation is limited to funding of BMRE of projects already in its port-folio. Given that all public sector industrial projects are funded through the Annual Development Plan (ADP) of the government, in its funding of BMRE, its operation is almost wholly limited to the private sector companies.

The Bangladesh Shilpa Bank (BSB), was established in 1972 by a special law[24] under the ownership of the government to provide term loans, equity support and other financial assistance for setting up and operating industrial projects. With a paid up capital of Tk. 1000 million, as of now it is operating as the prime development finance institution of the country. Between 1972 and 1985, it provided term loan in both local and foreign currency to the tune of Tk. 6704 million for 1057 projects. Of these only 7% was for the public sector projects; the rest 93% was for the private industries. Following the acceptance of the private sector as the main conduit for industrialisation since 1982, BSB has not funded any public sector projects. At end- June, 1986, on account of 27 public sector enterprises, BSB's overdues amounted to Tk. 45.92 million; this constituted 1.70% of the total overdues on the same date; the remaining 98.30% was on account of 931 projects of the private sector[25].

---

23. Source: BSRS. In the quoted private sector projects 33 were those disinvested from the public sector in pursuance of the policy of privatisation pursued since 1976.
24. The Bangladesh Shilpa Bank Order, 1972.
25. Source: BSB.

At present 4 nationalised commercial bank (NCBs) with a total paid up capital of Tk. 140 million are operating in the country[26]. In 1986, their branches totalled 3402, deposits Tk. 77440 million (70% total bank deposits) and advances Tk. 41710 million (57% of the total bank advances). In comparison with the private and foreign commercial banks, the NCBs have atleast 3 distinguishing features. In the first place, the NCB's have covered rural areas. As of now, of the total bank branches of the NCBs, over 67% are located in the rural areas. The corresponding figure for the private banks is 40%, and that two mainly accounted by the 2 denationalised into the private sector[27]. The foreign banks, as already mentioned, do not operate in the rural areas. Second, the NCB's fund public sector activities, while the private commercial banks do not. At present about 46% of the NCB's total advances are given to the public sector and its enterprises. And finally, following enjoinment given by the Bangladesh Bank, the NCBs have come forward to support socio-economic projects and programmes and to channel required credit to specific sectors of the country. This has been best reflected in the field of agricultural credit. As of now the NCB's provide 35% of all institutional credit to agriculture compared to about 53% by the BKB and none by the private commercial banks and the foreign banks. From this point of view, together with the specialised banks, the NCBs in Bangladesh, have contributed like the public sector financial institutions in Japan in attaining socio-economic objectives which could not be aimed at by the private banks and financial institutions [14]. Specially in extending banking service to the rural areas and supporting socio-economic programmes of the government, the role of the NCB's has been similar to though not as spectacular as in India.

The Bangladesh Bank, was set up as the central bank of the country under the Bangladesh Bank Order, 1972. The authorised capital of the bank is Tk. 30 million all of which has been paid up by the government. The Bangladesh Bank formulates monetary and credit policies, issues and manages currency, develops money market, and holds and manages the country's foreign exchange reserve. As the central bank of the country, the Bangladesh Bank acts as the Banker of and advisor to the government on monetary and economic affairs and manages the public debt. It supervises operation of all banks, and through its usual instruments of operations, controls the volume of credit and channels it to the desired sectors in required quantities. As of 1986, in its span of

---

26. Namely, the Sonali Bank, (paid up capital Tk. 40 million), the Agrani Bank (paid up capital Tk. 35 million), the Janata Bank (paid up capital Tk. 40 million), and the Rupali Bank (paid up capital Tk. 25 million). Source: [11].
27. Namely, the Uttara Bank Ltd, the Pubali Bank Ltd.

control and supervision are the country's money supply (M_1) in the order, of Tk. 45870 million, total bank deposits of Tk. 92860 million, and total bank credit of Tk. 97830 million. Of all treasury bills issued, the Bangladesh Bank alone holds about 50% [28]. In 1985-86 the Bangladesh Bank made a net profit of Tk. 2348.6 million, which was reflective of a rate of profit much higher than any commercial bank or industrial enterprise operating in the country.

III

The NFPEs (mentioned in Annex-A), collectively have some features different from those usually thrown about and popularly believed. First, the labour productivity in the NFPEs is over 3 times more than the economy as a whole. In manufacturing, NFPE's productivity is about 2 times more than that of the private sector, in trade 8 times, in transport and communication over 3 times and in power, gas and water, about 2 times. [15; 5][29] This edge of the NFPEs cannot entirely be explained in terms of thier higher capital intensity and exclusion of comparatively low productive agriculture from their operational purview. On the contrary, this has to be appreciatively assessed in view of the operation of the NFPEs as both instruments of public policy (not costed) and business ventures (costed) at the same time. Second, thier operating surplus rose by 19.3% from 1984-85 to 1985-86 and is projected to increase in 1986-87 by 34.5% annually over 1984-85.[30] Together with non-operating income, this accounted for a return of 3.7% on assets in both 1984-85 and 1985-86. This was projected to increase to 6.3% in 1986-87. These rates, higher than what have been experienced in the past, do not go to substantiate the view that public sector operation in the continuing situation results invariably in decretion of assets. And finally, as of now, NFPE's annual payments of tax and non-tax revenue to the government are sizeable enough to atleast match the public investment planned to be made therein. In 1986-87, NFPEs were expected to account for Tk. 14535 million or i.e. 32.5% of the government's total revenue income of Tk. 44685 million. This constitute 81% of the investment planned to be made in these NFPEs.

---

28. Source, Bangladesh Bank.

29. The figures of NFPE's productivities for 1984-85 covers 87% of total assets of all NFPEs as listed and are assumed to be reflective of all of the kind as of now.

30. Operating surplus is the residual profit from all productive operations, gross of financing charges, excluding non-operating income. Non-operating income is constituted of interest on deposits and other property income from outside investments. [15; 2].

In the backdrop of not a very inadequate performance and profile of NFPEs, a pertinent question centers around whether the financial system prefers funding them over the corresponding private sector enterprises. Inspite of a popular belief beefed up in part by the protagonists of the private sector, the answer emanating out of section II is obviously in the negative. On the contrary, irrefutable evidence has grown that through the financial system, savings and investible funds mobilised through NCBs and the DFIs are channelled primarily to the private sector enterprises and activities. Of total actual industrial investment in the private sector in the Second Five Year Plan period, amounting to Tk. 8975.9 million, the share of the sponsors and entrepreneurs did not amount to more than 20% [16; 3]. At end- '85, of the total bank credit of Tk. 133530 million, the private sector received over 56.5%, the government 16.7% and other public sector bodies and agencies 26.7% [11;22]. Obviously the share of 'NFPEs' was much less than 26.7%. While the long term credit from the financial system at present is invariably channelled to the private sector without much of a non-commercial considerations [17], the short term credit encouraged to flow out on social considerations is primarily earmarked for selected sectors and not public agencies or NFPEs operating there unless it is required to be so done in realising the set sectoral objectives. All instructions and advises of the Bangladesh Bank, in respect of giving advances for trading, manufacturing and exportation of jute, (for instance) are given generally irrespective of the recipient's being in the public or the private secotor; specific amounts as given at times to the 2 jute trading corporations of the public sector are based on the strength of the guarantees of the government[31].

As of now, the widespread default in respect of term loan of the DFIs, is primarily ascribable to the private sector enterprises. Of the total overdues of BSB as of June 30,1986, 98.30% was on account of private sector projects. Of the total overdues on account of term loans given by BSB to jute and textiles the two largest sectors of investment, as on 30.6.1986, the public sector units' share was 1.56% and the rest that of the private sector. On the same date ovderdues on account of the public sector projects constituted not more than 17.35% of the total overdues of BSRS. In case of ICB, the proportion of overdues ascribable to the public sector projects is much less. NCB's do not have any overdue on account

---

31. For instance, Circular letters Nos. (1) BCD (FI) 210/15, dated June 16, 1985, (2) BCD (FI) 260/16 of June 24, 1985, (3) BCD (FI) 260/17 of June 17, 1985, (4) BCD Circular No. 19 of June 24, 1985 issued by the Bangladesh Bank. Similar instructions have been issued in 1986 as well, see, BCD Circular No. 25 of August 13, 1986 of the Bangladesh Bank. Jute trade manufacture constitute by far the prime claimant of (short term) priority credit in Bangladesh.

of term loans given to the NFPEs in as much as they did not give such loan. On account of 482 industrial units disinvested into the private hands between 1972 and 1986, as of 31.7.1986, about 40% of the instalments price due was in default.[32] In case of 41 denationalised jute mills payment on account of both long term loan due to BSB and BSRS and sale price (or interest free loan to the government) has been more or less nil. Contrary to the popular belief, as now the private sector enterprises in Bangladesh, do not have a too-gratifying performance record [18,19].

This of course does not go to belittle the requirement to increase efficiency of operation of the NFPEs. Though, as of now, the private sector enterprises in Bangladesh are not necessarily more efficient than the public sector ones, the latter have not been yielding reasonably expected return on public investment made in them [20]. A more 5% increase in productivity (measured in operating revenue) of the NFPEs in 1986-87 (estimated at Tk. 73113.70 million) could yield an additional resource of Tk. 3655.60 million adequate to increase the allocation made in ADP for 1986-87 for industry by more than 51%. This seems attainable through (a) reduction in cost in terms of (i) unpadding of excess labour from the pay roll (ii) purchasing inputs from cheaper sources (iii) avoiding unneeded inventory buildup and (b) increasing gross sale receipts through (i) flexible and market based pricing of products and services and (ii) shadow pricing of social attainments enjoined upon them.[33] In addition to measures geared for improving performance of the public sector enterprises in general,[34] a close monitoring of financial management of NFPEs by the relevant DFIs and NCBs seems to be in order. Such monitoring may contribute to an identification of areas and modes of rational capital restructuring, economic inventory management and commercial and flexible pricing. Needless to say, organised efforts towards this direction thus far have not been very kind to the requirements.

One important way following which the government can use the financial system to facilitate accountable and self-reliant operation of NFPEs now seems to be effective use of the stock exchange (DSE). Following the principles of privatisation, the government/the relevant corporations may organise most of the NFPEs into public limited

---

32. Source, Government of Bangladesh, Ministry of Industries.

33. For an outline of these and other ways of increasing efficiency of public enterprises in Banlgadesh context, see, [21].

34. For an outline of these measures in a situation largely similar to Bangladesh, see [22].

companies and gradually unload shares not exceeding 49% of the total in each.[35] This way the government may mobilise surplus investible resources which may as well be invested as long term loans either directly from the government or through the relevant DFI's into the NFPEs badly needing BMRE investments. At the sametime, private shareholders' representation in the boards of directors of these companies will bring in counterveiling checks on the management of the NFPEs against contra-productive socio-political influence from outside and antagonism towards efficiency-attuned changes from inside. In the process the DSE will get a boost and a spur for extended coverage and intense operation. Such a measure suggested earlier [23;56-60]. and accepted as a component of industrial policy recently [9;Ch.VI]. awaits spelling out in details in a definite time frame.

The requirement to increase and sustain efficient operation of the financial system in relation to the NFPEs, in the current context calls for a number of policy measures. First, the non-commercial objectives enjoined upon the NCBs and the DFIs should be pursued by themselves as are being pursued now. Evaluative constraints as well as diffusion of management responsibility may stone wall taking of appropriate steps in this field if the NCBs, the DFIs, and other financial institutions are made to operate through the non-financial private and public enterprises for pursuing non-commercial objectives enjoined upon the former. Second, the NCBs', the DFIs', the private commercial banks, the foreign banks and other financial institutions should fund the non-financial private and public enterprises on commercial considerations. The foreign banks and the private banks may not be enjoined to deviate from operation based primarily on commercial considerations. Funding of non-commercial operation of the NFPEs should be left primarily with the government. In the event the government enjoins such funding by the DFIs, the NCBs and other public sector financial institutions, it will be appropriate to allow for segragation of the risk and the commercial loss for reasonable financial compensation or squaring off of accounts. Third, NFPEs should be encouraged to raise minority portion of their equities from the market in a systematic attempt to restructure capital towards comparatively lower debt-equity ratio. Correspondingly, the NCBs, the private commercial banks and the foreign banks should be enjoined by the Bangladesh Bank to gradually reduce their loans and advances to already established non-financial enterprises in both public and private sectors. This will enable de-entrenchment of vested interests towards funding of newer enterprises and spread-out of the enterpreeneurial milieu.

---

35. The latest estimate of equity investment in the public enterprises in Bangladesh is Tk. 30000 million. See, [20].

Finally, by way of sustaining confidence rather than giving warning, one has to reiterate the obvious: the development of a country is contingent on its accumulation of physical and intellectual capital and on the quality and efforts of its work force, [24;21-30]. This old truth brought into focuss by the ardent supplysiders underscoring de-regulation and personal incentives calls for acceptance of the need for creation of capacity in advance of generation of demand. In the debate on privatisation vis-a-vis government intervention that pervades the scene now in Bangladesh, the objective as thrown about by the protagonists from either side seems to be appropriation of already created productive assets as between public and private sectors. The challenge of course, lies in creating new ones and operating the old and the new with efficiency such that it can allow for continuity in creation. Intervention of the government in the economy, operation of public enterprises, the role of the private sector and of the profit motive and the support from the financial system all have to be planned, reviewed, fine-tuned and acted upon in a mutually reinforcing frame to meet this challenge.

Annex—'A'

PUBLIC ENTERPRISES OF BANGLADESH

Bangladesh Forest Industries Development Corporation

1. Karnaphuli Valley Timber Extraction, Kaptai
2. Expanded Rubber Planting, Processing Project, Dhaka
3. Lumber Processing Complex and Saw Mill
4. Industrial Estate, Kaptai
5. Sangoo-Matamuhuri Projects, Chittagong
6. FIDCO Furniture Complex, Chittagong
7. Cabinet Manufacturing Plant, Dhaka
8. Cabniet Manufacturing Plant, Chittagong
9. Cabinet Manufacturing Plant, Khulna
10. Particle Board & Veneering Plant
11. Wood Treating Plant, Chittagong
12. Wood Treating Plant-2nd Expansion, Chittagong
13. Wood Treating Plant, Khulna
14. National Tea Company Ltd.

Bangladesh Oil, Gas and Minerals Corporation

15. Takerghat Limestone Mining Project
16. Bijoypur White Clay Mining Project
17. Joypurhat Limestone Mine and Cement Project
18. Jamalganj Coal Mine
19. Madhyapara Hard Rock Mining Project
20. Bagli Bazar Limestone
21. Bangladesh Gas Fields Co. Ltd.
22. Sylhet Gas Fields Ltd.
23. Amin Oil Field.
24. Kailash Tilla Gas Field Project
25. Kamta Gas Field Project
26. Bakhrabad Gas System Ltd.
27. Titas Gas Transmission and Distribution Ltd.
28. Jalalabad Gas Transmission and Distribusion System

Bangladesh Textile Mills Corporation.

29. Amin Textiles Ltd.
30. Barisal Textile
31. Bengal Textile Mills Ltd.

32. Chisty Textile Mills Ltd.
33. Dinajpur Textile
34. Darwani Textile
35. Dost Textile Mills Ltd.
36. Eagle Star Textile Mills Ltd.
37. Fine Cotton Mills Ltd.
38. Kokil Textile Mills Ltd.
39. Kohinoor Spinning Mills Ltd.
40. Kishoregonj Textile
41. Monnoo Textile
42. Madaripur Textile
43. Noakhali Textile
44. Orient Textile Mills Ltd.
45. Quaderia Textile Mills Ltd.
46. R. R. Textile Mills Ltd.
47. Rajshahi Textile
48. Rangamati Textile
49. Satrag Textile Mills Ltd.
50. Sylhet Textile
51. Tangail Cotton Mills Ltd.
52. Ahmed Bawany Textile Mills
53. Bangladesh Textile Mills Ltd.
54. Chittaranjan Cotton Mills
55. Dhaka Cotton Mills Ltd.
56. Khulna Textile Mills Ltd.
57. Luxminarayan Cotton Mills.
58. Meghna Textile
59. National Cotton Mills Ltd.
60. Olympia Textile Mills Ltd.
61. Sharmin Textile Mills Ltd.
62. Sundarban Textile
63. Zeenat Textile Mills Ltd.
64. Pylon Industries Ltd.
65. Karilin Silk Mills Ltd.
66. Valika Woolen Mills Ltd.
67. Zofine Fabrics Ltd.
68. Magura Textile Mills
69. Kurigram Textile Mills
70. Paruma Textile Mills Ltd.
71. Elahi Textile Mills Ltd.
72. Rupali Nylon Ltd.
73. N.H. Textile Mills Ltd.
74. Rahman Textile Mills Ltd.
75. Panchbibi Textile Mills
76. Hafiz Textile Mills

Bangladesh Jute Mills Corporation

77. Adamjee Jute Mills
78. Associated Bagging
79. Bangladesh Jute Mills
80. Bawa Jute Mills
81. Karim Jute Mills
82. Latif Bawany Jute Mills
83. Munwar Jute Mills
84. Mymensingh Jute Mills
85. Nabarun Jute Mills
86. Nishat Jute Mills
87. Taj Jute Backing Co.
88. U. M. C. Jute Mills
89. Bangladesh Fabrics Co.
90. Aleem Jute Mills
91. Carpeting Jute Mills
92. Crescent Jute Mills
93. Daulatpur Jute Mills
94. Eastern Jute Mills
95. Jessore Jute Industries
96. Peoples Jute Mills
97. Platinum Jubilee Jute Mills
98. Purbachal Jute Mills
99. Star Jute Mills
100. Rajshahi Jute Mills
101. Qaumi Jute Mills
102. Amin Jute Mills
103. Gul-Ahmed Jute Mills
104. Hafiz Jute Mills

105. Karnafuli Jute Mills
106. M. M. Jute Mills
107. R. R. Jute Mills
108. Bagdad-Dhaka Carpet Factory
109. Furat-Karnafuli Carpet Factory
110. Jute Plastic Plant
111. Galfra Habib

Bangladesh Sugar and Food Industries Corporation

112. Rajshahi Sugar Mills Ltd.
113. Kushtia Sugar Mills Ltd.
114. Rangpur Sugar Mills Ltd.
115. Thakurgaon Sugar Mills Ltd.
116. North Bengal Sugar Mills Ltd.
117. Carew & Co. (BD) Ltd.
118. Zeal Bangla Sugar Mills Ltd.
119. Mobarakganj Sugar Mills Ltd.
120. Shampur Sugar Mills Ltd.
121. Panchagarh Sugar Mills Ltd.
122. Kaliachapra Sugar Mills Ltd.
123. Faridpur Sugar Mills Ltd.
124. Setabganj Sugar Mills Ltd.
125. Deshbandhu Sugar Mills Ltd.
126. Joypurhat Sugar Mills Ltd.
127. Natore Sugar Mills
128. Dhaka Vegetable Oil Industries Ltd.
129. Rice Bran Oil Extract'n Plant

Bangladesh Steel and Engineering Corporation

130. Engineering Industries Ltd.
131. Eastern Cables
132. Eastern Tubes Ltd.
133. Gazi Wires Ltd.
134. General Electric Manufacturing Company Ltd.
135. Metalex Corporation Ltd.
136. Bangladesh Diesel Plant
137. Bangladesh Machine Tools Factory
138. Bangladesh Can Co. Ltd.
139. Prantik Traders
140. Quality Iron & Steel Co. Ltd.
141. Dockyard and Engineering Works Ltd.
142. Khulna Shipyard Ltd.
143. Chittagong Steel Mills Ltd.
144. Atlas Bangladesh Ltd.
145. Pragoti Industries Ltd.
146. Dhaka Steel Works Ltd.
147. National Tubes Ltd.
148. Dhaka Radio Electronic Co. Ltd.
149. Fecto Industries Ltd.

150. Meher Industries (BD) Ltd.
151. Bangladesh Cycle Industries Ltd.
152. Bangladesh Blade Factory
153. Chittagong Dry Dock & HSS and
154. Renwick, Tajneswar & Co. Ltd. and

Bangladesh Chemical Industries Corporation

155. Zia Fertilizer Co. Ltd.
156. Urea Fertilizer Factory Ltd.
157. Natural Gas Fertilizer Factory Ltd.
158. Tripple Super Phosphet Complex Ltd.
159. Khulna Newsprint Mills Ltd.
160. Karnaphuli Paper Mills Ltd.
161. North Bengal Paper Mills Ltd.
162. Sylhet Pulp and Paper Mills Ltd.
163. Karnaphuli Rayon and Chemicals Ltd.
164. Khulna Hard Board Mills Ltd.
165. Bangladesh Insulator & Sanitary Ware Factory Ltd.
166. Chhatak Cement Co. Ltd.
167. Chittagong Cement Clinker Grinding
168. Chittagong Chemical Complex
169. Usmania Glass Sheet Factory Ltd.
170. Kohinoor Chemical Co. Ltd.
171. Kohinoor Battery Manufacturing Co. Ltd.
172. Lira Industrial Enterprise Ltd.
173. Ujala Match Factory Ltd.
174. Polash Urea Fertilizer Factory
175. Dhaka Match Factory
176. Dhaka Match Works
177. Eagle Box and Carton Manufactuing Co. Ltd.

Bangladesh Fisheries Development Corporation

178. Fish Processing Scheme, Cox's Bazar
179. Boat Building Complex, Chittagong
180. Fish Net Factory, Comilla
181. Marketing and Distribution, Pagla
182. Wholesale Fish Market, Rajshahi

183. Fish Processing Plant, Mongla
184. Fish Landing and Marketing, Khepupara
185. Fish Landing and Marketing Pathagata
186. Wholesale Fish Market, Cox's Bazar
187. Fish Harbour Complex, Chittagong
188. Wholesale Fish Market, Khulna

Bangladesh Freedom Fighters' Welfare Trust

189. Paruma (E) Limited
190. Bux Rubber Co. Ltd.
191. Eastern Chemical Industries
192. Metal Packages Limited
193. United Tobacco Co. Ltd.
194. Tabani Beverage Co.
195. Mimi Chocolate Ltd.
196. Hyesons Group of Industries
197. Model Engg. Works
198. Hardeo Glass Works
199. Buxly Paints Ltd.
200. Sirco Soap and Chemical Industries Ltd.
201. Gulistan Film Corporation
202. Chow-Chin-Chow Restaurant
203. Durbar Advertising and Publication
204. Purnima Filling and Service Station
205. Electronics and Film Equipment
206. Multiple Juice Concentrate Plant

Bangladesh Parjatan Corporation

207. Duty Free Shop
208. Khulna Project (Hotel Section)
209. Ruchita Restaurant, Bar
210. Sakura Restaurant, Bar
211. Mary Anderson Restaurant
212. Chittagong Project Hotel
213. Cox's Bazar Project Hotel
214. Rangamati Project Motel
215. Rajshahi Project Hotel

216. Bogra Project
217. Sylhet Project
218. Nagarbari Project Restaurant
219. Cox's Bazar Youth Hostel
220. Bangladesh Tours and Travels

Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation

221. Bangladesh Handicraft Marketing Corporation

Bangladesh Petroleum Corporation

222. Bangladesh Petroleum Corporation
223. Burmah Eastern Limited
224. Jamuna Oil Company Ltd.
225. Meghna Petroleum Ltd.
226. Eastern Refinery Ltd.
227. Eastern Lubricant Blenders Ltd.
228. Standard Asiatic Oil Co. Ltd.
229. Asphaltic Bitumen Plant
230. Liquefied Petroleum Gas Ltd.

Board of Management of Bangladesh Government Servant's Benevolent Fund

231. Board of Management of Bangladesh Government Servant's Benevolent Fund
232. Board of Trustees, Bangladesh Government's Group Insurance Fund
233. Board of Trustees, Bangladesh Government's (Former central) Servant's Benevolent and Group Insurance Fund

Civil Aviation Authority

234. Bangladesh Services Ltd. (Hotel Sheraton)
235. Hotel Sonargaon.

Bangladesh Road Transport Corporation

236. Bus Division.
237. Truck Division.

Banks and Financial Institutions

238. Bangladesh Bank
239. Sonali Bank
240. Agrani Bank
241. Janata Bank
242. Rupali Bank
243. Bangladesh Krishi Bank
244. Grameen Bank
245. Bangladesh Shilpa Bank
246. Bangladesh Shilpa Rin Sangstha
247. Bangladesh House Building Finance Corporation
248. Investment Corporation of Bangladesh
249. Investment Advisory Centre of Bangladesh
250. Jiban Bima Corporation
251. Sadharan Bima Corporation

Miscellaneous

252. Telephone Shilpa Sangstha Ltd.
253. Bangladesh Cable Shilpa Ltd.
254. Bangladesh Power Development Board
255. Chittagong Water Supply and Sewerage Authority
256. Dhaka Water Supply and Sewerage Authority
257. Chittagong Develpoment Authority
258. Dhaka Improvement Trust
259. Khulna Development Authority
260. Rajshahi Town Development Authority
261. Dhaka Divisional Development Board
262. Rajshahi Divisional Development Board
263. Khulna Divisional Development Board
264. Chittagong Divisional Development Board
265. Chittagong Hill Tracts Development Board
266. Offshore Islands Development Board (Barisal)
267. Haor Development Board
268. Bangladesh Jute Corporation
269. Trading Corporation of Bangladesh
270. Bangladesh Consumer Supplies Company
271. Bangladesh Warehouse Corporation
272. Karnaphuli Shipping Ltd.
273. Bangladesh Shipping Corporation

274. Bangladesh Inland Water Transport Corporation
275. Chittagong Port Authority
276. Port of Chalna Authority
277. Bangladesh Biman Corporation
278. Bangladesh Railway
279. Bangladesh Telegraph and Telephone Board
280. Bangladesh Plantation Employees Provident Fund
281. Bangladesh Industrial Technical Assistance Centre

Source: Ministry of Finance: System for Autonomous Bodies Reporting and Evaluation, Government of Bangladesh, Dhaka, 1985. From the list mentioned in this document, Nowab Askari Jute Mills has since been denationalised.

Note: There are about 2 limitations that limit desktop but rigorous analysis of NFPEs of Bangladesh. The first centers around variation in coverage following variation in definitions. Even slight variation in definition within the substantive span of the relevant IMF/UN classification results in considerable change in coverage. The Autonomous Bodies Wing, Finance Division, Ministry of Finance, in a study completed on April 1, 1985, listed 259 public enterprises at operating stage [21]. Excluding the financial public enterprises from the list, the resulting number and particulars of NFPEs do not tally in all cases with that listed by the same organ of the same ministry in August, 1985 [3]. The listing made in the budget documents of the same ministry a year thereafter vary considerably in number as well as inclusion from those listed in the other documents [15]. The obvious solution to this problem lies in particularising inclusion in accordance with the definition adopted. A second limitation, however, arises at this stage in as much as secondary data broken down into the usual format of financial analysis are not available in case of all bodies that may be deemed as public enterprises.

The aforesaid list of public enterprises follows the listing as made in the system For Autonomous Bodies Reporting and Evaluation (SABRE) of the Ministry of Finance, excepting 2 subsequent changes. First, following denationalisation, Nawab Askari Jute Mills has been unlisted as NFPE. Second, names of a few supervising ministry/department/authority have been revised following revision made by the government.

REFERENCES

1. Sobhan R. and Ahmad M. : Public Enterprise in an Intermediate Regime: A study in the Political Economy of Bangladesh, BIDS, Dhaka, 1980.
2. Rab A: Need for and Constraints of Decentralisation and Accountabilility in the Public Enterprises of Bangladesh, IBA, University of Dhaka, 1985.
3. Ministry of Finance: System of Autonomous Bodies Reporting and Evaluation, Government of Bangladesh, Dhaka, 1985.
4. Report of an Expert Group Meeting in Public Enterprise: The Role of Public Enterprise Banks/Financial Institutions and their Relationship with other Public Enterprise, Vol. 4, No.1, 1983.
5. Cabinet Division: Report of the Committee for Re-organisation of Public Statutory Corporations, Government of Bangladesh, Dhaka, 1982.
6. Ministry of Industries: The New Industrial Policy, Government of Bangladesh, Dhaka, 1982.
7. Planning Commission: The Third Five Year Plan, 1985-86, Government of Bangladesh, Dhaka, 1985.
8. Chisty Md. S.H.: The Experience of Bangladesh, in ADB, Privatisation, Policies, Methods and Procedures, Manila, 1985.
9. Ministry of Industries: Industrial Policy-1986, Government of Bangladesh, Dhaka, 1986.
10. Rashid M.H.: Informal Credit and Interest Rate in an Underdeveloped Rural Economy: A case Study of Bangladesh, Unpublished Ph. D. Dissertation, Boston University, Boston, 1983.
11. Ministry of Finance: Resume of Activites of the Financial Institutions in Bangladesh, 1985-86, Government of Bangladesh, Dhaka, 1986.
12. Bangladesh Bank: Bangladesh Bank Bulletin, July, 1985.
13. Bangladesh Bank: Schedule Banks Statistics, April-June, 1985.
14. Ishi Hiromitsu: The Role of Government Financial Institutions in Japan, in Public Enterprise, Vol. 4, 1983.
15. Ministry of Finance: Autonomous Bodies Budget, 1986-87, Government of Bangladesh, Dhaka, 1986.
16. Ministry of Industries: Report of the Sub-Committee for Industrial Finance, Government of Bangladesh, Dhaka, 1985.
17. Alamgir M.K.: Development Banks in Bangladesh : Problems and Policies for Third Five Year Plan, Bangladesh Journal of Political Economy, Vol. 7, No 1A, Dhaka, 1986.
18. Sobhan R. and Ahsan A.: Disinvestment and Denationalisation, BIDS, Dhaka, 1984 (mimeo).
19. Sobhan R. and Mahmood S.A.: Economic Performance of Denationalised Industries in Bangladesh: The case of Jute and Cotton Textile Industries, BIDS, Dhaka, 1986 (mimeo).
20. Ministry of Finance: Annual Budget, 1986-87: Budget Speech of M. Syeduzzaman, Adviser for Finance, Government of Bangladesh, Dhaka, 1986.
21. Rashid M.H. and Bennet A.H.M.: Role of Public Enterprises in Resource Mobilisation with Reference to Bangladesh, Ministry of Finance, Government of Bangladesh, Dhaka, 1985. (mimeo).
22. U.N. Department of Technical Co-operation for Development: Economic Performance of Public Enterprises. Major Issues and Strategies for Action, New York, 1986.

23. Rahman M.: Remarks on Overview of Capital Market Development in Selected Asian Countries, in ADB : Capital Market Development in Asia Pacific Region, Manila, 1986.

24. Feldstein M.: Supply Side Economics: Old Truths and New Claims, American Economic Review, Conference Issue, 1986.

PRINTED BY: BACE PRINTING & PACKAGING 140, MOTIJHEEL C/A DHAKA